প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৩ তম পুনর্মুদ্রণ ঃ মে, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাংলা **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : ই বি জি : ২ : EBG : 2

মডিউল/পর্যায় : (বাংলা ভাষাতত্ত্ব)	**রচনা**	**সম্পাদনা**
৬ ও ৭		
একক : ২৪ - ২৮	অধ্যাপক জীবেন্দু রায়	অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক
একক : ২৯ - ৩৩	ড. রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক জীবেন্দু রায়
মডিউল/পর্যায় : (বাংলা ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোলিপি)		
৮ ও ৯		
একক : ৩৪ - ৪১	ড. সুধীন্দ্র দেবনাথ	ড. মননকুমার মণ্ডল ড. অনামিকা দাস

পরিমার্জন ও পুনঃসম্পাদনা — ড. অনামিকা দাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস

তত্ত্বাবধায়ক — ড. মননকুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EBG - 2

বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায় **বাংলা ভাষাতত্ত্ব**

৬ ও ৭

একক ২৪	❑	ভাষা, লিপি, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবংশ	7–14
একক ২৫	❑	ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ও বাংলা ভাষা	15–34
একক ২৬	❑	বাংলা ভাষার বিবর্তন	35–44
একক ২৭	❑	আধুনিক বাংলা উপভাষা	45–51
একক ২৮	❑	সাধুভাষা ও চলিত ভাষা	52–55
একক ২৯	❑	বাংলা ধ্বনির পরিচয়	56–64
একক ৩০	❑	বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন	65–73
একক ৩১	❑	রূপগঠন প্রণালী : বাংলা শব্দের রূপতত্ত্ব	74–82
একক ৩২	❑	শব্দার্থতত্ত্ব	83–94
একক ৩৩	❑	বাংলা শব্দভাণ্ডার	95–107

পর্যায় ৮ বাংলা ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোলিপি

একক ৩৪ ❑ বাংলা ছন্দের পরিভাষা (প্রাথমিক পর্যায়) 111–141

একক ৩৫ ❑ বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ 142–152

একক ৩৬ ❑ বাংলা ছন্দোবন্ধ 153–175

একক ৩৭ ❑ বাংলা কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ 176–222

পর্যায় ৯ বাংলা অলংকার

একক ৩৮ ❑ অলংকার 225–227

একক ৩৯ ❑ শব্দালংকার 228–243

একক ৪০ ❑ অর্থালংকার 244–274

একক ৪১ ❑ অলংকার-নির্ণয় 275–291

একক ২৪ ❐ ভাষা, লিপি, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবংশ

গঠন

২৪.১ উদ্দেশ্য

২৪.২ প্রস্তাবনা

২৪.৩ ভাষা

২৪.৪ লিপি

২৪.৫ ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

২৪.৬ ভাষাবংশ ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

২৪.৭ সারাংশ

২৪.৮ উত্তরমালা

২৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৪.১ উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে আপনি—

- ভাষা, লিপি, ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের সাধারণ পরিচয় লাভ করবেন।
- তুলনামূলক আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেন।

২৪.২ প্রস্তাবনা

কীভাবে ভাষার সৃষ্টি হল তার পরিচয় দেবার পর এসেছে লিপির কথা, সেই সঙ্গে তার বিবর্তন। বাংলা লিপি কোন লিপি থেকে জন্ম নিয়েছে সে কথাও। অতঃপর সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তথা ব্যাকরণের বিভিন্ন শ্রেণির কথা। আলোচিত হয়েছে পৃথিবীর ভাষাবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মোটকথা ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা হিসেবেই এই অধ্যায়টি পাঠ করতে হবে।

২৪.৩ ভাষা

ভাষা মানুষের দিনযাপন তথা জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপকরণ। আদিম মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির সূচনা এই ভাষার মধ্যে দিয়েই হয়েছিল। সে ভাষা চিন্তাকে শুধু বয়ে নিয়ে বেড়ায় না, তাকে সৃষ্টিও করে। ইতর প্রাণী যে কাজ করে তা কিন্তু তার জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দরকারি নয়। এ শব্দ বা ভাষা এক ধরনের চিৎকারই।

মানুষের ভাষার মধ্যে যে বুদ্ধির ব্যবহার থাকে পশুপাখির মধ্যে তা স্বাভাবিকভাবেই থাকতে পারে না। এই হিসেবে মানুষের উচ্চারিত, সুনির্দিষ্ট, অনেকের পক্ষে বোঝবার উপযোগী এই ধ্বনিসমষ্টি হিসেবেই ভাষার পরিচয় বা প্রতিষ্ঠা।

ভাষার সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলতে হয় যে আদিম মানুষের মনের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ছিল নানারকমের আকার-ইঙ্গিত। ভাষার সৃষ্টি এইসব আকার-ইঙ্গিত থেকেই। কেমনভাবে তা সম্ভব হয়েছে তা নিয়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই নানান চিন্তাভাবনা চলেছে। এসব ক্ষেত্রে মতপার্থক্যও রয়েছে রীতিমতো। সেইসবের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটিই বিশেষভাবে বলবার যে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিকাশ বিবর্তনের সঙ্গেই অনিবার্যভাবে ভাষার আবির্ভাব ঘটেছে। এ ভাষা তার প্রবৃত্তিধর্মের মতোই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। তার বিচিত্র ধরনের আকার-ইঙ্গিত, উচ্চারিত ধ্বনিগুলিই দীর্ঘকালের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভাষা রূপ লাভ করেছে। এইসব অর্থহীন ধ্বনি বা শব্দসমষ্টিকে সে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে তাৎপর্যসমন্বিতও। এই স্বাভাবিক ধ্বনি এবং বুদ্ধিই সৃষ্টি করেছে ভাষার। মানুষের বোধ বা ধারণা তৈরি হয়ে উঠেছে তার দেখা, শোনা বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই। ভাষা সম্পর্কেও এ কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। প্রকৃতির সঙ্গে চেতনার মিশ্রণেই তার সৃষ্টি।

২৪.৪ লিপি

মনের ভাব অন্যের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছে দেবার জন্যই প্রয়োজন ভাষার। সেই ভাষা যাতে উপস্থিত সময় এবং স্থানের দূরত্ব পার হয়ে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছতে পারে, লিপির ব্যবহার সেইজন্যই। **বাংলায় ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ হল লিপি। ভাষার স্থায়িত্ব তার সূত্রে। তবে বহুমানুষের সচেতন প্রয়াসে তৈরি বলে লিপিবদ্ধ ভাষার আকার বা প্রকৃতি** মুখের ভাষার থেকে অবশ্যই কিছুটা আলাদা। কোথায় কোন্ জনগোষ্ঠী ভাষার প্রয়োগ করছে, কথ্যভাষা গড়ে ওঠে সেই অনুসারেই। এক অঞ্চল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য অঞ্চল বা গোষ্ঠীর যে পার্থক্য থাকে তা এইজন্য। লিখবার ভাষায় এই ভিন্নতার অবকাশ কম।

লিপির ইতিহাসের প্রথম দিকে ছিল ছবি আঁকার প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা। প্রথমে মানুষ ছবি এঁকেই তার মনের ভাব প্রকাশ করত। সে সব ছবির বিষয় মানুষ তখন পর্যন্ত যতটা এগিয়েছিল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর তাই স্বাভাবিক ভাবেই সে সব ছবি মানুষের, পশুপাখির এবং শিকারের। এখনও দেখতে পাই সভ্যতা যেখানে অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে সেখানকার মানুষ এখনও সেসব ছবি আঁকছে। যেমন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান্ মানবগোষ্ঠী। এ ছাড়া রয়েছে কুইপু বা গ্রন্থিলিপির চলন, যা দিয়ে নানারকম দড়ির গোছায়—গিঁট দিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয় বা ঘটনাকে চিহ্নিত, নির্দিষ্ট করা হত। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু-দেশের মানুষের মধ্যেই এটি সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। লিপির এই প্রথম পর্যায়টিকে বলে **আলেখ্য এবং স্মারক চিত্র পদ্ধতি।**

পরে এসেছে **চিত্রলিপি** (Pictogram) এবং **ভাবলিপি** (Ideogram)। কোনও বিশেষ বস্তুকে বোঝানোর জন্য তার পুরো ছবি ব্যবহার করা হত না। বদলে তার প্রতীকধর্মী ছবি দিয়েই ভাব প্রকাশ করা হত। রেখাচিত্র দিয়ে তার ভাবও বোঝানো যেত। যেমন বোঝা মাথায় মানুষের ছবি বললে বোঝাত কোন কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়া, হেলানো দেয়াল মানে কোন কিছু পড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্বে শব্দলিপি (Phonogram)। এবার রেখাচিত্রের শব্দ বা ধ্বনিসমষ্টি নির্দেশ করতে লাগল। যেমন পুরনো মিশরীয় ভাষায় 'খেম' শব্দের অর্থ হল আটকানো এবং 'তেব্' শব্দের অর্থ 'শুয়োর'। পুরো শব্দটির ভাবলিপি হচ্ছে একটি মানুষ শুয়োরের লেজ ধরে টানছে। শব্দলিপিতে 'খেস্তের'—এই ধ্বনির জায়াগায় সেই প্রতীক ছবিটিই ব্যবহৃত হতে লাগল। প্রাচীন মিশরের **চিত্রপ্রতীক লিপি** (Hieroglyphic) বা প্রাচীন চীনের লিপি এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর পরে এসেছে অক্ষরলিপি (Syllabic Script)। এই পর্বে ছবি আরও সংক্ষিপ্ত হল এবং সেই ছবি আবার ধ্বনিসমষ্টি না বুঝিয়ে কেবল প্রথম অক্ষরটিকেই বুঝিয়েছে। প্রথমে এর রূপান্তর ঘটল **ধ্বনিলিপি-তে** (Alphabetic Script) । যেমন প্রাচীন মিশরের ভাষার 'লাবোই' ধ্বনিগুচ্ছ সিংহীর ছবিরই দ্যোতক। অক্ষরলিপিতে সেটি 'লা' অক্ষরের প্রতীক। ধ্বনিলিপিতে তা 'ল্' ধ্বনির চিহ্নবিশেষে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গাত বলতে হয় ভারতীয় লিপি কিছুটা ধ্বনি এবং কিছুটা অক্ষরের মিশ্রণ। 'অ'-হল ধ্বনিমূলক হরফ, অন্যদিকে 'ক' কিন্তু অক্ষরমূলক।

এখন আমরা যতরকম লিপি দেখি তার মূল সূত্র চারটি প্রাচীন লিপিপদ্ধতি। এগুলি হল যথাক্রমে ঃ প্রাচীন মিশরের লিপিচিত্র ; ভারতীয় লিপিচিত্র ; চীনা লিপিচিত্র এবং বাণমুখ (Cuneiform) লিপিচিত্র। শেষেরটি মেসোপটেমীয় লিপিপদ্ধতি। প্রায় তিনহাজার বছর আগে একটি লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন মিশরীয় লিপি শিষ্টরূপ গ্রহণ করেছিল ফিনিমিয়ার বণিকেরা। তবে তারা পরিমার্জিত করে নিয়েছিল। মনে রাখতে হবে এর থেকেই পরবর্তীকালের ইউরোপীয় এবং বিভিন্ন সেমিটিক বর্ণমালার সৃষ্টি। চীনা লিপিচিত্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক চৈনিক এবং জাপানি লিপি।

খরোষ্ঠী এবং **ব্রাহ্মী** ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন দুটি লিপি। অশোক অনুশাসনে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথমটি সেমিটিক লিপিগোষ্ঠীর। দ্বিতীয়টির উৎস বা সূত্র সম্পর্কে এ রকম কোন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় নি। এইটুকুই বলবার যে অশোক তাঁর অনুশাসনগুলিতে যে ব্রাহ্মীলিপির ব্যবহার করেছিলেন নানা বিবর্তন পরিবর্তনের ধারাপথ দিয়ে তাই বর্তমান ভারতীয়, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, যবদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব-এশীয় লিপিমালায় পরিণত হয়েছে। ভারতে যে সমস্ত লিপি ব্যবহৃত হয় তার সবই সৃষ্টি ব্রাহ্মী লিপি থেকে। গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে পূর্বভারতে এটি যে রূপ নিয়েছিল তাকে বলে **কুটিল লিপি**। বাংলা লিপির উদ্ভব এই কুটিল লিপি থেকেই।

২৪.৫ ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

ভাষা এবং লিপির সৃষ্টি আলোচনার সূত্রে অবধারিত ভাবেই আসবে এর উদ্ভব রহস্য এবং বিবর্তনের কথা। এই আলোচনার ধারা চার রকম। এক ঃ **ধ্বনিতত্ত্ব** (Phonology) ; দুই ঃ **রূপতত্ত্ব** (Morphology) ; তিন ঃ **বাক্যরীতি বা পদপ্রকরণ** (Syntax) এবং চার ঃ **শব্দার্থতত্ত্ব** (Semantics)। কোনও ভাষায় ব্যবহৃত বা উচ্চারিত ধ্বনির উচ্চারণের প্রকৃতি নির্ণয় এবং শ্রেণিবিন্যাস এই আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে। ঐতিহাসিক ক্রম-পরম্পরা ধরেও এর আলোচনা চলতে পারে। আচার্য সুকুমার সেন উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন 'এ' ধ্বনি কীভাবে উচ্চারণ করা হয় তা ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এর অন্তঃপ্রকৃতি এবং একই রকম অন্যান্য ধ্বনির

সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করবে ধ্বনি বিচার। অন্যদিকে ভাষার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়-ক্রমের মধ্যে দিয়ে এই 'এ' ধ্বনিটি কীভাবে বর্তমানের রূপ বা আকার অর্জন করেছে ধ্বনিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই তার আলোচনা হবে।

শব্দার্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস। বাক্যরীতি বা পদপ্রকরণে আলোচিত হয় শব্দের প্রয়োগ-বিধি। রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় পদের গঠন প্রণালী। সংস্কৃতর মতো প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষাগুলিতে রূপতত্ত্বের আলোচনারই অবিসংবাদিত প্রাধান্য। আধুনিক ভাষার ব্যাকরণে বাক্যরীতি বা পদপ্রকরণই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। এছাড়া রয়েছে 'ইডিয়ম'-এর ব্যাপক ব্যবহার। ভাষা এই কারণেই এখন প্রকাশ সামর্থ্যে রীতিমতো সমৃদ্ধ।

সাধারণভাবে যে-ব্যাকরণ আমরা পড়ি তাকে বলে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive Grammar)। এতে ভাষার ইতিহাসের কোনও প্রসঙ্গ থাকে না। ব্যাবহারিক প্রয়োজন এবং জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই এর আলোচনা। অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনারও ঠিক অবকাশ নেই। অতএব ঐতিহাহিসক ব্যাকরণ (Historical Grammar), তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar) বা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব-এর (Descriptive Linguistic) আলোচনার বিষয় এবং প্রেক্ষিত স্বাভাবিকভাবেই পৃথক এবং বৃহৎ। যাকে ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ব্যাকরণ বলি তার লক্ষ্যই হল ১. ভাষার আধুনিক বা কোনও বিশেষ যুগের প্রয়োগ বা উচ্চারণবিধি, ধ্বনিতত্ত্ব বা প্রত্যয়—এইসব আলোচনার সঙ্গে সেই সেই বিষয়ের বিকাশ বিচার করা, ২. ভাষায় প্রাচীন অবস্থা কীরকম ছিল তার আলোচনা এবং ৩. এর সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্ক আছে এমন ভাষার প্রয়োগ ও রীতির সঙ্গে মিলিয়ে আলোচ্য ভাষাটির উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি বের করা। এছাড়াও আছে দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণমূলক (Philosophical বা Psychological) ব্যাকরণ। এর লক্ষ্য হল ভাষার ভিতরকার চিন্তাসূত্রটিকে ধরবার বা বোঝাবার চেষ্টা করা। পরে সেই চিন্তাসূত্র বা চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করে কীভাবে ভাষার রূপের সৃষ্টি এবং বিবর্তন ঘটে থাকে তার বিচার-বিশ্লেষণ চলে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় বর্ণনামূলক ব্যাকরণ এইটুকু বলে যে বাংলায় বিশেষ্যর সম্বন্ধপদে কেবল 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়। সর্বনামে উত্তর পুরুষ একবচনে আছে 'আমি' শব্দ ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব দেখায় এইসব বিভক্তি বা প্রত্যয় কীভাবে হল। কেমনভাবে প্রকৃত 'কাট' শব্দ থেকে সৃষ্ট 'কের' বা এইধরনের 'কর' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধপদে এসে গেল ইত্যাদি। পরে কীভাবে এইভাবে 'কের' বা 'কর' থেকে প্রাচীন বাংলায় 'এর' বা 'আর'-এর সৃষ্টি হল। অন্যদিকে দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদের, অতীতকালের ভিতরকার চিন্তাধারার দার্শনিক আলোচনা এর যোগ্যতার বিচার-বিশ্লেষণ হয়ে থাকে।

২৪.৬ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এই মুহূর্তে যে সমস্ত ভাষা চলিত আছে এবং যে সমস্ত লুপ্ত ভাষার খোঁজ পাওয়া গেছে, ইতিহাসের পরম্পরা মেনেই তার গোত্র-বংশপরিচয় নির্ণয় করা হয়েছে। একই স্তরে বা পর্বের নানান ভাষার মধ্যে শব্দকোষ এবং ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থাকে অথবা একাধিক ভাষার আগেকার রূপ যদি একই ধরনের হয় তবে সেই ভাষার মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। এই সূত্র অনুসরণ করেই—সংস্কৃত, প্রাচীন, পারসিক, আবেস্তীয়, প্রাচীন স্লাভ, আর্মেনীয়, গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন জার্মানি বা কেলটিকেক মতো ভাষাগুলি একটি বিশেষ ভাষাবংশেরই

শাখাপ্রশাখা। এরই নাম ইন্দো-ইয়োরপীয় ভাষাবংশ—এদের উত্তরপুরুষ ভাষাগুলি একদিকে, ভারতবর্ষে, অন্যদিকে ইয়োরোপে এবং ভারতবর্ষে ও ইয়োরোপের মাঝামাঝি অঞ্চলে চলিত আছে।

এমন কিছু ভাষা আছে যেগুলিকে কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণি বা বংশের মধ্যে আনা যায়নি। এগুলির বেশিরভাগই অত্যন্ত প্রাচীন এবং বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। যাকে আধুনিক ভাষা বলি তার মধ্যে বুশম্যান, হটেনটটের মতো ভাষাও আছে। ভাষাবংশের বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এগুলিকে বাদ দেওয়াই সঙ্গত।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান পৃথিবীর ভাষা বিভাজন এইরকম দাঁড়ায় ঃ

১. ইন্দো-ইয়োরোপীয়
২. সেমিটিক-হেমিটিক
৩. বান্টু
৪. ফিন্নো-উগ্রিক
৫. তুর্ক-মোঙ্গাল-মাঞ্চু
৬. ককেশীয়
৭. দ্রাবিড়
৮. অস্ট্রিক
৯. ভোট-চীনীয়
১০. উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বংশীয়
১১. এস্‌কিমো
১২. আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা

বিভাজনগুলির প্রসঙ্গে সামান্য কিছু কথা বলা যেতে পারে।

এক। **ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঃ** কোন্ ভাষা থেকে এই গোত্রের ভাষাগুলির সৃষ্টি তার কোনো দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তুলনামূলক নানারকম আলোচনা থেকে এই মূল ভাষার রূপটি সাধারণভাবে কীরকম ছিল তার একটা স্থূল ধারণা করতে পারা গেছে। কমবেশি সাড়ে চার হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে মূল ভাষা থেকে পৃথক হয়ে এই গোষ্ঠীর প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হয়েছিল। তারপর সেগুলি ইয়োরোপ এশিয়ার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই মূল ভাষার উৎসমুখ কোথায় তা আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তা মধ্য ইয়োরোপেও হতে পারে।

যাই হোক, এই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন শাখা নয়টি। সেগুলি হল যথাক্রমে—কেল্‌টিক, ইটানিক, জার্মানিক বা টিউটনিক, গ্রিক, বাল্‌টো-স্লাভিক, আলবানীয়, আর্মেনীয়, তোখারীয়, ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য। এদের মধ্যে তোখারীয় অনেকদিন হল লুপ্ত হয়ে গেছে। আর সবই জীবন্ত।

দুই। **সেমিটিক-হেমিটিক ঃ** সেমিটিক-হেমিটিক হল এই বংশের দুই শাখা-গোষ্ঠী, অনেকদিন আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া এসিরীয়, আক্কাদীয় এবং ব্যাবিলোনীয় ভাষা সেমিটিক শাখার পূর্ব উপশাখায় অন্তর্গত ছিল। কনানীয়, ফিনীসীয় এবং আরামীয় ছিল পশ্চিমী উপশাখার অন্তর্গত। হিব্রুও এর মধ্যে পড়ে। এটি বর্তমানে ইজরায়েলের প্রধান ভাষা। পশ্চিম উপশাখায় উত্তর গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবেই এর পরিচয়। দক্ষিণ গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ভাষা হল যেগুলি আরব এবং আবিসীনিয়ায় প্রচলিত আছে। সেমিটিক ভাষার মধ্যে আরবীয়র গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আটশো খ্রিস্টপূর্বাব্দেও এর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

হেমিটিক শাখার ভাষা হল প্রাচীন মিশরীয়। আর কিছু নেই। খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দেও এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কপটিক্ (Coptic) ভাষার সৃষ্টি এর থেকেই। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে এ ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন থেকে সেই জায়গায় এসেছে আরবী। সেমিটিক-হেমিটিক শাখার মধ্য বেরবের (Berber) এবং কুশীয় (Cushite) ভাষাও পড়ে। লিবিয়া, সোমালিল্যান্ডের মতো দেশের কিছু ভাষা এর অন্তর্গত।

তিন। **বান্টু ঃ** মধ্য এবং পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সমস্ত ভাষাই এর মধ্যে পড়ে। সোয়াহিলি, কঙ্গো, লুবা, নিয়াঞ্জা, জুলু এবং আরও অনেক ভাষা এর অন্তর্গত।

চার। **ফিন্নো-উগ্রিক ঃ** এই গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে ফিন্‌ল্যান্ড, এস্থোনিয়া, হাঙ্গেরির ভাষা।

পাঁচ। **তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু ঃ** এর তিনটি প্রধান শাখার মধ্যে রয়েছে তুর্ক-তাতার, মোঙ্গল এবং মাঞ্চু। অনেকে মনে করেন এই তিনটি শাখা পৃথক। প্রথমটির সবচেয়ে উল্লেখ্য ভাষা হল তুর্ক। এছাড়াও তাতার, কিরগিজ বা উজবেগের মতো ভাষা এর অন্তর্গত। মোঙ্গালগোষ্ঠীর ভাষাগুলি এশিয়া, ইয়োরোপ বা মোঙ্গালিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মাঞ্চুবংশের উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলি হল সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস এবং মাঞ্চুরিয়ায় মাঞ্চু।

ছয়। **ককেশীয়** গোত্রের ভাষা হিসেবে জর্জিয়ার ভাষাই একমাত্র।

সাত। **দ্রাবিড় ঃ** এই গোষ্ঠীর ভাষা দক্ষিণ ভারতেই কমবেশি চলত। উত্তর ভারতেও কোনও কোনও জায়গায় এর প্রচলন আছে, তবে তা পরিমাণে খুবই অল্প। তামিল, তেলেগু, মালয়লম, কানাড়ি, টুলু এবং বেলুচিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে চলিত ব্রাহুই এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ওড়িশা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত গোঁ-খোঁড়-ওঁরাওদের ব্যবহৃত ভাষা এর মধ্যে পড়ে। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদের বিবেচনায় মালদহ জেলায় রাজমহল অঞ্চলের মাল্‌তো বা মাল্‌পাহাড়ীর সঙ্গে কানাড়ী বা কন্নড়ের সম্পর্ক আছে।

আট। **অস্ট্রিক ঃ অস্ট্রো-এশীয়** এবং **অস্ট্রোনেশীয়** এই বংশের দুটি শাখা। প্রথমটির উপশাখা হল মোন্-খমের এবং কোল। মোন্-খমের ব্রহ্মদেশ, মালয়ের কিছু অঞ্চলে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত। কোল উপভাষা কেবল ভারত ভিত্তিক। পশ্চিম বাংলা, ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং মাদ্রাজে কোনো কোনো অঞ্চলে বলা হয়ে থাকে। মালয়, যবদ্বীপ (জাভা), বলিদ্বীপ প্রভৃতির ভাষা অস্ট্রোনেশীয় উপশাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বেশ কিছু অংশে এই শাখার ভাষা চলিত আছে।

নয়। **ভোট-চীনীয়** ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি শাখার নাম হচ্ছে **চীনা, তাই** এবং **ভোটবর্মী** চীনা ভাষায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলে। এ ভাষায় সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন চার হাজার বছর আগেকার। তাই শাখার ভাষা শ্যামদেশীয় ভাষা। **ভোটবর্মী** শাখার উপভাষাগুলি হল যথাক্রমে তিব্বতী, বর্মী এবং

বোডো। প্রধানত বাংলা দেশের উত্তরপূর্বে তথা হিমালয়ের পূর্বদিকের পাদদেশে বোডো, কাচিন, নাগা প্রভৃতি বোডো উপশাখার ভাষা চলিত আছে।

আরও কিছু ভাষা উল্লেখ্য। এগুলির মধ্যে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের ভাষা 'চুক্‌কী', গ্রীনল্যান্ড এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলে প্রচলিত **এস্‌কিমো** এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা।

২৪.৭ সারাংশ

ভাষা ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতেই অন্য প্রাণীর থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবর্তনের সঙ্গেই এই ভাষার আবির্ভাব বা সৃষ্টি। মানুষের উপলব্ধি বা ধারণা গড়ে উঠেছে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই। ভাষা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

ভাষায় যে ধ্বনি প্রকাশ পায় তারই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ হল লিপি। এর সূত্রেই ভাষার স্থায়িত্ব। এই লিপিরই শ্রেণিভেদ বিভিন্ন পর্যায়, বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ভারতবর্ষের দুটি প্রাচীন লিপির প্রসঙ্গও এসেছে। সেই সঙ্গে বাংলা লিপির উদ্ভব কোন লিপি থেকে সে কথাও।

ভাষা এবং লিপির আলোচনার সূত্রেই ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রসঙ্গ অবধারিতভাবেই এসে যায়। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি বা পদপ্রকরণ এবং শব্দার্থতত্ত্ব—এই চারভাগে সে আলোচনার বিন্যাস। সংক্ষেপে সেই ভাগগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, তুলনামূলক ব্যাকরণ, বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণমূলক ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভাষাতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে সুচিহ্নিত করে দেবার জন্য।

ভাষাবংশ-এর আলোচনায় এসেছে বর্তমান পৃথিবীর ভাষা-বিভাজনের কথা। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে শুরু করে এসকিমো এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা আলোচনার বৃত্তে এসেছে। অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে। কমবেশি বারো ভাগে এই বিভাজন দেখানো হয়েছে।

২৪.৮ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১. (ক) কেন ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল ?

(খ) লিপির ইতিহাসের প্রথম দিকে কোন্ আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল ?

(গ) চিত্রলিপি এবং ভাবলিপি কাকে বলে ?

(ঘ) ভারতের দুটি প্রাচীন লিপির নাম কী ?

(ঙ) কোন্ লিপি থেকে বাংলা লিপির জন্ম হয়েছিল ?

(চ) ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ককে বলে ?

(ছ) ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ?

(জ) অস্ট্রিক বংশের দুটি শাখার নাম কী ?

২. (ক) লিপির বিভিন্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(খ) ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(গ) ইন্দো-ইয়োরোপীয়, দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

২. অতীন্দ্র মজুমদার—ভাষাতত্ত্ব।

৩. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম)।

৪. ড. জীবন্দে রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

একক ২৫ ❐ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ও বাংলা ভাষা

গঠন

২৫.১ উদ্দেশ্য

২৫.২ প্রস্তাবনা

২৫.৩ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তন ও বাংলা ভাষা

২৫.৪ সংস্কৃত

২৫.৫ বৈদিক ও সংস্কৃত

২৫.৬ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

২৫.৭ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

২৫.৮ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ

২৫.৯ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

২৫.১০ বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব

২৫.১১ বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব

২৫.১১.১ ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠী

২৫.১২ সারাংশ

২৫.১৩ উত্তরমালা

২৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

২৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কীভাবে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় এসে পৌঁছেছে তার বিবরণ পাবেন।
- বাংলা ভাষার দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব কতটা সে সম্পর্কেও একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হবে।

E:\Barun-2014\Netaji Subhas Open University\EBG-2(Modules 6-9)\Unit-25\

২৫.২ প্রস্তাবনা

আর্যভাষা-ভাষীরা কখন ভারতবর্ষে এসে অন্যান্য ব্যাপারে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভাষা ব্যাপারেও কীভাবে আধিপত্য বিস্তার করে এবং নানান বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এসে পৌঁছয় তার বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলা দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক প্রভাবের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও পেতে পারবেন।

২৫.৩ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ও বাংলা ভাষা

ঐতিহাসিকদের মতে ভারতে আর্যভাষা-ভাষীদের আগমনকালে আনুমানিক পনের'শ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়। ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে আর্যরা প্রথমে এসেছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। পরে তারা পৌঁছে যায় পশ্চিম পাঞ্জাবে। এর পরে সমস্ত উত্তর, পূর্ব এবং পূর্বপ্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে—তাদের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়। স্থানীয় ভাষা এবং সংস্কৃতিকেও তারা এই সূত্রে আত্মসাৎ করে নেয়। দক্ষিণ ভারতেও তাদের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি জিনিস বিশেষভাবে দেখবার। স্থানীয় কথ্যভাষাগুলি থেকে যায়। এছাড়া পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে আর্যদের আসবার আগে থেকেই একটি জোরালো সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। ফলে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ এখানে কিছুটা বিঘ্নিত এবং বিলম্বিত হয়েছিল।

এইসব ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর মুখের ভাষার মধ্যে কমবেশি পার্থক্য থাকলেও মিল ছিল। সেটিও ভাববার মতো। আর্যদের প্রধান জীবিকা প্রথমে ছিল পশুপালন। যাযাবর হলেও ভারতবর্ষে এসে ধীরে কৃষিজীবী হিসেবেই তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের ছিল অশ্বশক্তি, ভাষাসম্পদ তথা দেববন্দনামূলক গীতি-সাহিত্য। ঋক্‌বেদের ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ। এর সংকলনে ধৃত প্রাচীনতম কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময়ে। ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন কিছুকাল আগে ক্রীট দ্বীপে পাওয়া হারানো লিপির কিছু অংশ পড়তে পারা গেছে। এর থেকে প্রাচীন গ্রিক ভাষার নিদর্শন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। হিট্টীকে বাদ দিলে এটিই নিঃসংশয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন। অন্যদিকে ঋক্‌বেদের ভাষাই হল প্রাচীনতম। অবশ্য ভারতবর্ষে আর্যভাষীরা যখন প্রথম প্রবেশ করেছিল তার অনেক পর গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর্যভাষারও নিশ্চয়ই কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আর্যভাষীদের ভারতে প্রবেশের সময় থেকে এই গ্রন্থের সুক্তগুলির রচনা ও সংকলন কালের ব্যবধান যে কত নিশ্চিত করে নির্ণয় না করা গেলেও এটা ঠিক যে তা খুব সামান্য নয়। তবে ঋক্‌বেদে এমন কোনো উক্তি বা সূত্র নেই, যার থেকে বোঝা যায় যে ঋক্‌বেদে রচনা করা সময়ে আর্যভাষীরা তাঁদের আদি বাসভূমির কথা কিছুমাত্র মনে রাখতে পেরেছিলেন। ঐতিহাসিকের নিজের ভাষায় ঃ

'There is no evidence to show that the Vedic Aryans were foreigners or that they migrated into India within traditional memory. Sufficient literary materials are available to indicate with some degree of certainty that the Vedic Aryans regarded Sapta Sindhu as their original home.' (The History & Culture of the Indian People)—Dr. R.C. Majumder

২৫.৪ সংস্কৃত

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (Old Indo-Aryan) সাহিত্যিক রূপ ছিল দু'রকম। এর মধ্যে যেটি সবচেয়ে পুরোনো সেটি হল ঋক্‌বেদ এবং পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, অন্যটি অর্বাচীন কালের। সে সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের ব্যবহারের ভাষা এটি। এছাড়া লৌকিক নানা গল্প-উপাখ্যানের ভাষা হিসেবেও এর ব্যবহার ছিল। এ ভাষার লিখিত কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীকালের কাব্য পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে এর স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। পাণিনির হাতে এ ভাষাই 'সংস্কৃত' হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতকে বোঝালেও ঐ সময়ের ভাষাকে অনেকগুলি সূক্ষ্মপর্যায়ে ভাগ করা চলে।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী বা তার কিছু পরে পাণিনি বর্তমান ছিল। তাঁর গ্রন্থে, তিনি আপিশলি, কাশকৃৎস্ন, শাকল্য প্রভৃতি চৌষট্টিজন পূর্বসূরির নাম করেছেন। তাঁর আলোচনা পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় যে অনেক পারিভাষিক শব্দই পূর্ব থেকে চলিত ছিল।

আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বলে পাণিনির গ্রন্থের নাম অষ্টাধ্যায়ী। এর সূত্র সংখ্যা সাড়ে চার হাজার। পূর্বসূরিদের কোনো কোনো পরিভাষা বা সূত্র তিনি গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় নিহিত রয়েছে চোদ্দটি মূল সূত্রের ওপর। পাণিনির বিবেচনায় প্রত্যেকটি শব্দের মূলে রয়েছে কোনো না কোনো ক্রিয়া বোঝায় এমন এক অক্ষর বিশিষ্ট ধাতুপ্রকৃতি—এর সঙ্গে উপসর্গ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সমস্ত শব্দের সৃষ্টি। ভাষার মূলে রয়েছে বাক্য। প্রাচীন বৈয়াকরণের শব্দের চাররকম পার্থক্য কল্পনা করেছেন। পাণিনি স্বীকার করেছিলেন তিনটি পার্থক্যের—১. বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম (সুবন্ত) ২. ক্রিয়া (তিঙন্ত) এবং ৩. অব্যয় (নিপাত)। ধ্বনির উৎপত্তিস্থান এবং উচ্চারণের ঝোঁক বা য- অনুসারে পাণিনি যেভাবে বর্ণের বর্গীকরণ বা শ্রেণিবিন্যাস করেছেন আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিচারে তা আজও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতের তুলনামূলক পাঠও তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

পাণিনির সময়ে ভদ্র বা শিক্ষিতজনের প্রধান ভাষা ছিল উদীচী বা উত্তর-পশ্চিমা। তিনি নিজেও ছিলেন এই অঞ্চলেরই মানুষ। তাঁর ব্যাকরণেও প্রাধান্য পেয়েছে এই ভাষা। কিন্তু অন্য অঞ্চলের ভাষা তিনি একেবারেই উপেক্ষা করেননি।

সাধারণ মানুষ অবশ্য এই ব্যাকরণের ওপর একেবারেই নির্ভর করেনি। পাণিনির বিবেচনায় যা অসিদ্ধ সেই শিষ্ট ভদ্রভাষায় তারা পুরাণ, কাব্য বা ধর্মতত্ত্বের আলোচনা শুনত বা পড়ত। পুরাণের ভাষার মধ্যে এই

অ-সংস্কৃত ভাষার চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা যখন মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে পৌঁছেছে তখনও কোনো কোনো সম্প্রদায় বিশেষ করে উত্তরাপথের বৌদ্ধরা এই লৌকিক প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেই তাঁদের শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই ভাষাই সেই 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'।

২৫.৫ বৈদিক ও সংস্কৃত

বৈদিক ও সংস্কৃতে ধ্বনির দিক দিয়ে পার্থক্য তেমন নেই। কিন্তু ব্যাকরণের পার্থক্য আছে। বৈদিক স্বর (Pitch Accent) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। বৈদিক শব্দরূপ এবং ধাতুরূপের বিপুল বৈচিত্র্য। শব্দরূপে কতগুলি অতিরিক্ত পদ আছে। এ ছাড়া এ দু'য়ের শব্দরূপে তেমন পার্থক্য কিছু নেই। তবে ধাতুরূপের বাহুল্য বা বৈচিত্র্য বৈদিকে খুবই বেশি। সংস্কৃতে 'ভাব' (Mood)-এর সংখ্যা কম। নির্বন্ধ ভাবের প্রয়োগ শুধু 'মা' এই অব্যয়ের মধ্যেই সীমিত। বৈদিকে বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই চাররকম কালের বিভিন্ন ভাবের রূপ হতে পারত। সংস্কৃতে কেবল বর্তমান কাল এবং কোনো কোনো সময় সামান্য অতীত কালেরই ভাষান্তর ঘটে থাকে। সংস্কৃতে পাণিনির সময়ে বা তার পরে ক্রিয়ার কাল বলতে ইংরেজি Tense শব্দের দ্যোতনা বোঝাত না। এখন যাকে Tense বলি তা সংস্কৃতে বোঝাত ক্রিয়ার প্রকৃতিকে। পাণিনির কাছে 'বর্তমান' শব্দের অর্থ ছিল যে ক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। 'অতীত' বলে কোনো কিছু তিনি বিবেচনা করেননি। অতীত বলতে তিনি বুঝেছেন যা শেষ হয়েছে, যা এখন হচ্ছে না, যা অগোচরে ঘটেছে কিন্তু যার ফলে এখন অবগতির মধ্যে, এমন ক্রিয়া।

বৈদিকে যে সব ক্রিয়াজাত বিশেষণের প্রাধান্য ছিল তা মোটামুটি এই রকম ঃ

১. শতৃ-শানচ্ (শতৃ ঃ গম্—গচ্ছৎ, ধীর—ধাবৎ, দশ—পশ্যৎ ; শানচ ঃ সেব্—সেবমান, শী—শয়ান)

২. ক্বসু—কানচ্ (ক্বসু ঃ গম্—জগ্মিবেস্, দৃশ—দদৃশিবস্ ; কানচ্ ঃ সেব্-সিষেবান, রাজ্—রবাজান্)

৩. স্যতৃ—স্যামান্ (স্যতৃ ঃ ভূ—ভবিষ্যৎ, কৃ—করিষ্যৎ ; স্যমান্ ঃ সেব্-সেবিষ্যমাণ্, বৃৎ—বর্ত্তিষ্যমাণ) প্রভৃতি।

এর সঙ্গে ছিল ক্ত্বাচ্-ল্যপ্, তুম্-তবৈ প্রভৃতি অসমাপিকা পদের প্রাচুর্য। সংস্কৃতে এ সব অনেক কমে গিয়েছে। প্র, পরা, অপ, নি-র মতো উপসর্গ বৈদিকে সাধারণ ক্রিয়া-বিশেষণ হিসেবে এবং পৃথক পদ হিসেবেও ব্যবহৃত হত। সংস্কৃতে এগুলির প্রয়োগ ক্রিয়াপদের আগে। কেবল আ, প্রতি, পরি, অনু প্রভৃতি উপসর্গ কোনো কারকের অর্থে এবং কোনো কারকের সঙ্গে ব্যবহৃত হলে (কর্ম-প্রবচনীয়) পৃথকভাবে যুক্ত হত। সমাসের ব্যবহারও সংস্কৃতে বৈদিকের চেয়ে বেশি। বৈদিকে দুটির বেশি পদের সমাস ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে সংস্কৃত একটি সমাসবহুল ভাষা। এছাড়া অতীতকালে সমপিকা ক্রিয়ার অর্থে 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের ব্যবহার সংস্কৃতে নতুন। সবচেয়ে বড় কথা হল বৈদিকে ছিল না এমন বহু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নেওয়া হয়েছে। বৈদিকের শব্দভাণ্ডারের একটা বিরাট অংশ সংস্কৃতে গৃহীত হয়নি।

২৫.৬ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

এক। মূল বৈদিক আর্যভাষা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতে স্বরের সংখ্যা কমে গিয়েছে। এছাড়া রয়েছে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঋ, ঌ, এ, ঐ সহ স্বরবর্ণ এবং শ, ষ, স সমেত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির ঠিকঠাক ব্যবহার। সেই সঙ্গে স্বরবর্ণের গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রাসরণ তথা অপশ্রুতি ছিল সংস্কৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুই। বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জনের পর্যাপ্ত ব্যবহার।

তিন। শব্দরূপে বৈচিত্র্য বিপুল। তিন পুরুষ, দুই পদ (আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ)। বাচ্য বলতে কর্তা, কর্ম এবং ভাববাচ্য।

চার। উপসর্গ ধাতু বা শব্দের প্রথমে যুক্ত হলেও তাদের স্বাধীন ব্যবহারও যথেষ্ট ছিল না।

পাঁচ। সমাসের প্রয়োগ ছিল বৈচিত্র্যসম্পন্ন এবং বিপুল পরিমাণেই।

ছয়। বাক্যে পদবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন ছিল না।

সাত। ধাতুর সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় এবং শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত-প্রত্যয় যুক্ত করে ইচ্ছেমতো শব্দ তৈরি করা যেত।

আট। ছন্দপদ্ধতি ছিল অক্ষরমূলক।

২৫.৭ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (Middle Indo-Aryan) সাধারণ লক্ষণ

বৈদিক ভাষা উচ্চারণ এবং ব্যাকরণের দিক দিয়ে সরলতার হয়ে সংস্কৃতের রূপ নিল। তবে পুরনো কাঠামোর পরিবর্তন কিছু হয়নি। পরে, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ভারতীয় আর্যভাষার যে পরিবর্তন ঘটতে লাগল তাতে এই পুরনো কাঠামোটির অনেক কিছুই বদলে গেল। এ ভাষা রূপ নিল প্রাকৃতের। 'প্রাকৃত' কথাটির তাৎপর্য হ'ল—যা 'প্রকৃতি' বা জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা। 'সংস্কৃত' ভদ্রসমাজের ভাষা। এরই বিপরীতে 'প্রাকৃত' নামটির অবস্থান।

এই প্রাকৃত বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তিনটি স্তর বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এসে পরিণতি লাভ করেছে। এই স্তর তিনটি হ'ল যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য এবং অন্ত্যস্তর। প্রাচীন পর্বের কালসীমা ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দ। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দ হ'ল মধ্য পর্বের সময়। অন্ত্যস্তর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এতটা বাঁধাবাঁধি অবশ্য ঠিক নয়। কিন্তু আলোচনার কাঠামোগত স্বার্থে এটি মোটামুটি মেনে নিতে হয়। প্রথম পর্বের প্রাকৃতের নিদর্শন রয়েছে অশোকের অনুশাসন, খ্রিস্টপূর্ব সময়ের অন্যান্য প্র-লিপি এবং হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের পালি শাস্ত্রগ্রন্থের প্রাচীনতম পুথিতে। দ্বিতীয় পর্বের নিদর্শন রয়েছে খ্রিস্ট-পরবর্তী প্রথম তিন শতাব্দীর প্র-লিপিতে, মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী-অর্ধমাগধী-পৈশাচী ইত্যাদি সাহিত্যিক প্রাকৃতে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতে। অন্ত্যস্তরের দৃষ্টান্ত রয়েছে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠে।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণগুলি (MIA) এইরকম ঃ

সংস্কৃত ভাষা যখন প্রাকৃতের রূপ নিয়েছে তখন তিনটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট। এই তিনটি ক্ষেত্র হ'ল—ধ্বনি, শব্দ ও ধাতুরূপ এবং ধাতু ব্যবহার।

ধ্বনিগত পরিবর্তন আলোচনা করলে দেখা যাবে 'ঋ'-কারের উচ্চারণ লুপ্ত হয়েছে। এর বদলে এসেছে 'অ'-কার, 'ই'-কার, 'উ'-কার—কখনও কখনও 'এ'-কারের ব্যবহার। কোনো কোনো সময় এগুলি এসেছে 'র'-এর সঙ্গে যুক্ত আকারে অর্থাৎ, 'র', 'রু'-রূপে। এই পরিবর্তন মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মাঝামাঝি সময়ে স্পষ্ট হয়েছে, তার আগে নয়।

যেমন 'মৃগ' শব্দটি। মধ্যভারতীয় আর্যের প্রথম পর্বে (Early Middle Indo-Aryan) এটি রূপান্তরিত হয়েছে 'মগ', 'মিগ', 'মুগ', 'ম্রুগ' বা 'ম্রিয়'-তে—মাঝামাঝি সময়ে সেটি হয়েছে 'মঅ', 'মিঅ'। 'বৃদ্ধ' হয়েছে বুড্ঢ।

একইরকম ভাবে ঐ-কার, ঔ-কারের জায়গায় এসেছে এ-কার, ও-কারের ব্যবহার। 'ঔষধানি' হয়েছে 'ওসধানি'।

দু'অক্ষর বিশিষ্ট 'অয়' বা 'অব'-এর জায়গা সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে—'এ', 'ও'। ফলত 'ভবতি' হয়েছে 'ভোতি' বা 'হোতি'।

একেবারে প্রথমে 'পূজয়তি' ছিল 'পূজোতি', মাঝামাঝি সময়ে হয়েছে 'পূজোদি', 'পূজেই'—শেষ পর্যায়ে 'পূজই'। ভারতীয় আর্যভাষার কোনো কোনো উপভাষায় অবশ্য এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হতে কিছু সময় লেগেছে। যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, আছে পদের শেষে অনুস্বার সেখানে সংস্কৃতের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে। 'কান্তাং' হয়েছে 'কন্তং' ?

পদের শেষে অ-কারের পর বিসর্গ থাকলে দু'য়ে মিলে তা 'ও'-কার বা 'এ'-কার হয়েছে। কখনও কখনও লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'জন'ঃ হয়েছে 'জনো'—'জনে', 'জন'।

ঋ, র, শ বা ষ—ধ্বনির যে কোনো একটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কখনও বা আপনা থেকে দন্ত্য ব্যঞ্জন ধ্বনি 'মূর্ধন্য' ধ্বনি হয়ে গেছে। এই সূত্রে 'কৃত' হয়েছে প্রথম পর্যায়ে 'কত', বা 'কট' ; মধ্য পর্যায়ে 'কদ', 'কঅ' বা 'কট'।

পদের প্রথমে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তার একটা লুপ্ত হয়ে গেল বা স্বরভক্তি ঘটল। যেমন—'ত্রী' বা 'ত্রীণ' হয়েছে 'তী' বা 'তিন্নি'। উত্তর-পশ্চিম উপভাষা বা পৈশাচী প্রাকৃত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপভাষা বা মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী প্রাকৃতে শব্দের প্রথমে এই যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার অবশ্য কিছুকাল থেকে গিয়েছিল। তাই সেখানে 'প্রিয়স্য'-পরিবর্তিত রূপেও তার আদি ব্যঞ্জনধ্বনি অবিকৃত রেখেই হয় 'প্রিয়স্ম'।

পদের মধ্যের যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যাপারেও এক ধরনের প্রবণতা দেখার মতো। সেখানে সমীভবন অথবা স্বরভক্তিই দেখা দিচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ 'সর্বত্র' হয়েছে 'সব্বত্ত', 'চিকিৎসা' হয়েছে 'চিকিৎসা'। পদের প্রথমে অথবা মাঝখানে অবস্থিত 'ক্ষ' বা 'চ্ছ' হয়েছে যথাক্রমে 'ছ', 'ক্খ' অথবা 'খ'। ফলে 'ক্ষণতি' হয়েছে 'ছনতি'। য-ফলা থাকলে পৈশাচী প্রাকৃত বা উত্তর-পশ্চিমা উপভাষা এবং মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী বা দক্ষিণ-পশ্চিমা

উপভাষায় সমীভবন হয়েছে। 'কর্তব্য' হয়ে গিয়েছে 'কট্টব্ব'। প্রাচ্যমধ্যা এবং প্রাচ্যায় এক্ষেত্রে সম্প্রসারণ হয়েছে। 'কর্তব্য' হয়েছে 'কট্টবিয়'।

শব্দরূপে দেখা যায় পদের শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হবার ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ পরিণত হয়েছে স্বরান্ত-শব্দে। অধিকাংশ ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ-অকারের মতো হত। যেমন 'কর্মণে' একেবারে প্রথম পর্বে হয়েছে 'কম্মায়'। যে সব শব্দের শেষে আ, ই বা উ ছিল তাদের রূপের কিন্তু বদল ঘটেনি।

প্রাকৃতের ধাতুরূপে কোনো বৈচিত্র্য নেই। কোনো কোনো সময় একটি মূল ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ধাতুর। এই সূত্র ধরেই 'বাদ্যতে' থেকে এসেছে 'বাজুই', বাদয়তি' থেকে এসেছে 'বাত্রই'।

সংস্কৃতে শুধু এক অক্ষর বিশিষ্ট আ-কারান্ত ধাতুর নিজস্ব রূপে 'পয়' **বিকরণ** (বিকরণ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Stem-affix, ধাতুর মধ্যে বা ধাতুর ও বিভক্তির মাঝখানে যা নিহিত হয় তাকে বিকরণ বলে) যুক্ত হত। যেমন 'দাপয়তি' বা 'মাপয়তি'। প্রাকৃতে বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সব ধাতুর নিজন্তেই এই বিবরণ লক্ষণীয়। সংস্কৃতে ক্রিয়াপদের কাল ছিল ছ'টি, মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় তা তিনটিতে এসে দাঁড়াল।

বিবর্তনের ধারায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। চতুর্থী ও পঞ্চমীর একবচনেরও সেই লোপ হবার অবস্থা। বিভক্তির প্রসঙ্গে বলা যায় দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা চতুর্থীর এবং তৃতীয় ও সপ্তমীর সাহায্যে পঞ্চমীর অর্থ বোঝান হত।

২৫.৮ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ

এক। **কাশ্মীরী**—বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের অনেকেই কাশ্মীরীকে দরদীয় অথবা ইরানীয় প্রভাবিত ভাষা বলে বিবেচনা করেছিলেন। সেই সূত্রেই, অনুমান করা যেতে পারে যে এটি পৈশাচী প্রাকৃত থেকে জাত। কাশ্মীরীতে সাহিত্যসৃষ্টিও অত্যন্ত প্রাচীন। সবচেয় পুরানো দৃষ্টান্ত হিসেবে চতুর্দশ শতাব্দীর শৈবতন্ত্রাচার্য লল্লের কয়েকটি কবিতার কথা বলা যায়। **কোহিস্তানী, শীনা, চিত্রালি** এই গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রধান ভাষা। আগে ব্রাহ্মী থেকে সৃষ্ট শারদালিপিতে কাশ্মীরীভাষা লেখা হত, এখন হয় **ফারসি** অক্ষরে।

দুই। **পাঞ্জাবী**—এর প্রধান শাখা দু'টি। **পশ্চিমা পাঞ্জাবী বা লহন্দী** এবং পূর্ব পাঞ্জাবী বা **হিন্দকী।** অনেক ভাষাবিদেরই ধারণা যে দু'টি শাখাই **কেকয়** অপভ্রংশজাত। পশ্চিমা শাখায় রয়েছে দরদি ভাষার প্রভাব। দুটোতেই প্রাচীনের অনুসরণের চেষ্টা আছে। যেমন প্রাকৃতের যুক্তব্যঞ্জন চলিত আছে, একক ব্যঞ্জনের ব্যবহার হচ্ছে যুগ্ম ব্যঞ্জনের মতো—'উপর'—'উপ্‌পর'। লণ্ডা অথবা ফারসি লিপিতে পশ্চিমা পাঞ্জাবী লেখা হয়। শিখদের 'জনম সাখি' বা 'গ্রামগীতি' ছাড়া অন্য তেমন কিছু সাহিত্য এ ভাষায় লেখা হয়নি। 'গুরুমুখী' লিপিতে লেখা হয় পূর্বী পাঞ্জাবী। এটা লন্তারই দেবনাগরী প্রভাবিত অন্য একটি রূপ। গুরু অঙ্গাদ সিং এর প্রবর্তক। এ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশি। শিখদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থ', 'গ্রন্থসাহেব' পূর্বী পাঞ্জাবী বা হিন্দকীর সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন। পশ্চিমা হিন্দীরও কিছু প্রভাব এতে আছে।

তিন। **সিন্ধী**—সিন্ধী হ'ল কচ্ছ ও সিন্ধু অঞ্চলের ভাষা। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে পুরনো বলে ভাষাবিদদের ধারণা। আরবি-ফারসির বাহুল্যও বিশেষ করে দেখবার। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের মতে 'ব্রাচড়' অপভ্রংশ থেকে এ ভাষার উদ্ভব। ঘ, ঝ, ধ, ভ-এর মতো সঘোষ মহাপ্রাণধ্বনিগুলির অনেকটা বাঙ্গালী উপভাষার ধাঁচে ন, জ, ড, দ, ব হওয়া এর এক বিশিষ্ট লক্ষণ। একক ব্যঞ্জনে পরিণত যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর এতে দীর্ঘ হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই এর সাহিত্য নির্দশন পাওয়া গেছে। পাঞ্জবীর সঙ্গে এ ভাষার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

চার। **রাজধানী**—রাজস্থান বা রাজপুতানায় প্রচলিত ভাষাই রাজস্থানী ভাষা হিসেবে পরিচিত। মারোয়াড়ী, জয়পুরী, মেবারী, মালবী ইত্যাদি এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। অনুমান করা যায় নাগর অপভ্রংশ থেকেই এর উদ্ভব। এর মধ্যে প্রধান হ'ল পশ্চিমা রাজস্থানী বা মারোয়াড়ী। নাগর অপভ্রংশেরই পশ্চিমা রূপ গুজরাটী। মারোয়াড়ীতে লেখা প্রাচীন গাথা পাওয়া গিয়েছে। নাগরী এবং মহাজনী দু'রক লিপিই এখানে চলিত।

গুজরাটীতে লেখা সাহিত্যরচনার উদাহরণ চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই পাওয়া গেছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে গুজরাটী পশ্চিমা রাজস্থানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক ভাষায় পরিণত হয়। এ ভাষার সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন রয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুগ্ধাববোধ ঔক্তিক' থেকে।

পাঁচ। **মারাঠী**—সম্ভবত মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ থেকে এর জন্ম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে লেখা জ্ঞানদেবের গীতার টীকাভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' এই ভাষার সবচেয়ে পুরনো বই। কিছু কিছু প্রাচীনত্ব এতে রয়ে গিয়েছে। যেমন এর পদের শেষে ই-কার বা উ-কার প্রায় সময়েই লুপ্ত হয়নি। ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগও আছে। এর দু'টি উপভাষা। কোঙ্কনী এব বরারী। মারাঠীতে নাগরী লিপি ব্যবহৃত হয়। অনেকে কোঙ্কনীকে মারাঠীর উপভাষা না বলে একটি পৃথক ভাষার মর্যাদা দিতে চান।

ছয়। **পশ্চিমী হিন্দী**—পরিভাষায় পশ্চিমা হিন্দী বলে চিহ্নিত হলেও সাধারণভাবে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী হিসেবেই এর পরিচয়। এ ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশেরই উত্তরাধিকার। এর প্রধান শাখা দু'টি। একটি মথুরা অঞ্চলের ভাষা—'ব্রজভাষা'। সাহিত্য গৌরবে প্রকৃতই সমৃদ্ধ। অন্যটি—'খড়ীবোলী'। এইটিই প্রকৃত হিন্দী ভাষা। পশ্চিমা হিন্দীর পুরনো রচনার সবটাই ব্রজভাষায়। দক্ষিণভারতে পশ্চিমা হিন্দী মুসলমান কবিদের হাতে বিশেষভাবে অনুশীলিত হয়েছিল। সেই সাহিত্যের ভাষা হ'ল 'দেখ্নী'। এর থেকেই 'উর্দু'-র সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দিল্লীতে এর সূচনা। স্বাভাবিকভাবেই এতে আরবি, ফারসি শব্দের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি এবং লেখাও হয় ফারসি লিপিতে। নাগরী লিপির বিপরীতে যা এক উজ্জ্বল অস্তিত্ব। পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গারু বা হরিয়ানী, কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজী এবং বুন্দেলী উল্লেখযোগ্য।

সাত। **পূর্ব হিন্দী**—ভাষাতত্ত্বগত বিচারে পশ্চিমা হিন্দীর সঙ্গে এর গুরুতর পার্থক্য আছে। এই ভাষাগুচ্ছকে বলে 'কোশলী'। এর মধ্যে তিনটি আছে—অবধী, বাঘলী ও ছত্তিগেড়ী। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে অবধী।

এর প্রাচীন সাহিত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন। উল্লেখ্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আছে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা দাউদ-এর 'চান্দয়ন',—ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধি মুহূর্তে রচিত কুতুবন-এর 'মৃগাবতী', ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মালিক মহম্মদ জায়সী-র 'পদুমাবতী' এবং ঐ শতাব্দীরই শেষ দিকে রচিত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। 'অন্ধমাগধী' অপভ্রংশ থেকেই পূর্বী হিন্দীর উদ্ভব।

আট। **মগধী**—ভোজপুরী, মৈথিলী, মগজী, ওড়িয়া, বাংলা এবং অসমীয়া এই ছটি ভাষা আলোচ্য ভাষাগুচ্ছের অন্তর্গত। এর মধ্যে প্রথম তিনটি হ'ল পূর্বী এবং শেষ তিনটি পশ্চিম মগধী। এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল অতীতকালে 'ল' বিভক্তি, 'ব' প্রত্যয় দিয়ে ভবিষ্যৎকালের গঠন। এ ছাড়াও রয়েছে অতীতকালে প্রথম পুরুষে সকর্মক-অকর্মক ক্রিয়ার রূপগত পার্থক্য।

'ভোজপুরী' বলা হয় কাশীতে। এ ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি বলতে কবীরের গান। 'মগহী'-তে সাহিত্যসৃষ্টি নেই বললেই চলে। অবশ্য 'মৈথিলী' সমৃদ্ধ। উমাপতি ওঝার 'পারিজাত-হরণ' এ ভাষার সবচেয়ে পুরনো সৃষ্টি। রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। জ্যোতিরিশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণর-াকর' উল্লেখ করার মতো গদ্যরচনা। বিদ্যাপতি তো আছেনই।

'ওড়িয়া' এবং **'অসমীয়া'**-র সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অতি নিকট। প্রাথমিক পর্বে একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে থেকে ওড়িয়ার নিজস্বতা প্রথম রূপ নেবার চেষ্টা করে। দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনেই পুরনো ওড়িয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। ষোড়শ-শতাব্দীতে চৈনত্যদেবের সান্নিধ্যে এর সমৃদ্ধি ঘটে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই জগন্নাথ দাস ভাগবত রচনা সম্পূর্ণ করেন। ধ্বনি পরিবর্তন ওড়িয়ায় তেমন কিছু হয়নি। মারাঠী এবং দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব এর ওপর আছে।

'অসমীয়া' বাংলা থেকে আলাদা হয়ে যেতে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর পরে। আমাদের কাছে 'কামরূপী' উপভাষা হিসেবে যার পরিচয় তার সঙ্গে অসমীয়ার পার্থক্য তেমন কিছু নয়। আধুনিক কালে অবশ্য অসমীয়া কামরূপী থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এর সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে এই ভাষাতেই প্রথম নাটক এবং গদ্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে।

নয়। **সিংহলী**—সিংহল বর্তমানে ভারত ভূখণ্ডের বাইরে একটি পৃথক রাষ্ট্র হলেও সিংহলী ভাষার ভারতীয় আর্যভাষারই উত্তরাধিকার। 'প্রাচ্যা প্রাকৃত' থেকেই এর সৃষ্টি। সিংহলের সবচেয়ে পুরনো ভাষা হ'ল 'এলু'। সেখানকার অবহট্‌টের মতো। মহাপ্রাণবর্ণ এখানে অল্পপ্রাণ হয়েছে, তিনটি শিসধ্বনির বদলে আছে কেবল 'খ'-এর অস্তিত্ব। এর ওপর এখন তামিলের প্রভাব আছে। এতে সাহিত্য রচনার নিদর্শন পাওয়া গেছে অষ্টম শতাব্দী থেকে। এ ভাষারই একটি শাখা হ'ল মালদ্বীপে প্রচলিত 'মালী' ভাষা।

দশ। **জিপ্‌সী (Gypsy) বা যাযাবরী**—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে জিপসী বা যাযাবরী ভাষা চলিত আছে ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবেচনায় তা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষারই অন্তর্গত। এই ভাষাগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা

তৃতীয় থেকে পঞ্চম খ্রিস্টব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে দলবদ্ধভাবে বার হয়েছিল। এই জায়গার ভাষার সঙ্গে জিপ্সীর মিল তাই এত বেশি। এশিয়া, ইয়োরোপের অনেক ভাষার শব্দ এতে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা যে দেশে বাস করে সেখানকার ভাষার সঙ্গেই ভারতীয় ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। বাংলার সঙ্গে জিপ্সীর মিল আছে। যেমন 'মই'—অর্থ, 'আমি' ; 'সাপনী'—অর্থ, 'সাপিনী' ; 'তুমে দুই'—অর্থ, 'তোমরা দুজন' ; 'দুই দিবেসা গিলে'—অর্থ, 'দুই দিবস গেলে' ইত্যাদি। ইংরেজি মেশানো জিপ্সী ভাষার উদাহরণ হ'ল—'The tatcho drome to be a jinni mengro is to shun, dik and rig in zi—'The tatcho' (তচ্চো = সত্য-সাচ্চা) 'drome' (পথ) to be a jinni mengro (জ্ঞানী মানুষ) is to shun (শোনা), dik (দেখা) and rig (রাখা) in zi (ধী = মন)।

পুরোপুরি ভাবে টানা অর্থ হ'ল ঃ জ্ঞানী হওয়ার সত্য পথ—শোনা, দেখা এবং মনে রাখা। ইয়োরোপের লোক কখনও এদের বলে বোহেমিও, কখনও 'ইজিপসীয়'—'ই' লুপ্ত হয়ে 'জিপ্সী'। নিজেদের এরা 'রোমানি' বলে পরিচয় দেয়।

২৫.৯ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

এক। **ব্যঞ্জনধ্বনির সরলতা**—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (OIA) যে যুববব্যঞ্জনগুলির মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় প্রধানত সমীভবনের ফলে যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল এখানে তা দাঁড়িয়েছে একটিমাত্র ব্যঞ্জনে। আগের হ্রস্বস্বর হয়েছে দীর্ঘ। ফলত প্রাচীন ভারতীয় আর্যের 'পক্ক' প্রাকৃতে হয়েছে 'পক্ক'—বাংলা বা হিন্দীতে তার রূপান্তর হয়েছে 'পাক'-এ। এইরকম আর একটি দৃষ্টান্ত 'মধ্য'—'মগঝ'—'মাঝ'।

দুই। **সংস্কৃত ধ্বনি** ঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছে অ-কারের সংস্কৃত উচ্চারণ রীতির। পরে যুগ্ম ব্যঞ্জন হয়েছে সরল এবং আগের হ্রস্ব অ-কার রূপান্তরিত হয়েছে দীর্ঘ অ-কারে। যেমন সর্ব—সব্ব—সব ; অষ্ট—অট্ঠ—অঠ প্রভৃতি। ব্যতিক্রমও আছে। কেননা উত্তর-পশ্চিমা উপভাষার ধ্বনিতে পরিবর্তন এভাবে আসেনি। পুরনো রীতি অনুসারে সেখানে কোনো কোনো সময় যুগ্ম ব্যঞ্জন থেকে গিয়েছে। 'অদ্য' হয়েছে 'অজ্জ'।

তিন। **অনুনাসিক ধ্বনির ক্রমাবলুপ্তি** ঃ নব্য ভারতীয় আযভাষার যুগ্ম ব্যঞ্জনের ঠিক আগেকার নাসিক্য ধ্বনিগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসে শেষে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিগুলিকেও অনুনাসিক করে দিয়েছে। পরে এই অনুনাসিক ধ্বনিগুলিই লুপ্ত হয়েছে। 'দন্ত'-এর প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর হয়েছিল 'দান্ত' হিসেবে। আধুনিক বাংলায় এরই রূপান্তরিত আকার 'দাঁত'। 'কম্প' হয়েছে 'কাঁপ' ; 'দণ্ড' হয়েছে 'দাঁড়'। এইরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত।

চার। **ই, ঈ, বা উ, ঊ, জনিত পরিবর্তন** ঃ পদের ভেতরকার ই বা ঈ-র সঙ্গে অ বা আ এবং উ ঊ-এর সঙ্গে অ বা আ যথাক্রমে ই, ঈ, উ, ঊ হয়েছে। এই ধারাতেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'ঘৃত' প্রাকৃতে হয়েছে 'ঘিঅ'। বাংলায় এর থেকে এসেছে 'ঘী'। অনুরূপভাবে 'মৃত্তিকা' হয়েছে 'মাটি' বা 'মাটী'।

পাঁচ। **লিঙ্গ সংক্রান্ত পরিবর্তন** ঃ পদের শেষের স্বরধ্বনি বিকৃত অথবা লুপ্ত হয়েছে। এর ফলে আগেকার লিঙ্গ সংক্রান্ত পার্থক্য প্রায়ই থাকেনি। ক্লীবলিঙ্গ রয়ে গেছে কেবল গুজরাটি আর মারাঠি-তে। অন্য

ভাষাগুলিতে পুংলিঙ্গা-স্ত্রীলিঙ্গাভেদ আছে। কিন্তু সেই ভেদ আর প্রাচীন লিঙ্গা প্রকরণ এক নয়। একই পুংলিঙ্গা-স্ত্রীলিঙ্গা শব্দ কোথাও হয়েছে, পুংলিঙ্গা, কোথাও বা স্ত্রীলিঙ্গা। যে সব শব্দ অ-কারান্ত, তার শেষ লিঙ্গা পরিবর্তন খুবই কম হয়েছে।

ছয়। **প্রাচীন শব্দরূপ, কারক, অনুসর্গ প্রভৃতির নতুনতর বিন্যাস ঃ** প্রাচীন বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম দিককার শব্দরূপের চিহ্ন অপভ্রংশ যেটুকু বিদ্যমান ছিল, পদান্তরে স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ফলে তাও লুপ্ত হয়েছে। এইরকম লুপ্ত প্রাচীন কারক-বিভক্তির জায়গায় দেখা দিল অনুসর্গ এবং অনুসর্গ থেকে তৈরি হওয়া কয়েকটি নতুন কারক-বিভক্তি। পুরনো বিভক্তি কিছু থেকে গিয়েছে। যেমন প্রথমায় ই, উ, এ ; তৃতীয়ায় 'এঁ, এ এবং সপ্তমীতে ই এ। ব্যতিক্রমও আছে। তবে তা উল্লেখ করার মতো নয়। ফলত ষষ্ঠী-চতুর্থী-র, সপ্তমী-তৃতীয়া বা পঞ্চমীর অর্থে যে সমস্ত প্রত্যয়, প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ অথবা অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়েছিল, নতুন কারক-বিভক্তিগুলি অধিকাংশই তার থেকে তৈরি হয়েছে। কয়েকটি বিভক্তির মূল হচ্ছে স্থান বা অঙ্গাবাহক শব্দ। যেমন সপ্তমীতে 'অন্ত' থেকে বাংলা বা অসমীয়ায় এসেছে 'ত', পঞ্জাবীতে তার রূপ হ'ল 'আঁত'।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় কারক বলতে দু'টি। কর্তা বা মুখ্য কারক এবং তির্যক বা গৌণ কারক। পুরনো কর্তৃকারকের অর্থে ব্যবহৃত প্রথমা এবং তৃতীয় বিভক্তি একসঙ্গো মিশে গিয়ে হয়েছে মুখ্য কারক ; ষষ্ঠী ও সপ্তমীর মিশ্রণের ফলে হ'ল গৌণ কারক। অনুসর্গ, অনুসর্গ থেকে জাত বিভক্তিগুলির ব্যবহার গৌণ কারকেই।

সাত। **বচন ঃ** সিন্ধী, মারাঠী এবং পশ্চিমী হিন্দী ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মুখ্য কারকে একবচন বহুবচনের পার্থক্য দূর হওয়ায় বহুত্বজ্ঞাপক শব্দের সাহায্যে বা সম্বন্ধপদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহুবচনের। যেমন বাংলায় সম্বন্ধপদ থেকে জাত 'লোকেরা'। কোথাও কোথাও অবশ্য তৃতীয়ার বহুবচনের পদ থেকে গেছে। যেমন ওড়িয়া, পূর্বীহিন্দী, পশ্চিমী হিন্দী।

আট। **ক্রিয়ার কাল ঃ** নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল এবং ভাবের মধ্যে শুধু কর্তৃ ও কর্মভাববাচ্যে বর্তমান কালের এবং অনুজ্ঞার পুরোনো রূপ থেকে গেছে। কোনো কোনো সময় দেখা যায় ভবিষ্যৎ-কালের রূপের বদল ঘটেনি। সব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠা এবং শতৃ প্রত্যয় যোগ করে অতীতকালের এবং কোনো কোনো সময় কৃত্য, তব্য বা শতৃ প্রত্যয় যুক্ত করে ভবিষ্যৎকাল তৈরি করা হয়েছে। যেমন 'চলা' ধাতুকে অবলম্বন করে চলিত বাংলায় হয়েছে 'চলি', 'ভবন্ত্' থেকে বাংলায় হয়েছে 'হইত', মৈথিলীতে 'হোত্'। নব্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যপর্ব থেকে প্রধানত 'অস্', 'ভূ' বা 'স্থা' ধাতুর পদ মূল ধাতুর অসমাপিকার সঙ্গো যুক্ত করে যৌগিক কালের প্রয়োগ দেখা দিল। এইভাবে 'গত'-র সঙ্গা 'অস্'-এর মিশ্রণে বাংলায় হ'ল 'গিয়াছে'। আবার হিন্দীতে এই 'গত'-র সঙ্গো 'ভূ' বা 'অস্' যোগ করে হ'ল 'গয়া হৈ'। এইরকম

'জানন্ত'-র সঙ্গে 'অস্'-ধাতুর সঙ্গে যুক্ত করে বাংলায় হ'ল 'জানিতেছিল' ; হিন্দীতে 'জানন্ত'-র সঙ্গে 'ভূ' যোগ করে হয়েছে 'জান্তা হৈ'।

২৫.১০ বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব

আর্যভাষা প্রতিষ্ঠার সময়ে দ্রাবিড় ভাষা ভারতে রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিকভাবেই এ ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব এসে পড়ে। ভাষাতত্ত্ববিদ্দের অনেকের ধারণা যে মূর্ধন্য ধ্বনি আর্যভাষায় দ্রাবিড় প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ড. সুকুমার সেন সহ কিছু ভাষাবিদ্ এ কথা সত্যি বলে মনে করেন না।

প্রভাব শুধু সংস্কৃতে নয়, অবশ্যই প্রাকৃতেও। উচ্চারণের ঝোঁক বা য-, বাক্যবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে তা ঠিক করা শক্ত। পঞ্চম শতাব্দীর আগে এ ভাষার দৃষ্টান্ত তেমন নেই। সেই পর্বের সঙ্গে সংস্কৃতের প্রচুর মিশ্রণ ঘটে গেছে। সে মিশ্রণ শব্দ সংগ্রহে, ব্যাকরণরীতিতে বিশেষ করে প্রাকৃতভাষায় সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে নামপদের প্রয়োগে এই মিশ্রণ বা প্রভাব অনুভব করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কৃতে জায়গা পেয়েছে এ কোনো অতিরিক্ত অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে না। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় সেগুলিকে আমরা তদ্ভব শব্দ হিসেবেই দেখেছি।

দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল অন্ধ্রপ্রদেশে, তেলেগু, তামিলনাড়ু ও উত্তর সিংহলে তামিল, কেরলে মালায়লম এবং কর্ণাটক বা সাবেক মহীশূরে কন্নড় বা কানাড়ী। এর মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি তেলেগু ভাষায়। তামিলে সে তুলনায় কম। দ্রাবিড় ভাষার সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন রয়েছে তামিল ভাষাতেই। সাহিত্যিক ঐশ্বর্য্য সবকটি ভাষাতেই রয়েছে।

অন্য দ্রাবিড় ভাষাগুলির কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলবার। এগুলি অবশ্য অনেক কমজোরী। বেলুচিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে কথিত **'ব্রাহুই'** এমন একটি ভাষা। এর চারপাশে যে ভাষাগুলি আছে সেগুলি অবশ্য দ্রাবিড় নয়। রাজমহল অঞ্চলে যে ভাষা বলা হয়ে থাকে তার নাম 'মালপাহাড়ী'। **'কুড়গু'** এবং **'টুলু'**ও দ্রাবিড় ভাষা। এছাড়া রয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যায় অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত **'খোঁড়', 'গোঁড়'** বা **'ওঁরাও'** ভাষা। সবই দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা। সুনীতিকুমারের মতে ব্রাহ্মীলিপির অক্ষরগুলিতে দক্ষিণভারতে বিশেষ রূপ নিয়েছিল। এর থেকেই মালয়ালম, তামিল, তেলুগু এবং কন্নড় বা কানাড়ী লিপির সৃষ্টি। দক্ষিণভারতে এরই বিস্তার।

বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে এখানে আর্য আসবার আগে দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর বাস ছিল। বাংলাদেশে আর্য অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই। ফলে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা সমন্বয়ের ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক ছিল।

প্রসঙ্গত বলতে হয় যে আর্য বৈয়াকরণেরা যে সমস্ত শব্দের সংস্কৃত মূল বা সূত্র ঠিক করতে পারেননি

সেগুলির শ্রেণি ঠিক করেছে **'দেশী'**। অনেক সময়েই সংস্কৃতের মোড়কে অনার্য-দ্রাবিড় শব্দকে সংস্কৃত আকার দেওয়া হয়েছে। ঘোটক, মালা, নীড়, মীন, খল, আলী, কটু, খট্টা—এইসব সংস্কৃত শব্দগুলি মূলগত বিচারে দ্রাবিড় শব্দ।

বাংলা দেশে বিভিন্ন স্থান নামে দ্রাবিড় প্রত্যয়ের পরিচয় খুবই স্পষ্ট। হিট্টা, হিট্টী, ভিট্টা, ভিট্টী বা বালুটে, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, রিষড়া, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া এর উদাহরণ। বাংলায় যে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে শ্বাসাঘাত পড়ে তা আসলে দ্রাবিড় প্রভাবেরই ফল। এছাড়া ১. 'হওয়া' ক্রিয়ার ঊহ্য থাকা এবং ২. ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দের ব্যাপারেও এ প্রভাব ক্রিয়াশীল। লক্ষণীয় যে বৈদিক সংস্কৃতেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে তবে তা সংখ্যায় স্বল্প। বাংলায় যে তার প্রাচুর্য রয়েছে এর কারণ দ্রাবিড় প্রভাব। অনুকারাত্মক শব্দের ক্ষেত্রে তামিল প্রভাবের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। বাংলায় সাধারণত 'ট' দিয়েই অনুকারাত্মক শব্দের প্রয়োগ। তাচ্ছিল্য বোঝাতে 'ফ' চালু আছে।

ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান যে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি এবং আদি স্বরলিপির ক্ষেত্রে দ্রাবিড় প্রভাব রয়েছে। বাংলায় আদিস্বরাগম হয় উচ্চারণের সুবিধে বা সৌকর্যের জন্য। ভাষাবিদেরা দেখিয়েছেন যে তামিল ভাশায় 'র' বা 'ল'-এর মতো শব্দের আগে আদি স্বরাগম খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাতেও এই ব্যাপারটি আছে। তাই সংস্কৃত 'নগ্ন' হয়ে যায় 'লঙ্গা'। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে 'ন'-এর জায়গায় হয়েছে 'ল' এবং 'গ্ন' হয়েছে 'ঙ্গা'। বাংলায় আদিম স্বরাগম তার রূপ হ'ল 'উলঙ্গা'।

'চ'-বর্গের প্রাচীন উচ্চারণ ছিল সৃষ্ট। প্রাকৃতপর্বে তা হয়ে গিয়েছে ঘৃষ্ট। এটি স্পষ্টতই দ্রাবিড় প্রভাবের ফল।

বিশেষণের কমবেশি বা হেরফের নির্দেশ করতে গিয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হয় 'সবচেয়ে ভাল' বা 'সবচেয়ে মন্দ' ধরনের বাকরীতি। এরকম প্রয়োগ বা ব্যবহারের পিছনে দ্রাবিড় প্রভাবের কথা অনেকেই অনুমান করেছেন।

একই কথা প্রযোজ্য কারক বা কারক-বিভক্তির মিশ্রণের ক্ষেত্রেও। যৌগিক ক্রিয়ারূপের সাহায্যে অর্থের বিবর্তনর ব্যাপারেও, অনেকে অনুমান করেন যে বাংলার ওপর দ্রাবিড় প্রভাব আছে। যেমন 'শুনে ফেলা', 'করে দেওয়া' বা 'গড়িয়ে পড়া' ইত্যাদি।

এছাড়া ভারতীয় ধ্বনিসমূহে 'মূর্ধন্য' ধ্বনির উপস্থিতি দ্রাবিড় প্রভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাবিদেরা দেখিয়েছেন যে একমাত্র সুইডিশ ভাষা ছাড়া আর কোনো ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় এর ব্যবহার নেই। ড. সুকুমার সেনের মতো ভাষাতাত্ত্বিকের অবশ্য অন্য মত। তাঁর কথা, এর পক্ষে তেমন যুক্তি কিছু নেই। তার কারণ আর্য ভাষাভাষীদের ভারতে আসবার আগেই এই ধ্বনিটির সৃষ্টি হয়েছিল। সুইডিশ ভাষাতে যে এই ধ্বনিটি এসেছিল তার কারণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় দন্ত্য-ধ্বনির প্রভাব।

অনেকে মনে করেন বহুবচন বোঝাতে বাংলা 'গুলা' বা 'গুলি' বিভক্তির উৎস তামিল বহুচন 'গল' বিভক্তি। এ সম্পর্কে বলতে হয় যে বাংলায় এটি বিভক্তি নয়, শব্দ এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর আগে বহুত্ববোধক অর্থে এর প্রয়োগও নেই। এর অনেক আগেই দ্রাবিড়ের সঙ্গে বাংলা ভাষার সরাসরি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং এই সময়ে দ্রাবিড় প্রভাব সম্ভব নয়।

২৫.১১ বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব

ভারতে আসবার পর আর্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দ্রাবিড় এবং কোল বা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে। কোল ভাষায় 'কোল' শব্দের অর্থ 'মানুষ'। সংস্কৃতে তার অর্থ হ'ল 'শূকর'। এই অর্থান্তরের মধ্যেই এক অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব প্রকাশ পায়। ম্যাক্সমুলর সাহে সেই ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করেই মুণ্ডাজাতি, মুণ্ডাভাষা বলে এর শ্রেণিবিভাজন করেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষজন ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকলেও এরা প্রধানত—অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। **সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, কুরকু, শবর** এবং **গদ** এই মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা। সাহিত্যসম্পদ নেই বললেই চলে। আন্দামানী ভাষার বর্গীকরণ ঠিক হয়নি। নিকোবরী ভাষা 'মনখেমর' গোত্রের।

যাই হোক আর্য-অনার্য সমন্বয়-মিশ্রণের ফলে হ'ল বৈদিক আর্য-সংস্কৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ এবং জৈন সংস্কৃতির আকার নিয়েছে। দেবদেবী কল্পনা বা ভাষা সবক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। এই মিশ্রণের ফলে দেখা গেল যে আর্যভাষার ধাতু ও শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও ভাষার কাঠামো অন্যরকম হয়ে গেল। সুনীতিকুমার লিখেছেন, 'অনার্য-ভাষার মরা গাঙ্গের খাত দিয়া আর্য-ভাষার ধাতু ও শব্দরূপ বহিয়া চলিল।' এর ফলে—অনার্য শব্দেরও প্রবেশ ঘটল। এইসব শব্দের মধ্যে একান্তভাবে এই দেশের বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় এমন শব্দ, নানান গাছপালা, জীবজন্তুর নাম, অনার্যদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি বোঝায় বা প্রাকৃতিক পদার্থের নামও কিছু কিছু নেওয়া হয়েছিল। মোট কথা যাকে হিন্দু সভ্যতা বলি তার নির্মাণে এই অনার্য উপাদান-উপকরণের অবদান অশেষ।

একটি দৃষ্টান্ত। সকলেরই জানা গেছে যে ভারতীয় সভ্যতায় 'পান' বা তাম্বুলের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্কৃতি কিন্তু প্রাচীন আর্যদের কাছে পরিচিত ছিল না। এ জিনিস ভারত, ইন্দোচীন, মালয় বা ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের মানুষদের নিজস্ব জিনিস। কিন্তু আর্য ভাষাভাষীরা একে গ্রহণ করল। অথচ, এটি বোঝানোর মতো কোনো শব্দ তাদের ভাষায় না থাকতে অনার্য ভাষা থেকে তা গ্রহণ করতে হ'ল এবং এইভাবেই 'কোল' গোত্রের 'তাম্বল' শব্দের জায়গা পেয়ে যাওয়া। অবশ্য এত সত্ত্বেও এর 'অ-সংস্কৃত' গন্ধ যায়নি এবং ভারতের বাইরে কোনো আর্যভাষায় এ শব্দ নেই। এটি একান্তভাবেই যেন ভারতবর্ষের এবং এও দেখবার যে ভারতবর্ষের বাইরে ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় কোল ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন মোন্‌খেমর প্রভৃতি ভাষায় ধাতু ও প্রত্যয়

যুক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে 'তম্' উপসর্গের সঙ্গে 'বল' যুক্ত করে 'তম্বল্' এইরকম কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিল। উপসর্গ বাদ দিয়ে শুধু 'বল' শব্দ পাতাজাতীয় বস্তু বোঝাতে ভারতে কখনও কখনও ব্যবহৃত হত। ভারতের বাইরে কোথাও কোথাও এই জাতীয় ভাষায় এখনও এর ব্যবহার আছে। যেমন 'পান' বোঝাতে 'বল্' শব্দের প্রয়োগ খাসিয়া ভাষায় এখনও আছে। এই শব্দের অনুসরণেই 'বাবু' শব্দের ব্যবহার। 'বারুই' ও 'বরোজ' শব্দ দুটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শব্দদুটি অংশত বাংলার দেশি শব্দ এবং এদেশে প্রচলিত অনার্যভাষা থেকেই এসেছে। 'তাঁবোল' ও 'তাম্লী' শব্দদুটির ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন এখানে শব্দের প্রথমে, শেষে এমনকি মধ্যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে অঘোষ, অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির অস্তিত্ব। আছে অর্ধস্বর, স্বর, ব্যঞ্জন এবং অর্ধব্যঞ্জনও। আছে তিনরকম বচন, দু'রকম লিঙ্গ। শব্দদ্বিত্ব। অক্ষর বেশিরভাগই দু'অক্ষরের।

বাংলায় ধ্বন্যাত্মক এবং ভাবাত্মক শব্দগুলির পিছনে রয়েছে কোল বা মুণ্ডা ভাষার প্রভাব। খড়, খুঁটি, খড়ম, খিড়কি, খোকা, চিংড়ি, ঝিঙ্গা, ঝাউ, ঝোল, ডিম্ব, ডিঙ্গা, ঢাক, ঢিবি, ঢোল, ঢেঁকি, ঢিল, মুড়ি, মুড়কি-র মতো শব্দগুলির উৎস এই মুণ্ডা ভাষা। কম্বল, কদলী, বাণ, লাঙ্গাল, লিঙ্গ, লগুড় প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি কোলগোত্রীয় কোনো ভাষাগোষ্ঠীরই অবদান। গুণবার জন্য আমরা যে বুড়ি, বুড়ি শব্দ ব্যবহার করি সেও এই ভাষারই উত্তরাধিকার। এমনকি এ কথাও অনেকে মনে করেন যে গঙ্গা, গোদাবরী প্রভৃতি নদী এবং 'বঙ্গ'—এই নামেও এই অস্ট্রিক বা কোল ভাষার প্রভাব আছে। বাংলা ক্রিয়াপদে লিঙ্গ নেই। সেটিও এই প্রভাবের ফল।

২৫.১১.১ ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠী

এই গোষ্ঠীর তিনটি প্রধান শাখা। তারই একটি হ'ল তিব্বতী-বর্মী বা ভোট বর্মী। এর অনেক উপশাখা ভারতবর্ষে প্রচলিত। এর মধ্যে রয়েছে তিব্বতী, লেপ্চা, কিরান্তি এবং গুরুং শাখা। একত্রে এর পরিচিতি হ'ল ভোটপাহাড়ী। তিব্বতে তিব্বতী ভাষা ভোট। সিকিমে লেপ্চা ভাষা। বৌদ্ধ পুরোহিত অর্থে 'লামা', তিব্বতী কম্বল অর্থে 'ভোট' এবং অপরিশোধিত চিনি বোঝাতে 'ভুরা' শব্দের প্রয়োগ বাংলায় আছে।

অহোম্প্ কাছাড়ী, বোড়ো, গারো, নাগা, লুসাই, টিন্রা, মণিপুরী, কুকিচীনা—সব মিলিয়ে একসঙ্গে আসামী শ্রেণি। 'আসাম' বা 'অসম' শব্দটি এসেছে 'অহোম্' থেকে।

ভারতীয় আর্যভাষায় এই ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব তেমন বিরাট কিছু নয়। ভাষাবিদদের বক্তব্য তাই। তবে কীচক, তসর, সিন্দুর, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শব্দের মূলে এই চীনীয় ভাষার প্রভাব থাকতে পারে। এর থেকে আধুনিক বাংলাতেও কিছু শব্দ এসে গেছে বা নেওয়া হয়েছে। যেমন বর্মী ভাষা থেকে এসেছে 'লুঙ্গি', 'ফুঙ্গি' ; চীনাভাষা থেকে 'চা' বা 'লিচু'-র মতো শব্দ। 'চিনি' কিন্তু চীনা শব্দ নয়। চীনে শর্করার পরিশোধনের কাজ হয়েছিল বলে এর নাম হয়েছিল 'চিনি'।

চিত্র ঃ ক

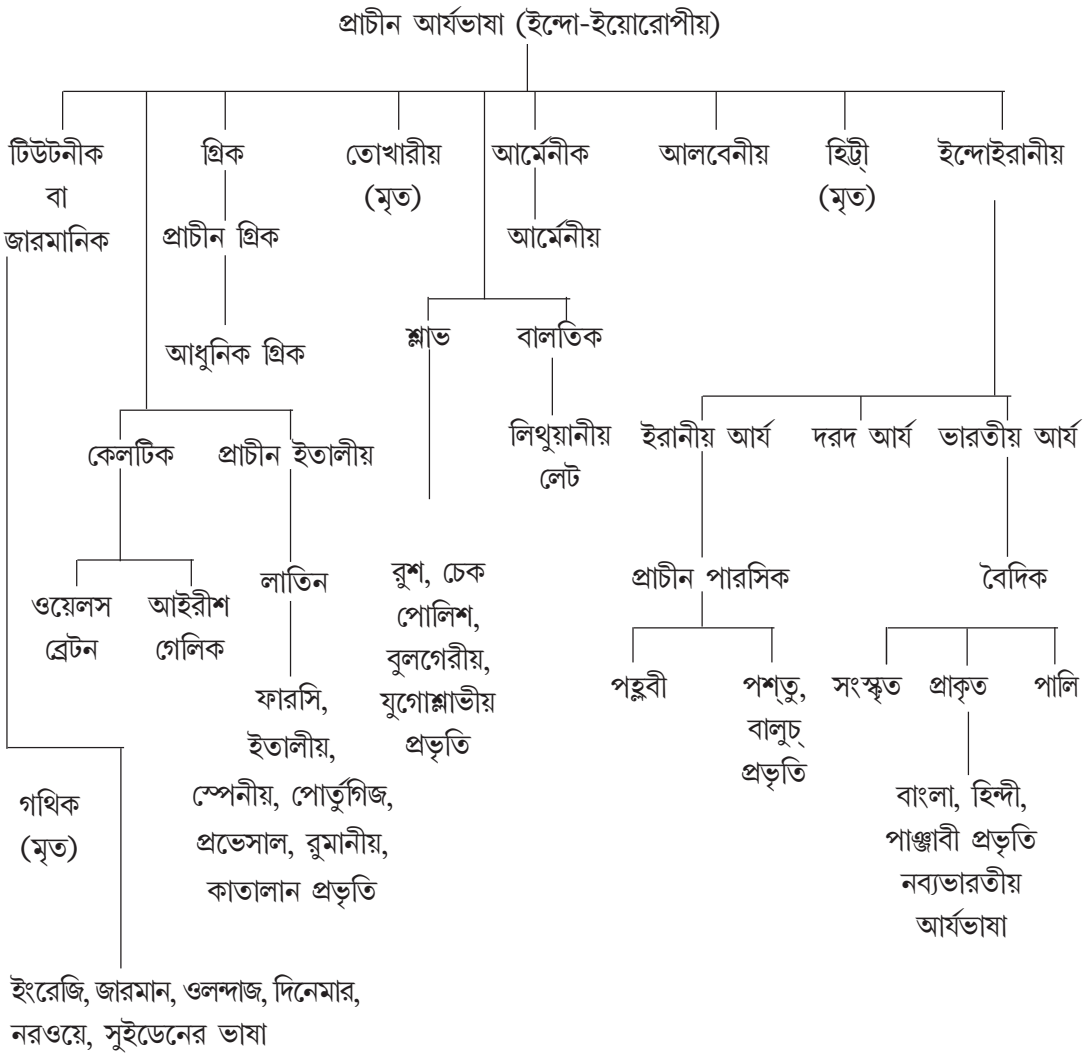
প্রাচীন আর্যভাষা (ইন্দো-ইয়োরোপীয়)
টিউটনীক বা জারমানিক
গ্রিক
তোখারীয় (মৃত)
আর্মেনীক
আলবেনীয়
হিট্রী (মৃত)
ইন্দোইরানীয়
প্রাচীন গ্রিক
আর্মেনীয়
আধুনিক গ্রিক
শ্লাভ
বালতিক
কেলটিক
প্রাচীন ইতালীয়
লিথুয়ানীয় লেট
ইরানীয় আর্য
দরদ আর্য
ভারতীয় আর্য
ওয়েলস ব্রেটন
আইরীশ গেলিক
লাতিন
রুশ, চেক পোলিশ, বুলগেরীয়, যুগোশ্লাভীয় প্রভৃতি
প্রাচীন পারসিক
বৈদিক
ফারসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ, প্রভেসাল, রুমানীয়, কাতালান প্রভৃতি
পহ্লবী
পশ্তু, বালুচ্ প্রভৃতি
সংস্কৃত
প্রাকৃত
পালি
বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষা
গথিক (মৃত)
ইংরেজি, জারমান, ওলন্দাজ, দিনেমার, নরওয়ে, সুইডেনের ভাষা

বাংলার সঙ্গে উদ্ভব সূত্রে সম্পর্কান্বিত ভাষাগোষ্ঠী
সুনীতিকুমার বলেছিলেন বাংলার 'জ্ঞাতি স্থানীয়' ভাষা।

চিত্র ঃ খ

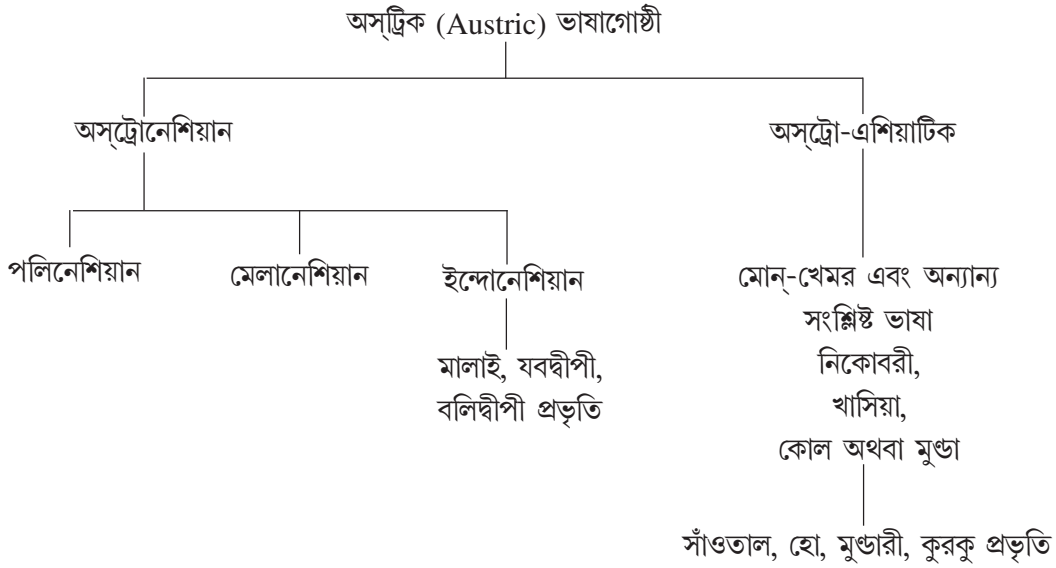

চিত্র ঃ গ

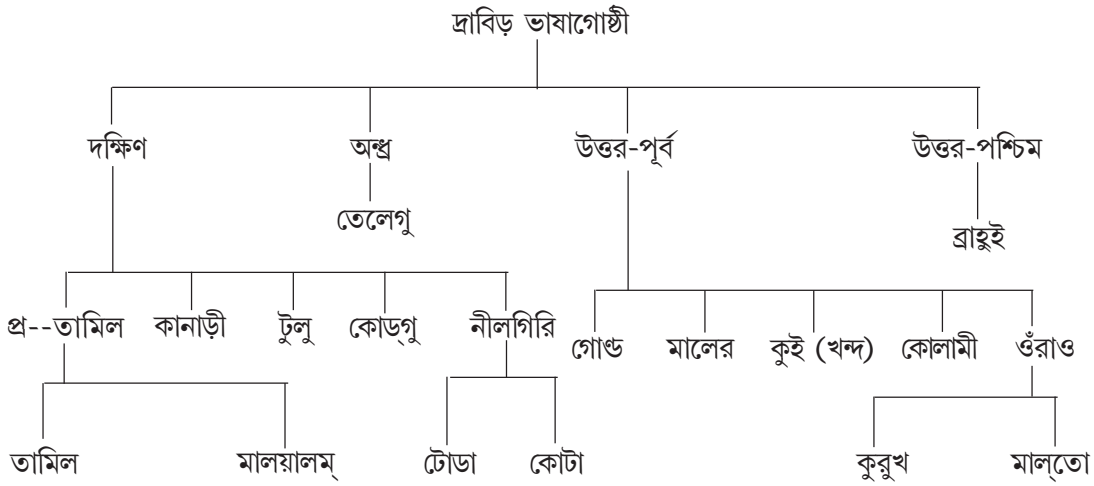

চিত্র ঃ ঘ **নব্যভারতীয় আর্য ভাষা**

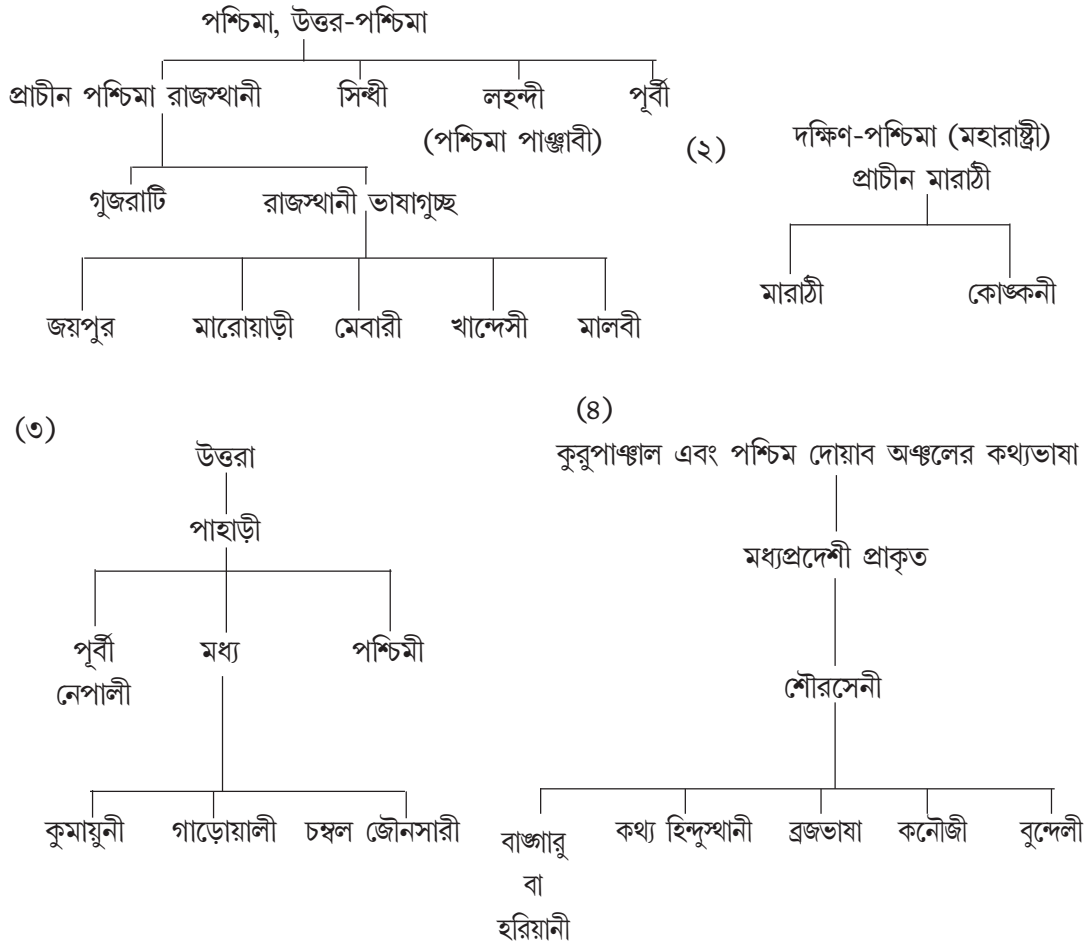

নব্যভারতীয় আর্য ভাষা

(৫)

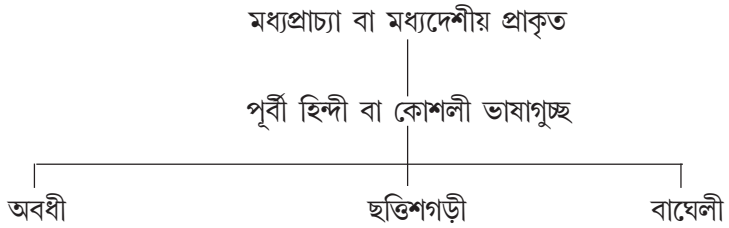

(৬)

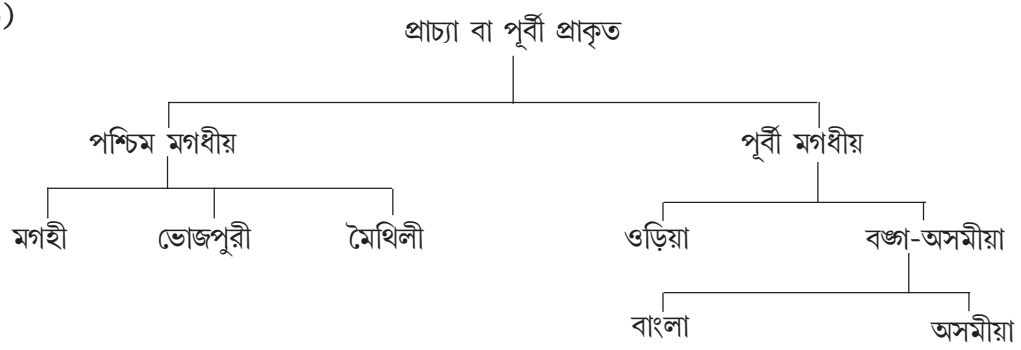

(৭)

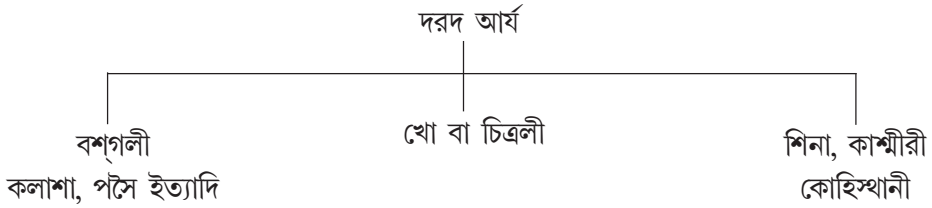

২৫.১২ সারাংশ

আনুমানিক পনেরশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় ভারতবর্ষ আর্যভাষীদের আগমন কাল। ঋক্‌বেদের ভাষা হ'ল প্রাচীনতম। ইন্দো-ইয়োরোপীয় অন্য-কয়েকটি ভাষার প্রসঙ্গও এসেছে। কীভাবে বৈদিক ভাষা পাণিনির হাতে সংস্কৃত হয়েছে সে বিবরণও এখানে রয়েছে। আছে বৈদিক ও সংস্কৃতের তুলনামূলক আলোচনা। প্রাচীন, মধ্য ও নব্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ, নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ এবং প্রসঙ্গাত বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত সহ আলোচিত হয়েছে। এক কথায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে একেবারে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সময়ের ভাষার বিবর্তন বর্তমান অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

২৫.১৩ অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) হিট্টীকে বাদ দিলে কোন ভাষা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন ?

(খ) 'অষ্টাধ্যায়ী'-এর সূত্রসংখ্যা কত ?

(গ) পাণিনি শব্দের কতরকম বিভাজনের কথা বলেছেন ?

(ঘ) 'প্রাকৃত' কথাটির তাৎপর্য কী ?

(ঙ) 'বিকরণ' কাকে বলে ?

(চ) 'ব্রজভাষা' এবং 'খড়বোলী' কোন্ ভাষার স্মারক ?

(ছ) দ্রাবিড় ভাষাগুলির নাম বলুন।

(জ) 'গুলা' বা 'গুলি' বিভক্তিগুলির উৎস কি কোনো দ্রাবিড় ভাষা ?

(ঝ) অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির নাম বলুন।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) বৈদিক ও সংস্কৃতের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণগুলির পরিচয় দিন।

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে মগধী, ওড়িয়া এবং অসমিয়ার সাধারণ পরিচয় দিন।

(ঘ) বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক প্রভাবের প্রধান দিকগুলির উল্লেখ করুন।

২৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ODBI (অংশবিশেষ)।

২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

৩. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৪. শুদ্ধসত্ত্ব বসু—বাংলা ভাষার ভূমিকা।

৫. অতীন্দ্র মজুমদার—ভাষাতত্ত্ব।

৬. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

একক ২৬ ❐ বাংলা ভাষার বিবর্তন

গঠন

২৬.১ উদ্দেশ্য

২৬.২ প্রস্তাবনা

২৬.৩ বাংলা ভাষার বিবর্তন

২৬.৩.১ বাংলা ভাষার কালবিভাজন

২৬.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার লক্ষণ

২৬.৫ মধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণ

২৬.৫.১ অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য

২৬.৬ আধুনিক বাংলার লক্ষণ

২৬.৭ সারাংশ

২৬.৮ উত্তরমালা

২৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলার বিবর্তন তথা পরিবর্তনের ধারাগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- গত হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষায় যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে বর্তমান অধ্যায়ে সংক্ষেপে তার একটি সার্বিক পরিচয় পাবেন।

২৬.২ প্রস্তাবনা

চর্যাপদ-এর সময় থেকে আধুনিক কাল—এই দীর্ঘ সময় নানান পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা যেভাবে বর্তমান রূপে পৌঁছেছে তার পরিচয় দেওয়াই বর্তমান এককের লক্ষ্য।

২৬.৩ বাংলা ভাষার বিবর্তন

২৬.৩.১ বাংলা ভাষার কালবিভাজন

উনিশশো সাত সালে নেপালের রাজদরবার লাইব্রেরী থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'চর্যাপদ'-এর পুথি উদ্ধার করে প্রকাশ করলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই। রচনাকাল আনুমানিক দশম শতাব্দী বা তার অল্প কিছু পরে। বাংলা ভাষার আদিপর্বকে এই আবিষ্কারের ফলে নতুন করে চেনা গেল। কীভাবে এর বিবর্তনটি ঘটেছে সে সম্পর্কে উৎসাহী গৌড়জন নিশ্চিন্ত হলেন।

প্রাচীন বাংলার প্রধান নিদর্শন আমরা পেয়েছি বৌদ্ধ সাধকদের 'চর্যাপদ'-এ, এছাড়া আছে বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস-এর 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন' কাব্যের কয়েকটি শ্লোক এবং 'সেক শুভোদয়া'-য় সংকলিত কিছু গান এবং ছড়া। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা সর্বানন্দ-এর 'টীকাসর্বস্ব' (অমরকোষ-এর ব্যাখ্যা) গ্রন্থে প্রায় চারশো'র বেশি বাংলা, আধা সংস্কৃত, তদ্ভব এবং দেশি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কিছু ভূমিদান পত্র বা শিলাপটের কথাও উল্লেখ করবার মতো। প্রথম পর্বের বাংলা ভাষার উদাহরণ এগুলির মধ্যেই রয়েছে। সময়সীমা আনুমানিক অথবা কমবেশি ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। পরের একশো বছরকে (অর্থাৎ ১২০০ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয়েছে সন্ধিপর্ব।

মধ্যপর্বের বাংলা ভাষার দুটি পর্যায়—(এক) আদি-মধ্য এবং (দুই) অন্ত্য-মধ্য। শেষ পর্যায়ের স্থিতি ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। ড. সুকুমার সেন-এর মতে শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা ভাবলে অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের সীমা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধরাই ঠিক হবে। তবে এর সঙ্গে সাহিত্যিক ব্যবহারের দিক লক্ষ্য রাখলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমা বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

২৬.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার লক্ষণ

সাধারণভাবে লক্ষণগুলি হ'ল এইরকম ঃ

এক। চর্যাপদ-এর ভাষায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জণবর্ণের ধ্বনিগত বিশিষ্টতা আধুনিক বাংলার মতোই। তবে সংস্কৃত বানানগুলির প্রয়োগ বা ব্যবহারে বিচ্যুতি আছে। যেমন সবর/শবর, পানি/পানী। এই একই ধরনের বিচ্যুতি আছে শ, ষ, স-এর প্রয়োগেও। ন, ণ সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। যেমন বলা চলে অ, ই এবং এ-কারের আপাত বিশৃঙ্খলা সম্পর্কেও। বানান বিভ্রাট ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটেনি, ঘটেছে অসতর্কতা বা অজ্ঞতার জন্য। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ডুম্বী, ডোম্বী যেমন আছে তেমনি ডোম্বি, শবরি বানানও আছে।

দুই। সমীভূত যুগ্মব্যঞ্জন সরল হয়েছে। সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি হয়েছে দীর্ঘ। এই দীর্ঘতা অবশ্য লেখায় নেই। যেসব ব্যঞ্জনের সঙ্গে ঙ, ঞ, ণ, ম যুক্ত থাকত তাদের পূর্বস্বর দীর্ঘ হত। সেগুলি লুপ্তপ্রায় হয়ে তাদের জায়গায় সানুনাসিক স্বরধ্বনি এসে গেল। যেমন 'ধর্ম' হয়েছে 'ধাম',

'জন্ম'—'জাম', 'মাধ্যন'—'মাঝেঁ' প্রভৃতি। এর ব্যতিক্রম রয়েছে অর্ধতৎসম শব্দে। সেখানে যুক্তব্যঞ্জন থেকে গেছে। যেমন 'দুর্লক্ষ্য' থেকে আসা 'দুলক্খ', 'মিথ্যা' থেকে জাত 'মিছা'।

তিন। ক্রিয়াপদের শেষে 'অ' লুপ্ত হয়েছে। 'উট্ঠিঅ' হয়েছি 'উঠি'। কিন্তু মূল বিশেষণপদ যখন ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হয়েছে, তখন তার শেষে 'অ' থেকে গেছে। লুপ্ত হয়নি। যেমন 'করিঅ', 'জ্বলিঅ' প্রভৃতি। আদিতে এগুলি 'কৃত', 'জ্বলিত' এই অর্থপ্রকাশক পদ ছিল।

চার। র-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির ব্যবহার লক্ষণীয়। পাঁচ, সাত বা বত্রিশ সংখ্যক চর্যায় 'নি অড়ি' 'নিয়ড়ি' পদে এবং এগার সংখ্যক চর্যায় 'ন আড়ি' পদে য়-শ্রুতির উদাহরণ আছে। এইরকম ব-শ্রুতির উদাহরণ রয়েছে বারো সংখ্যক পদের 'নওবল', আঠারো সংখ্যক পদের 'ভুঅন' এবং দশ সংখ্যক চর্যার 'নাবেঁ' পদে। এই 'নাবেঁ' রূপান্তরিত হয়েছে 'নাএঁ-তে।

পাঁচ। এর, অর এবং র বিভক্তির সাহায্যে ষষ্ঠীর পদ সম্পন্ন করা হত। চর্যায় আছে 'রুহের তেন্তলি' অর্থাৎ গাছের তেঁতুল বা 'ডোম্বী-এর সঙ্গো' অর্থাৎ 'ডোম্নীর সঙ্গো'। ষষ্ঠী বিভক্তির পদ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। যেমন, 'তোহোরি কুড়িয়া' বা 'হানেরি মালী'। পুরোনো ষষ্ঠীর পদও আছে। দৃষ্টান্ত—'ক্ষণস্য' থেকে 'খণহ', 'যস্য' থেকে 'জাহ'।

ছয়। কে, কে রে বিভক্তি দিয়ে গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের পদ সাধিত হত। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় 'নাশক' অর্থাৎ নাশের জন্য, 'বাহবকে পারই' বা বাইতে পারে, 'কেহ কেহ তোহোরে বিরুআ বোলই' অর্থাৎ কেউ কেউ তোকে বিরূপ বলে।

সাত। ই, এ, হি, তে—সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ। এই ধারায় 'গৃহকে' থেকে এসেছে 'ধরে', 'হৃদয়াভিঃ' অথবা 'হৃদয়ধি' থেকে এসেছে 'হিঅহি'।

আট। রূপে এবং প্রয়োগে করণের সঙ্গো মিল থাকায় সপ্তমীতে কোনো কোনো সময় 'এঁ' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়—যেখানে ঐ 'এঁ' বিভক্তি মূলত তৃতীয়ারই চিহ্ন। যেমন 'ঘরেঁ'।

নয়। প্রধানত অধিকরণ কারকই 'তির্যক কারক' (রূপতত্ত্বগত বিচারের নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় কারক দুটি—কর্তা বা মুখ্য কারক এবং **তির্যক বা গৌণ কারক।** প্রাচীন প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে মুখ্য কারক, ষষ্ঠী সপ্তমী মিশে গিয়ে হয়েছে গৌণ কারক। অনুসর্গ এবং অনুসর্গ থেকে সৃষ্ট নতুন বিভক্তিগুলিও তির্যক বা গৌণ কারকে ব্যবহৃত হয়।) হওয়ায় অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার এসে গেল। উদাহরণ 'জানে কাম কি কামে জান'—অর্থাৎ জন্ম থেকে কর্ম কি কর্ম থেকে জন্ম। অথবা, 'ডোম্বীতে আগলি নাহি ছিণালী' অর্থাৎ ডোম্নীর থেকে বড় ছিণাল আর কেউ নেই।

দশ। পঞ্চমীতে অপভ্রংশ-জাত 'হু' বিভক্তির প্রয়োগ দু'বার পাওয়া গেছে। এইভাবে 'ক্ষেপভ্যম' থেকে এসেছে 'খেপহু' ; 'র-াৎ' থেকে 'রঅণহুঁ'।

এগারো। তৃতীয়া বিভক্তি, 'এঁ' সংস্কৃতের 'এন' থেকে এর সৃষ্টি। 'বেগেন' হয়েছে 'বেগেঁ' 'গজবরেন—'গজবরেঁ',

'সন্ধানেন' হয়েছে 'সন্ধানে'। চর্যার প্রায় প্রত্যেক পদেই এরকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। সপ্তমীর সঙ্গে এক হওয়ায় তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন হিসেবে 'তেঁ', 'তে' বা 'এঁতে' বিভক্তির প্রয়োগও দেখা গেল। দৃষ্টান্ত ঃ 'সুখদুখেঁতে' (সুখদুঃখ + অন্ত + এন)

বারো। আক্ষে, তুক্ষে সংস্কৃতে বহুবচন বোঝাত। প্রাচীন বাংলায় এর একবচনে ব্যবহারও হয়েছে। অবশ্য 'অহকম্' শব্দজাত 'হউ' তখন পুরো লুপ্ত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'আক্ষে দেহুঁ', অর্থাৎ আমি দিই। 'ময়েন' থেকে আসা 'মই' এবং 'ত্বয়েন' থেকে আসা 'তঁই' প্রধানত করণকারকের পদ। এখন তখন কেবল কর্মভাববাচ্যের কর্তা হিসেবেই চলিত ছিল। যেমন 'মই দেখিল'-এর উৎস সংস্কৃতের 'ময়া দৃষ্টম্'।

তেরো। কর্তৃকারক ছাড়া অন্যান্য কারকের অর্থে বিভিন্নপদ অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। উদাহরণ ঃ 'তঁইবিনু'র মূল 'ত্বয়া বিনা', 'তোহোর অন্তরে', অর্থ হ'ল—'তোর তরে', 'অধরাতি ভর কমল বিকসিউ', অর্থ—আর্ধেক রাত ধরে কমল বিকশিত হ'ল। অনুরূপ দৃষ্টান্ত ঃ 'দিআঁ চঞ্চালী' অর্থ হ'ল—'চেঁচাড়ী দিয়ে'।

চৌদ্দ। ধাতুরূপের বর্তমান কালের উত্তমপুরুষে পেখমি, জাণমি, পুছমি ঃ করহুঁ, লেহুঁ, মধ্যম পুরুষে আইমসি, পুছসি, জানহ ; প্রথম পুরুষে পেখই, ভণই, চাহন্তি, কহন্তি, ভণসি, বোলসি প্রভৃতির প্রয়োগ চলিত ছিল।

পনেরো। অতীতকালে বোঝাতে প্রায় ক্ষেত্রেই 'হল' বা 'ল' এবং মধ্যম পুরুষে 'মি' 'ম' যুক্ত করা হত। উত্তম বা প্রথম পুরুষে 'ইল' বা 'ল' সাধারণভাবে নির্বিচারে ব্যবহার করা হত। যেমন 'মই দেখিল' বা 'শবরী দিল' ; 'লা' বা 'লী' যোগ করে 'বাট রুন্ধেলা', 'সোনে ভরিলী'। মধ্যম পুরুষে আছে 'অছিলেস', 'নিলেসি'।

ষোল। ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ বোঝাতে 'ইব', 'মি'—চলিত ছিল। যেমন 'করিব নিরাস', 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ'। মধ্যম পুরুষে যুক্ত হত 'বে', 'সি', যেমন 'যাইবে', 'মারিহসি', প্রথম পুরুষে ছিল 'ই'-এর প্রয়োগ। উদাহরণ ঃ 'করিহ', 'কহিহ' প্রভৃতি।

সতেরো। কর্মভাববাচ্যেও ক্রিয়াপদে অতীতকাল বোঝাতে 'ই', 'ইল' এবং ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে যুক্ত হ'ত 'ইব' বিভক্তি। ক্রিয়া যদি সকর্মক হত, তাহলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হত। অকর্মক হলে প্রথমা বিভক্তি। এইরকম ক্রিয়াপদ সাধারণভাবে কর্তৃপদের বিশেষণ হিসেবেই বিবেচিত হত। অর্থাৎ কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে ক্রিয়াপদেও লাগত স্ত্রীপ্রত্যয়। যেমন 'চলিল কাহ্ন'—এর মূল হল 'কৃষ্ণঃ চলিতঃ'। অনুরূপভাবে 'অগ্নিকা লগ্না' থেকে 'লাগেলি আগ্নি'। ভাববচন (Abstract Noun) পদের সঙ্গে 'যা' ধাতুর পদ যৌগিক কর্মভাববাচ্য চলিত হয়েছিল। যেমন 'ধরণং ন জাতি' থেকে চর্যাপদের 'ধরণ এ যাই'।

আঠারো। শব্দরূপের প্রকাশে একবচন এবং বহুবচনের কোনো পার্থক্য ছিল না। বহুবচন বোঝাতে 'সকল',

'লোক', 'জাল', 'গণ' প্রভৃতি বহুত্বজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হত। উদাহরণ ঃ 'পণ্ডিত লোঅ', অর্থাৎ পণ্ডিত লোকেরা, 'জোইনি জাল' অর্থাৎ যোগিনীরা। অনুরূপভাবে 'সকল সমাহিঅ' অর্থাৎ সকল সমাধির দ্বারা।

উনিশ। সংস্কৃত অনুসারী সমাসবদ্ধ পদও বাংলায় ছিল যথেষ্ট। যেমন 'কমলরস', 'মহাবরু', 'মোহতরু', 'কায়াতরুবর' প্রভৃতি। সংখ্যা বোঝায় এমন শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা সর্বানন্দ-এর 'টীকাসর্বস্ব' (অমরকোষ-এর টীকা) গ্রন্থে বেশ কিছু বাংলা তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম ও দেশি শব্দ পাওয়া গেছে। যেমন 'তির্যক' থেকে আসা 'টেরা', 'পরস্ব' থেকে আসা 'পরশু'। অনুরূপভাবে 'ঝম্পান', 'তেলাকোন', 'পিম্পড়ি' প্রভৃতি।

রাজকীয় ভূমিদান পত্রেও কিছু দেশীয় নাম পাওয়া যায়। যেমন 'চবটি গ্রাম' (চট্টগ্রাম), 'কণামোটিকা' (কানামুড়ি), 'নড্‌জোলি' (নাড়াজোল) ইত্যাদি। কিছু কিছু খাঁটি বাংলা শব্দও এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন আঢ়া, খিল, জাঙাল, নাল, বরজ, গাড্ডা প্রভৃতি।

অনেকেরই দাবি হ'ল যে চর্যাপদ-এর ভাষা নাকি হিন্দীরই প্রাচীন রূপ। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদের অভিমত হল যে চর্যাপদাবলীর এমন বেশ কিছু শব্দ বা বাক্‌ বিধির ব্যবহার আছে যার সঙ্গে আধুনিক বাংলার বিশেষ রীতি বা প্রকাশভঙ্গির মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। 'তা দেখি', 'জে জে আইলা তে তে গেলা', 'সরি পড়িআঁ', 'থির করি', 'দুহিলা দুধু', 'গুনিয়া লেহুঁ' প্রভৃতি এই সমস্ত প্রয়োগবিধির দৃষ্টান্ত। প্রাচীন বাংলায় প্রবাদ বাক্যের সংখ্যাল্পতা ছিল না। এছাড়াও 'ইল' প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রিয়ার অতীতকাল এবং 'ইব' প্রত্যয় দিয়ে ভবিষ্যৎকাল বোঝানোর ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে চর্যাপদ-এর ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষারই নিদর্শন।

২৬.৫ মধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণ

সামগ্রিকভাবে মধ্য বাংলার সময়সীমা আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এর উপস্তর দুটি। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আদি মধ্যস্তর ; ১৫০০ থেকে ১৭৫০ বা আরও একটু বাড়িয়ে ধরলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ—অন্ত্য মধ্যস্তরের সীমা। প্রথম স্তরের ভাষার পরিচয় রয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং তার সমসাময়িক কিছু মঙ্গলকাব্য, ভাগবতের অনুবাদে। কৃত্তিবাসী রামায়ণক্ষেত্র ধরা যায়। তবে সেখানে এত প্রক্ষেপ ঘটেছে যে আদি নিদর্শন নেই বললেই হয়। পরবর্তী স্তরের ভাষায় দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত। তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী, সমসাময়িক মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, চট্টগ্রামের মুসলমানী সাহিত্য, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সবই পড়ে।

আদি মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্টতা বা সাধারণ লক্ষণগুলি হল ঃ

এক। আ-কারের পরে অবস্থিত ই-কার, উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা এবং পাশাপাশি দু'টি স্বরধ্বনির অবস্থান। যেমন বড়াই—বড়া^{ই} ; আউলাইল—আ^{উ}লা^{ই}ল।

দুই। মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণতার ক্ষীণতা বা লুপ্তি। এইভাবে 'কাহ্ন' হয়েছে 'কান', 'আহ্মি' হয়েছে 'আমি'।

তিন। চর্যাপদে বহুবচন সৃষ্টিতে জাল, ভাগ, সমূহ, কূল প্রভৃতি যুক্ত হত। 'রা' শব্দ যোগে বহুবচনের ব্যবহার বা প্রয়োগ এই সময়ে শুরু হ'ল। যেমন, 'আক্ষারো', 'তোক্ষারা'।

চার। 'ইল' শেষে আছে এমন অতীতের এবং 'ইব' শেষে আছে এমন ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার শুরু হ'ল। দৃষ্টান্ত ঃ 'মো শুনিলোঁ' (অর্থাৎ আমি শুনলাম), 'মো দেখিলোঁ, 'মো করিবোঁ', 'মো নাসিবোঁ' প্রভৃতি।

পাঁচ। প্রাচীন (ইঅ) বিকরণ সমন্বিত কর্মভাববাচ্য ক্রমশ অচলিত হয়ে এল। যৌগিক ভাবকর্মবাচ্য তৈরি হওয়াটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে 'যা' ও 'ভু'-ধাতুর সাহায্যে। যেমন ততকে মুঝাল গেল মোর মহাদানে', 'সে কথা কহিল নয়।'

ছয়। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হল। যেমন—লই + আছে = লইছে, রহিল + আছে = রহিলছে।

সাত। আভিমুখ্য এবং প্রাতিমুখ্য বোঝাতে 'সিয়া' (অর্থাৎ এসে এবং গিয়া) যথাক্রমে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হত। যেমন ঃ দেখ সিয়া—দেখ সে, দেখ গিয়া—দেখ গে প্রভৃতি।

আট। চর্যায় ছন্দ ছিল মাত্রামূলক, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। ফলে ষোলো মাত্রার পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা থেকে চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের বিকাশ ঘটল।

২৬.৫.১ অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য

এক। অন্ত্যস্বরের লোপ (apocope) এবং মধ্যস্বরের লোপ প্রবণতার ফলে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা এসে গেল। পদের শেষে একক ব্যঞ্জনের পরের যে অ-কার তা লুপ্ত হ'ল। দৃষ্টান্ত—রাবণ, টোপর্, দাম্, ঘাম্, জল্, ভাত্ প্রভৃতি। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন শক্ত, ভক্ত, গোবিন্দ প্রভৃতি। শুধু অন্ত্যস্বর নয়, মধ্যস্বরের লুপ্তিও একালের ভাষাকে সরল করে তুলেছে। যেমন—গাম্ছা, রান্না, অপ্রাজিত প্রভৃতি। ফলে দ্বিমাত্রিকতার ব্যবহার এসে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক। তাই হয়েছে।

দুই। **অপিনিহিতি এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের পরিবর্তন অভিশ্রুতি** এই পর্বেই দেখা দিল। এগুলি আধুনিক সময়ের ভাষারই বৈশিষ্ট্য। তবে তা দেখা দিয়েছে এই পর্বেই। বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তনের ক্রমরেখাটি এইরকম ঃ

কালি—কাইল, চারি—চাইর, মারি—মাইর।

কালি—কাইল—কাল, বানিয়া—বন্যা—বেনে, আকুল—আউল—এলো, জলিয়া—জাল্যা—জোল প্রভৃতি।

অপিনিহিত বা বিপর্যস্ত উ হয়েছে ই ; পরে এই 'উ' ধ্বনিও লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'ধাতু'—ধাউত—হয়েছে ঢেল। সন্ধি অথবা লুপ্তির পর অভিশ্রুতি হয়েছে। 'করিয়া' হয়েছে কইরা—ক'রা—কর্যা—কোরে। এইরকম খাইয়া—খেয়ে, পাত্তিয়া—পেতে।

তিন। সাধু এবং চলিত ভাষায় ঢ়, ন্হ ও ম্হ—এইসব মহাপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'বুঢ়া' হয়েছে বুড়া, 'কাহ্ন'—কান, 'আহ্মর'—আমার, 'আহ্মি'—আমি।

চার। 'ইআ' হয়েছে এ্যা অথবা এ। 'উআ' হয়েছে 'ও'। যেমন 'বনিয়া' হয়েছে 'বন্যা', তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'বেনে' শব্দটি। অনুরূপভাবে 'সাথুয়া' হয়েছে, সেথো, 'জালিয়া'—জেলে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট।

পাঁচ। বিশেষ্য কর্তার বহুবচনে রা, নির্দেশক বহুবচনে 'গুলা', 'গুলি' বিভক্তি এবং তির্যক কারকের বহুবচনে 'দি', 'দিগ', 'দে' বিভক্তির প্রয়োগ সপ্তদশ শতাব্দীতেই দেখা দিয়েছিল।

ছয়। 'ইল', 'ইব' যথাক্রমে অতীতে ও ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হতে লাগল। অতীতে এগুলি যুক্ত হত কর্মবাচ্যে। যেমন 'মই করিল', 'মুই করিলাঙ্', 'তেঁ করিব', 'সে করিবে' ইত্যাদি।

সাত। 'আছ' ধাতু যোগ করে যৌগিককালের ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেল। যেমন 'আসিছি', 'আসিতেছে', 'আসিয়াছিল' প্রভৃতি।

আট। কোনো একটি বিশেষ ধাতু ব্যবহার না করে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে—ক্রিয়ার অর্থপ্রকাশ পরবর্তীকালের সংস্কৃতের লক্ষণ। 'নৃত্যতি' ব্যবহার না করে 'নৃত্যং করোতি', 'গমনং করোতি', দর্শনং করোতি' প্রভৃতি হ'ল এর উদাহরণ। এই ব্যবহার অপভ্রষ্ট-অবহট্ঠের মধ্যে দিয়ে বাংলায় চলে এল। অন্ত্য-মধ্য পর্বের সাধু বাংলায় এর ব্যবহার অনেক তদ্ভব ধাতুকেও অচলিত করে দেয়। যেমন—ভ্রমণ করে, শ্রবণ করে প্রভৃতি। এমনকি পালি-পর্বে ব্যবহার শুরু হয়েছিল এমন সব নতুন বিকরণ দিয়ে ধাতুগুলি নতুন রূপ লাভ করে। সংস্কৃত 'জিনাতি' থেকে সৃষ্ট 'জিনা', 'জিনিল', 'জিনিবে'। 'উপবিশিতি'—'বসে', 'নিবর্ততে'—'নেওটা', 'বুলা' অর্থ চলে বেড়ানো, 'গোড্ড' এই দুই দেশি ধাতু থেকে এসেছে 'গোড়া' ; অর্থ হ'ল—পিছনে পিছনে যাওয়া, অনুগমন করা।

নয়। সংস্কৃত শব্দকে নামধাতু হিসেবে প্রয়োগের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন 'নিমন্ত্রিয়া', 'কাতরিয়া', 'প্রণমিলা', 'অগ্রসরি', 'প্রবর্তিতে' প্রভৃতি।

দশ। প্রচুর পরিমাণে আরবি, ফারসি, কিছু তুর্কি এবং শেষদিকে পোর্তুগিজ শব্দও অন্ত্য-মধ্যস্তরের বাংলায় চলে এসেছে। কমবেশি আড়াই হাজারের মতো ফারসি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবে।

এগারো। অবহট্ঠ এবং প্রাচীন মৈথিলী থেকে আসা ব্রজবুলি ভাষা এই পর্বের বাঙালি লেখকেরা রীতিমতো অনুশীলন করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণব মহাজন কবিরা এ ব্যাপারে প্রকৃত সাফল্য দেখিয়েছেন। এই কৃত্রিম ভাষার অনুশীলন অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অসম এবং বাংলাদেশেই বেশি হয়েছে। এর সঙ্গে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট পদ এবং প্রয়োগও কিছু এসে গেছে।

বারো। অন্ত্য-মধ্য পর্বের বাংলা ভাষায় লিখিত এবং মুখের ভাষার মধ্যে তেমন কোনো রীতিসম্মত পার্থক্য ছিল না। এ দু'য়ের মিশ্রণ সকলেই মেনে নিয়েছিলেন।

২৫.৬ আধুনিক বাংলার লক্ষণ

আধুনিক বাংলার সূচনা মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব থেকে। এই সময় থেকেই সাহিত্যসৃষ্টিতে 'সাধু' ভাষার ব্যবহারও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল।

সংক্ষেপে এই পর্বের ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হল ঃ

এক। লিখবার ভাষা মুখের ভাষা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সাধুভাষা হিসেবে সাহিত্যের একমাত্র বাক্‌রীতির আকার নিয়েছে। অন্ত-মধ্য পর্বের বাংলায় লিখবার ভাষা এবং কথ্য ভাষায় যে মিশ্রণ আমরা লক্ষ করেছি, এখন তা আর থাকল না।

দুই। অন্ত্য-মধ্য পর্বে অপিনিহিত স্বরধ্বনি অভিশ্রুত ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। স্বরসঙ্গতিও হয়েছে। যেমন 'হাটুয়া'—'হোটো', 'নাটুয়া'—'নেটো', 'মাধব'—'মেধো' প্রভৃতি। অপিনিহিতি না ঘটলেও পাশাপাশি অবস্থিত স্বর পরিণত হয়েছে একস্বরে। 'আকুল' হয়েছে 'এলো।' যেমন 'এলো কেশ'। এই পর্বে স্বরসঙ্গতি রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। যেমন—জলো, গেছো, মেছো, পটো ইত্যাদি অজস্র দৃষ্টান্ত।

তিন। নিজন্ত ধাতুর অর্থ অনিজন্ত হয়ে গেছে। যেমন, 'পেলা', 'ফেলা' বা 'পৌঁছায়' প্রভৃতি ধাতু।

চার। সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যেমন—দান করা, পান করা, আহার করা, উপবেশন করা, ভ্রমণ করা প্রভৃতি। নামধাতুর ব্যাপক প্রয়োগ সাধু এবং চলিত দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ঘটেছে।

পাঁচ। নঞর্থক 'ন' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন ও মধ্যপর্বের বাংলায় ক্রিয়াপদের আগে ছিল। যেমন 'আমার শপতি লাগে না যাইও ধেনুর আগে'। আধুনিক বাংলায় এর প্রয়োগ হ'ল ক্রিয়াপদের পরে। তবে কবিতায় পুরোনো রীতি একেবারে বাদ পড়েনি। মধুকবির কাব্যে এর বিশেষ প্রয়োগ আছে। সম্ভাবক ভাবেও পুরোনো প্রয়োগ বিদ্যমান। যেমন—'সে না শোনে, না শুনবে' বা 'না করল তো না করল বয়েই গেল'।

ছয়। সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ। যেমন—রমেন সেখানে গেল। সে দেখল। সে অবাক হ'ল। এই তিনটে বাক্য না লিখে লেখা হল—'রমেন সেখানে গিয়ে দেখে অবাক হল।'

সাত। অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে ভাববাচক শব্দের সঙ্গে 'পূর্বক' বা 'করতঃ' যোগ করে। যেমন—গমনপূর্বক, গমনকরতঃ, দর্শনপূর্বক, দর্শনকরতঃ প্রভৃতি।

আট। পদের ও বাক্যের সংযোগ সাধনে ফারসি অব্যয় 'ও' (ফারসি 'ব' জাত)-এর প্রয়োগ 'এবং'-এর সঙ্গেই রয়েছে। যেমন—'নারী ও পুরুষ', 'সে সেখানে গেল ও দেখল'। সংস্কৃত 'অপি' থেকে সৃষ্ট অব্যয় 'ও' শব্দের সঙ্গ—চলতে লাগল। যেমন সোহপি—সেও।

নয়। গদ্যরীতির প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা হ'ল। শুধু তাই নয় এর প্রসারে পুরনো পদ্যরীতি ম্লান হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কিছু আগে থেকেই এর ফলে সাহিত্যের বোধ ও সীমা প্রসারিত হয়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হ'ল এই পর্বেই। সাহিত্যিক গদ্যকারের অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এর পলে আমাদের যে গদ্যের পত্তন হল তা অবশ্যই পণ্ডিতী রীতির। তৎসম শব্দের বাহুল্যও তাই এতটা। তবে এও বিশেষভাবে বলবার যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে, সেই সূত্রে ব্যবসায়িক নানা প্রয়োজনে ওলন্দাজ (হল্যান্ডের অধিবাসী), ফরাসি ইত্যাদি জাতির সঙ্গে সংযোগ—সম্পর্ক নিবিড় হওয়ায় ইংরেজি সমেত বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ আইন-আদালত বা প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলায় গৃহীত হতে থাকল। কাজকর্মে ফারসি শব্দের ব্যবহার ক্রমেই কমে আসতে থাকল। সে জায়গায় ছায়া দীর্ঘ হ'ল ইংরেজি, শেষ পর্যন্ত তার প্রভাবই যেন একমাত্র। এর কারণ অবশ্য ইংরেজের রাজনৈতিক আধিপত্য। সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান।

২৬.৭ সারাংশ

প্রথমে বাংলা ভাষার কাল বিভাজন। চর্যাপদ-এর বাংলা ভাষা থেকে আরম্ভ করে আদি-মদ্য এবং অন্ত্য-মধ্য পর্বের বাংলা ভাষার নানান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরে রয়েছে আধুনিক বাংলা ভাষার বিবরণ, যার পরিণতিতে গদ্যভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ।

২৬.৮ অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) 'চর্যাপদ' ছাড়াও আর কোথাও কোথায় প্রাচীন বাংলার নিদর্শন আছে?

(খ) প্রাচীন বাংলায় অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ দিন।

(গ) 'চর্যাপদ' যে প্রাচীন বাংলাই তার অব্যর্থ লক্ষণ কী?

(ঘ) মধ্য বাংলার দুটি উপস্তরের উল্লেখ করুন।

(ঙ) আধুনিক বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ কী?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) প্রাচীন বাংলার অন্তত দশটি সাধারণ লক্ষণের পরিচয় দিন।

(খ) আদি মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্টতার দিকগুলি উল্লেখ করুন।

(গ) আধুনিক বাংলার সাধারণ লক্ষণগুলি আলোচনা করুন।

২৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য়)।

৪. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। (১ম ও ২য়)।

৫. ড. জীবন্দেু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

একক ২৭ ❐ আধুনিক বাংলা উপভাষা

গঠন

২৭.১ উদ্দেশ্য

২৭.২ প্রস্তাবনা

২৭.৩ আধুনিক বাংলা উপভাষা

২৭.৩.১ রাঢ়ি উপভাষা

২৭.৩.২ ঝাড়খণ্ডি উপভাষা

২৭.৩.৩ বরেন্দ্রী উপভাষা

২৭.৩.৪ বঙ্গালী উপভাষা

২৭.৩.৫ কামরূপী উপভাষা

২৭.৪ সারাংশ

২৭.৫ উত্তরমালা

২৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- সাধারণভাবে বাংলা উপভাষাগুলি সম্বন্ধে পরিচিত হবেন।
- প্রতিটি উপভাষার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আপনার ধারণা তৈরি হবে।

২৭.২ প্রস্তাবনা

বাংলা উপভাষাগুলির নাম, স্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার পর প্রত্যেকটি উপভাষার লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথোচিত বিস্তৃতিসহ আলোচনা করা হয়েছে।

২৭.৩ আধুনিক বাংলা উপভাষা

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ দু'য়ে মিলে যে বাংলাভাষী বঙ্গভূমি তার প্রধান উপভাষা মোট পাঁচটি। এই বিভাজন অঞ্চলভিত্তিক। এর মধ্যে মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ বীরভূমকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চলটি বিস্তৃত তার

উপভাষার নাম **রাঢ়ি**। এই বৃত্তের মধ্যে আছে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়, হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষার নাম **ঝাড়খণ্ডি**। এর মধ্যে রয়েছে মেদিনীপুর সীমান্ত, বর্তমান পুরুলিয়া, ধানবাদ এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চল। **বরেন্দ্রী** হ'ল উত্তরবঙ্গের উপভাষার নাম। মালদহ, দিনাজপুরের কিছুটা, রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়া এর অন্তর্গত। পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর থেকে বরিশাল পর্যন্ত অংশের উপভাষা হ'ল **বঙ্গালী**। পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়-ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম—কার্যত এই সমস্ত অংশটাই এর পরিসীমার মধ্যে চলে আসে। **'কামরূপী'** উপভাষার মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দার্জিলিং, দিনাজপুরের কিছুটা, কোচবিহার, রংপুর, ধুবড়ী এবং পশ্চিম গোয়ালপাড়ার অঞ্চলের বাংলাভাষী মানুষের ভাষা।

একথা বলতেই হয় যে একই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ অবিকল একই রকম কথা বলেন না। বর্ধমান, বীরভূ ম এবং নদীয়ার সকলেই রাঢ়ি ভাষাই বলেন, কিন্তু সেই ভাষার মধ্যে কমবেশি পার্থক্য আছে। ঢাকা জেলা বঙ্গালী ভাষা বলে আবার ফরিদপুর বরিশালও বলে। কিন্তু তা তো এক নয়। একইভাবে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম বা পুরুলিয়া জেলা একই উপভাষার অন্তর্গত হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। আসলে বাইরের সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐক্যের কল্পনা করা হয়েছে। ঐক্যটা মিথ্যে নয়। কেননা সূক্ষ্ম প্রভেদ সত্ত্বেও প্রত্যেকটি উপভাষা গোষ্ঠীর ভিতরকার মিলও যথেষ্ট।

২৭.৩.১ রাঢ়ি উপভাষা

(ক) রাঢ়ি উপভাষায় যে জিনিসটি প্রথমেই লক্ষ করবার তা হ'ল অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি-জনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন। দৃষ্টান্ত ঃ শুনিয়া—শোনে, রাখিয়া—রেখে। এই ধরনের পরিবর্তন এই ভাষার প্রধান বিশেষত্ব। যেমন ঃ দেশী—দিশি, বিলাতি—বিলিতি, মিছা—মিছে প্রভৃতি। উচ্চারণে 'অ'-কারের 'ও'-কার প্রবণতাও বিশেষ উল্লেখ্য। যদিও বানা অ-ই লেখা হয়। যেমন ঃ অতি—ওতি, অতুল—ওতুল, লক্ষ্য—লোক্‌খো, দৈবজ্ঞ—দৈবোগ্‌গোঁ।

(খ) চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ রাঢ়ি উপভাষায় খুব স্পষ্ট। এতটাই যে, অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্তি চন্দ্রবিন্দুও যুক্ত হয়েছে (স্বতোনাসিক্যীভবন)। যেমন ঃ হাঁসি, কাঁনা, ঘোঁড়া, বেঁজি প্রভৃতি। এই অতিরিক্ত চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ বেশি শুনতে পাওয়া যায় মানভূম-বাঁকুড়ার সীমান্ত অঞ্চলে, মুর্শির্দাবাদের গ্রামাঞ্চলে এবং বীরভূম-বর্ধমানের সীমানায়।

(গ) শব্দের প্রথম স্বরধ্বনিতে সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ায় অনেক সময় পদের শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা থাকে না। যেমন ঃ দুধ—দুদ্, মধু—মদু। কোনো কোনো সময় অবশ্য অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। ফলে 'কাক' হয়ে যায় 'কাগ', 'শাক'—'শাগ'।

(ঘ) বহুবচন বোঝাতে বেশিরভাগ সময়ই 'দের' ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাবুদের বাবুয়ানি, মেয়েদের রকম সকম প্রভৃতি। গৌণকর্ম সম্প্রদানে এবং অধিকরণ কারকে যথাক্রমে 'কে', 'তে', 'এ' ও 'য়' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন ঃ দেবাইকে বল কলেজে যেতে, চুবাই এ বাড়িতে নেই, চুমকি ছাদে দাঁড়িয়ে আছে ইত্যাদি।

(ঙ) অতীতকালের প্রথম পুরুষে অকর্মক এবং সকর্মক দুটি ক্রিয়াপদই 'ল' বা 'লে' যুক্ত হয়। যেমন ঃ সে টাকা দিল, সে ছেলেটাকে অনর্থক মারলে। সে পেট ভরে খিঁচুড়ি খেল বা খেলে।

(চ) লুম্, নু, লম্ যোগ করে উত্তম পুরুষের পদ গঠন। যেমন ঃ দেখলুম, দেখনু। লুম্, লাম-এর সবরকম প্রয়োগই এই উপভাষায় আছে।

(ছ) যৌগিক ক্রিয়াপদের সম্পন্ন কালের পদ গঠন করতে 'ইয়া' এবং অসম্পন্ন কালের পদ গঠন করতে 'ই' অন্ত অসমাপিকা ব্যবহার করে বোঝানো হয়। যেমন ঃ বলিয়াছে-বলেছে, বলিতেছিল-বলছিল, বলিয়াছিল-বলেছিল ইত্যাদি।

২৭.৩.২ ঝাড়খণ্ডি উপভাষা

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আনুনাসিকের প্রাচুর্য। যেমন—'মুশাই চাঁ মিলবেক', 'বাঁলতিটো রাখ'।

(খ) 'কে' বিভক্তি দিয়ে অনুসর্গহীন গৌণকর্ম বোঝানো। যেমন ঃ 'ঘাসকে গেল্ছে', 'দোকানকে চল', 'জলকে চল'।

(গ) নামধাতুর বিচিত্র প্রয়োগ। যেমন ঃ 'পুঁথুরের জলটা গাধাচ্ছে' ? 'দিনকে বড় দগ্ধাচ্ছে'।

(ঘ) পদের মধ্যেকার অল্পপ্রাণবর্ণের মহাপ্রাণতা প্রাপ্তি। যেমন ঃ 'পুকুর' হয়েছে 'পুথুর' 'দুপুর'—'দুফুর', 'বিকেল'—'বিখেল'।

(ঙ) যুক্ত ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর জায়গায় 'বট্' ধাতুর ব্যবহার। যেমন 'করিবটে' অর্থ হল—করছে।

(চ) 'ও'-কারের জায়গায় 'অ'-কার উচ্চারণের প্রবণতা। যেমন ঃ 'চোর'-এর উচ্চারণ 'চর', অথবা 'লোক'—'লক'।

(ছ) অপিনিহিতি অথবা বিপর্যাসের ফলে অপিনিহিত বা বিপর্যস্ত ধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ রাতি—'রাইত', সাঁঝি—'সাঁইঝ'।

(জ) 'লে' হল পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন। 'মায়ের লে মাউসীর দরদ' এখানে 'চেয়ে'র পরিবর্তন 'লে'-র ব্যবহার হয়েছে।

(ঝ) সম্বন্ধ পদ বিভক্তিহীনতা। যেমন—'ঘাটশিলা শাড়ি কুনি মনে নাই লাগে'। অর্থ হ'ল—'ঘাটশিলার শাড়ি কুনির পছন্দ হয়নি'। দেখবার যে 'নাই' এই নঞর্থক অব্যয়টি মূল ক্রিয়ার আগে বসেছে। এই প্রয়োগবিধি এ উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(ঞ) অধিকরণে 'কে' বিভক্তির ব্যবহার। যেমন ঃ 'রাইতকে' (রাতে)।

২৭.৩.৩ বরেন্দ্রী উপভাষা

(ক) রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী প্রথমে এই উপভাষা দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। পরে একদিকে বঙ্গালী,

অন্যদিকে বিহারীর প্রভাবে বরেন্দ্রী রাঢ়ির থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই কারণেই বরেন্দ্রী স্বরধ্বনির উচ্চারণে তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। সানুনাসিক ধ্বনির ব্যবহারও পর্যাপ্ত। পদের প্রথমেই কেবল ঘোষবৎ মহাপ্রাণধ্বনি বজায় আছে। শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

(খ) অনেক সময় 'জ' ধ্বনি ইংরেজি Z ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ কাজে কাজেই—'কাZে কাZে ই' ; 'হাজার'—'হাZার' প্রভৃতি।

(গ) শব্দের আগে 'র'-এর জায়গায় 'অ' এবং 'অ'-এর জায়গায় 'র'-এর আগম লক্ষ করার মতো। যেমন ঃ আমের রস—'রামের অস্', রামবাবুর আমবাগান—'আমবাবুর রামবাগান'।

(ঘ) শব্দ ও ধাতুরূপে বরেন্দ্রীর সঙ্গে রাঢ়ির কোনো ভিন্নতা নেই, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সপ্তমীতে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন চর্যাপদে 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী'। অতীতকালে উত্তর পুরুষে বরেন্দ্রীতে 'লাম্'-এর ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।

(ঙ) বহুবচনের বিভক্তি 'গুলি', 'গিলা' এবং তির্যক কারকে বহুবচনে বিভক্তি 'দের'। গৌণকর্মে 'কে' এবং 'ক' বিভক্তি, অধিকরণ কারকে 'ৎ' বিভক্তি। যেমন 'ঘরৎ যাও'।

২৭.৩.৪ বঙ্গালী উপভাষা

বঙ্গালী উপভাষা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রচলিত। বৈচিত্র্য এত বেশি যে এদের দুটো গুচ্ছে বিভক্ত করাই সঙ্গত। প্রথম গুচ্ছে পড়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, নদীয়ার অংশবিশেষ এবং পশ্চিম শ্রীহট্ট। অন্য গুচ্ছে রয়েছে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কাছাড় ও পূর্ব শ্রীহট্ট। কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ অবশ্য থেকেই যায়।

(ক) বঙ্গালীতে স্বরধ্বনির পুরোনো প্রকৃতি অনেকটাই রক্ষিত। 'অ'-কারের 'ও'-র উচ্চারণ প্রবণতা নেই। তবে ও-র জায়গায় 'উ' এবং 'এ'-র জায়গায় 'অ্যা' উচ্চারণের প্রতি ঝোঁক অবশ্যই লক্ষ করার মতো। যেমন ঃ দেশ—দ্যাশ, মেঘ—ম্যাঘ প্রভৃতি।

(খ) অপিনিহিতের বাহুল্য লক্ষণীয়। তা চলে আসছে মধ্য বাংলা থেকেই। যেমন ঃ আজি—আইজ, কালি—কাইল, হাটিয়া—হাইট্যা। যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে বিশেষ করে ক্ষ, হ্ম, য-ফলা ইত্যাদির আগে 'ই'-ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন ঃ রাক্ষস—'রাইক্ষস্', ব্রাহ্ম—ব্রাইহ্ম। বঙ্গালী উপভাষায় অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি নেই।

(গ) বঙ্গালীতে সানুনাসিক স্বরধ্বনির অস্থানে আগম তো নেইই, উপরন্তু স্বস্থানে অবস্থিত ঐ ধ্বনিও লুপ্ত। যেমন ঃ চন্দ্র বা চাঁদ—চাদ, কন্টক/কাঁটা—কাটা, পঞ্চ/পাঁচ—পাচ, হংস/হাঁস—হাস, বাঁশ—বাশ, বাঁধন—বাধন, দন্ত/দাঁত—দাত। শ্বাসাঘাতেরও কোনো নির্দিষ্ট স্থান বঙ্গালী উপভাষায় নেই।

(ঘ) ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণ ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ অল্পপ্রাণ গ, জ, ড, দ, ব ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'ভাত' হয়েছে 'বা'ত', 'ঘা'—'গা', 'ভয়'—'বয়', 'বিড়ি'—'বিরি'। 'হ'-কারেরও মহাপ্রাণতা নেই বা কণ্ঠনলীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'হাতি' হয়েছে 'আত্তি', 'হাটু' হয়েছে 'আঠু', 'ফলাহার'—'ফলার', 'পুরোহিত'—'পুরুত'।

(ঙ) শব্দরূপে লক্ষণীয় হ'ল কর্তায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'এ' বিভক্তির যোগ। যেমন ঃ 'মারে কইছে', 'বাবায় আইছে', 'দাদায় কইলো' ; গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি—'দেবাইরে দাও' ; করণ কারকে 'এ' বিভক্তি ছাড়াও 'দিয়া, সাথে, লগে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার। অপাদানে 'থে', 'থিকা' প্রভৃতি। অধিকরণে ব্যবহৃত বিভক্তি হ'ল 'এ', 'ৎ'। সাধারণভাবে সপ্তমীতে 'তে' বিভক্তির ব্যাপক ব্যবহার। যেমন ঃ বাড়িতে, হাতেতে, জলেতে ইত্যাদি।

(চ) লুম্, লম্, বা নু-র মতো উত্তম পুরুষে অতীতকালে ব্যবহৃত ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ বঙ্গালীতে নেই। সেখানে কেবল 'লাম্'-এর ব্যবহার। যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার কিছুটা রাঢ়ির উল্টো। যেমন ঃ 'ই' এই অসমাপিকা দিয়ে সম্পন্ন কালের এবং সাধুভাষার মতো 'ইতে' শেষে আছে এমন অসমাপিকা দিয়ে অসম্পন্ন কালের পদ হয়। যেমন ঃ 'বলিয়াছি', রাঢ়িতে হয় 'বলেছি'—বঙ্গালীতে 'বলছি (স)' (Bolsi) আমি করেছি—কইর্ত্যাছি' (Koirtasi)। আমি করিতেছি। সামান্য বর্তমান ঘটমানের (Present Continuous) অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ঃ 'ছেলে ডাকে', অর্থ—'ছেলে ডাকছে'।

(ছ) একমাত্র কর্তৃকারক ছাড়া অন্যান্য কারকের বহুবচনে 'গো' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন ঃ 'আমাগো করতে দিবা না ?' (আমাদের করতে দেবে না ?)

(জ) উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি 'উম্' এবং 'মু'। যেমন ঃ 'আমি খেবল' অর্থে 'আমি খেলুম্'। 'আমি যামু' অর্থাৎ 'আমি যাব'।

(ঝ) বঙ্গালী উপভাষা মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি হ'ল 'বা'। যেমন ঃ 'তুমি খাবা না' ?

(ঞ) রাঢ়িতে অতীতকালে ব্যবহৃত হয় নঞর্থক প্রত্যয় 'নি', যেমন ঃ 'তুমি যাও নি' ? এখানে তার বদলে 'নাই'—যেমন ঃ 'তুমি যাও নাই' ?

বঙ্গালীর প্রধান বিভাষা চট্টগ্রামী। এতে উচ্চারণে, পদ প্রয়োগে, শব্দ ও ধাতুরূপে বঙ্গালীর সঙ্গেও অনেক পার্থক্য। অনুনাসিক বর্ণের ব্যবহার, ক বা প ইত্যাদির খ, ফ-তে পরিণত হওয়া চট্টগ্রামী ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ কালীপূজা—'খালি ফুজা'। **'চাক্‌মা'** ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামী সম্পর্ক আছে।

২৭.৩.৫ কামরূপী উপভাষা

(ক) কামরূপী বরেন্দ্রী এবং বঙ্গালীর মাঝামাঝি। প্রথমটির মতো পদের প্রথমেই কেবল ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ রয়েছে। শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। আবার বঙ্গালীর মতো রয়েছে অনুনাসিক বর্ণের লোপ প্রাণতা। অপিনিহিতির স্থিতি। অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতির অনুপস্থিতি। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে বরেন্দ্রীর সঙ্গেই কামরূপী-র সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত কাছের।

(খ) কামরূপী-তে চতুর্থ বর্ণ পদের প্রথমে বজায় থাকে। অন্য ক্ষেত্রে তৃতীয় বর্ণ হয়ে যায়। যেমন—ড়-র, ঢ-র্হ। এর ব্যতিক্রমও আছে। 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থে ড. নির্মল দাশ দেখিয়েছেন কোচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' বদলে যায়নি। যেমন—'বাড়ির'।

(গ) চ, জ, স বা শ যথাক্রমে ৎম (ৎসামড়া), জ (x) হ।

(ঘ) শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

(ঙ) গৌণকর্ম সম্প্রদানে 'কে' এবং অধিকরণে 'ত' বিভক্তি। যেমন—'ঘরকে গেলাম', 'বড়িত্ যাব' (বাড়িতে যাব)।

(চ) বহুবচন বিভক্তি 'বা' শেষে আছে এমন পদটি শব্দরূপে তির্যক কারক হয়ে সম্বন্ধ বিভক্তি গ্রহণ করে, যেমন ঃ 'আমররার', 'তোম্রার' প্রভৃতি।

(ছ) নিত্যবৃত্ত অতীতের ভবিষ্যৎ অর্থে প্রয়োগ কামরূপীয় লক্ষণ। যেমন ঃ 'খাইতাম না'—খাব না, 'যাইতাম না'—যাব না। এছাড়াও আছে যাইবাম, করবাম প্রভৃতি।

(জ) 'ও'-কে 'উ'-র মতো উচ্চারিত হতে দেখা যায়। তবে সবক্ষেত্রে নয়। যেমন ঃ তোমার > তুমারর্, কোন > কুন্। গোয়ালপাড়ায় 'কোন' উচ্চারণই—চলিত আছে।

(ঝ) সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের বিভক্তি হ'ল 'নু'। যেমন 'কন্নু'—অর্থাৎ 'করলাম'।

(ঞ) 'ইল' সদ্য অতীতে প্রথম পুরুষের বিভক্তি, যেমন—ধরিল (ধরল)।

(ট) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি 'ক', যেমন 'বাপের'—এই বোঝাতে **'বাপো'**র।

(ঠ) উত্তম পুরুষের একবচনে 'মুই' 'হাম' প্রভৃতি সর্বনামের প্রয়োগ দেখা যায়।

আরও কিছু বিশিষ্টতা। যেমন 'ছেলে' অর্থে 'পুত', 'পুতাইন' ছাড়াও আরবি শব্দ 'আবু'-র প্রয়োগ আছে। হাতে পাওয়া অর্থে 'লগেইল পাওয়া'। চুপ করে থাকা অর্থে 'টিপ্'—'টিপ্ মাইরা **বইসা** থাক'। স্পন্দন নেই বোঝাতে 'ঝিম্', লাগি অর্থে 'উষ্ট', 'ঝাঁটা' বোঝাতে 'হাচুন' প্রভৃতি।

২৭.৪ সারাংশ

বাংলায় উপভাষার সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ। পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশ এই দুই মিলেই তার পরিধি। রাঢ়ি, ঝাড়খণ্ডি, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী এবং কামরূপী উপভাষার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ এই আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে। অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলা উপভাষা সম্পর্কে একটি সার্বিক পরিচয় লাভ করবেন।

২৭.৫ অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) কয়েকটি বাংলা উপভাষার নাম করুন।

(খ) রাঢ়ি উপভাষার অভিশ্রুতির কয়েকটি উদাহরণ দিন।

(গ) ঝাড়খণ্ডি উপভাষায় নামধাতু প্রয়োগের উদাহরণ দিন।

(ঘ) বঙ্গালী উপভাষায় ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণের অল্পপ্রাণধ্বনিতে পরিণত হওয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখান।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) রাঢ়ি উপভাষার প্রধান লক্ষণগুলির উল্লেখ করুন।

(খ) দৃষ্টান্তসহ বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(গ) কামরূপী উপভাষার প্রধান লক্ষণ কী কী ?

২৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ODBI (অংশবিশেষ)।

২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

৩. পার্বতী ভট্টাচার্য—বাংলা ভাষা।

৪. অতীন্দ্র মজুমদার—ভাষাতত্ত্ব।

৫. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য়)।

৬. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

একক ২৮ ❐ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

গঠন

২৮.১ উদ্দেশ্য

২৮.২ প্রস্তাবনা

২৮.৩ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

২৮.৪ সারাংশ

২৮.৫ উত্তরমালা

২৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৮.১ উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে আপনি—

- বাংলায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার উদ্ভব ও প্রয়োগবিধির সাধারণ সূত্রগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

২৮.২ প্রস্তাবনা

বাংলায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার কীভাবে সৃষ্টি হ'ল, তার সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বাংলা গদ্যে, বিশেষ করে দুটি ধারা কীভাবে কেন তৈরি হয়েছে এবং বর্তমানে কোন ধারাটির অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়েছে সে ইঙ্গিতও এখানে রয়েছে।

২৮.৩ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষার পার্থক্য নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। এর কারণ হ'ল লিখবার ভাষা উপস্থিত, নিকট দূর প্রত্যেকের জন্য। মুখের ভাষা কেবল উপস্থিত জনের জন্যই ব্যবহৃত। পরিসর বড় বলে লেখার ভাষার শব্দভাণ্ডার সুবৃহৎ। তাছাড়া লিখবার ভাষায় ওতপ্রোত মিশ্রিত জড়িত থাকে বহুকাল ধরে চলা ঐতিহ্যর ব্যাপারটি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা ভাষায় দু'টি আদর্শই বিদ্যমান। একটি হ'ল সাধুভাষা, অন্যটি চলিতভাষা। মুখের ভাষার সঙ্গে লিখবার ভাষায় দূরত্ব আছে। তবে দূরত্বের হেরফের আছে। সাধু-তে বেশি, চলিত-এ কম।

সাধারণভাবে আমরা তিন ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করে থাকি। একটি লিখবার, একটি শিষ্ট কথ্যভাষার, অন্যটি উপভাষার। বাংলার মতো ভাষা, যেখানে কমবেশি পাঁচটি উপভাষা আছে, সেখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লেখাপড়ায় ব্যবহারের যে ভাষা তার মূলে থাকে বিশেষ একটি উপভাষা। অন্য উপভাষার শব্দ বা বাকবিধিতে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দিতে অসুবিধে নেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি উপভাষারই প্রাধান্য ঘটে। সে ভাষা যদি রাজধানীর ভাষা হয়, লেখক-সাহিত্যিক যদি সেই ভাষাতেই লেখেন তাহলে এমনটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে

থাকে। কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের ভাষার যে সর্ববাদি সম্মত প্রতিষ্ঠা ঘটল তা এই কারণেই। তবে অন্য উপভাষার ছাপ যে ভাষায় কিছুমাত্র পড়েনি সে কথাও অসঙ্গত। ড. সুকুমার সেন-এর মতো ভাষাবিদের বক্তব্য হল যে ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট কবি শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁদের লেখায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপভাষার ছাপ পড়েছে। আমাদের ধারণা, মুখে ব্যবহৃত 'করছি' পদের সাধুরূপ হল 'করিতেছি'। এটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের উপভাষার পদ।

বাংলা ভাষার একেবারে প্রথম পর্বে লেখার ও মুখের ভাষার তেমন কোনো পার্থক্য কিছু ছিল না। সামান্য যা কিছু তা তৎসম শব্দাশ্রয়ী, প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ পদ ও বাগ্‌ধারার সীমিত প্রয়োগ নির্ভর। তখন অপভ্রষ্ট-এর সঙ্গেই বাংলার সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়। চর্যার কোনো কোনো পদকার এ ভাষায় পদও রচনা করেছিলেন। সরহ এ রকম একজন পদকার।

মধ্য বাংলায় কথ্যভাষা সাহিত্যসৃষ্টি থেকে অবশ্যই পার্থক্য বজায় রাখছিল। সে সাহিত্য ছন্দোবদ্ধ রচনা, সাধারণ মানুষ এর লক্ষ্য এবং উপভোক্তা। মুখের ভাষাও সেখানে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। ছন্দের স্বার্থেই সাহিত্যের ভাষায় পুরানো নতুন শব্দ পদ বা বাগ্‌ধারায় পর্যাপ্ত ব্যবহার হ'ত। সাধুভাষা আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে সূচনা পর্যন্ত। মুখের ভাষা এবং সাধুভাষায় বিরাট কোনো ভিন্নতা কিছু ছিল না। মুখের ভাষায় স্বরধ্বনিতে বিশেষ করে বড় রকমের পরিবর্তন এসেছিল। এর ফলে কথ্য এবং লেখ্য ভাষার ভিন্নতা। ভিন্নতার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা শক্ত। ছন্দের দরকারেও মুখের ভাষার প্রবেশ ছিল নির্বাধ। সবচেয়ে বড় কথা মুখের ভাষা কেমন ছিল তারও কোনো নিদর্শন কিছু রক্ষিত নেই। দলিল-দস্তাবেজে সংস্কৃত এবং ফারসিরই অবারিত বিকার।

সাহিত্যে ব্যবহৃত মধ্য বাংলা এবং বর্তমান সাধুভাষার সম্পর্ক যে কত নিবিড় ভাষাবিদেরা তা দেখিয়েছেন। যেমন ঃ

'এ সব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে।।'

বা,

'দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে।।'

এইরকম উদাহরণ অজস্র।

সাধুভাষার প্রকৃত সৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। পণ্ডিত এবং ফারসি জানা মুন্‌শিদের হাতে। তাঁরা সকলের কাছেই বোধ্য একটি সাধারণ লিখবার ভাষা তৈরি করতে য- নিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষার উপরেই এঁরা নির্ভর করেছিলেন সবচেয়ে বেশি।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 'বেদান্তগ্রন্থ'-এ রামমোহন 'সাধুভাষা' শব্দটির সম্ভবত সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ মানুষদের ব্যবহৃত ভাষাকেই তিনি **সাধুভাষা** বলে বিশেষিত করেছিলেন। এর পাশে মুখের ভাষার নাম ছিল **'অপরভাষা'**। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাংলায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা অপরটির নাম 'অপর ভাষা একটি লিখিবার ভাষা দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম

ভাষাটি ভিন্ন দ্বিতীয়টির কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাংলা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সহিত যুক্ত হইত।...অপর ভাষা সেদিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য তাহাই ব্যবহার করে।" বঙ্কিম পরিষ্কারভাবেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, সংস্কৃতাশ্রয়ী সাধুভাষার অবিরাম লেখন ও অনুশীলনের ফলে বাংলা গদ্য যে ব্যাকরণ ও অভিধাননির্ভর হয়ে কিছুটা জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছিল, এ কথা ঠিক। মুখের ভাষাকে লেখার মধ্যে আনবার চেষ্টা এরই প্রতিবিধানকল্পে। প্যারীচাঁদ বা কালীপ্রসন্ন সিংহরা এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরে স্বয়ং বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতো যুগন্ধর পুরুষেরা এগিয়ে আসেন। উপভাষার গণ্ডী পার হয়ে কলকাতার ভাষাই অতঃপর হয়ে উঠল সর্বজনসম্মত শিষ্ট চলিত ভাষা (Standard Coloquial)। একটি বিশেষ অঞ্চলে চলিত কথা বলবার ভাষা অবলম্বনে এর সৃষ্টি বলে এর নাম 'চলিত ভাষা'। সাধুভাষার সঙ্গে এর সবচেয়ে বড় ভিন্নতা সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপে। বাংলা চলিত গদ্যে অপিনিহিতি-এর ব্যবহার নেই। পরিবর্তে অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতিরই ব্যবহার। এও লক্ষণীয় যে সাধুভাষায় অপিনিহিতি-র আগের যুগের ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিছু উদাহরণ ঃ (ক্রিয়াপদের)

বলিতেছি—বলছি

বলিতেছিলাম—বলছিলাম

বলিয়াছি—বলেছি

বলিয়াছিলাম—বলেছিলাম

বলিতে—বলতে

বলিয়া—বলে

বলিলে—বললে

সর্বনাম পদের উদাহরণ ঃ

যাহার—যার

যাহাদিগের—যাদের

ইহা—এ/এটি

এইরকম, সাধু ভাষার রূপ যেখানে 'বলিয়া', পূর্ব বাংলায় অপিনিহিতি-তে যেটি হয়েছে 'বইল্যা', চলিত ভাষার অভিশ্রুতির পর রূপান্তরিত প্রয়োগ—'বলে'। স্বরসঙ্গতি-র আশ্রয়ে 'দেশী' হয়েছে 'দিশি', 'বিলাতি'—'বিলিতি'।

আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ

১. চলিত ভাষায় দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা। যেমন ঃ কর্‌ব, করিতেছি—করছি।

২. হ-স্বরের লোপপ্রবণতা। যেমন ঃ মিত্রমহাশয়—মিত্তির মশাই।

৩. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহার। যেমন ঃ মিত্রমহাশয়—মিত্তির মশাই।

৪. সমীভবন প্রবণতা। যেমন ঃ যতদিন—যদ্দিন, গল্প—গপ্পো।

৫. স্বরাগম। স্কুল—ইস্কুল, স্পর্ধা—আস্পর্ধা।

৬. অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব শব্দের বিপুল ব্যবহার।

৭. অন্ত্য ও মধ্য স্বরের লোপ প্রবণতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রাণী—একটাকে আদর করে না দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা আর একটাকে কথ্যভাষা ; কেউ বলে চল্‌তি ভাষা ; আমার কোনো কোনো লেখায় বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চল্‌তি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।

তবে এই আটপৌরে সাজাকেও একটু গুছিয়ে তুলতে হয়। কেননা অবিকল মুখের ভাষায় সাহিত্য হয় না।'

২৮.৪ সারাংশ

সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা বাংলা গদ্যে বিশেষ করে দীর্ঘকালের এক বাস্তব সত্য। বর্তমান এককে ইতিহাসের পরম্পরাতেই তার উদ্ভব ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সাধু ও চলিত ভাষার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণও।

২৮.৫ অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) আমরা ক'ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করে থাকি ?

(খ) 'চর্যাপদ'-এ কি লিখবার ভাষা ও মুখের ভাষায় কোনো পার্থক্য ছিল ?

(গ) সাধুভাষার প্রকৃত সৃষ্টি কোন্ সময়ে ?

(ঘ) কোথায় 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ?

(ঙ) মুখের ভাষার কী নাম ছিল ?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় সাধু ও চলিত ভাষার অস্তিত্ব কীভাবে ছিল আলোচনা করুন।

(খ) সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহারের কয়েকটি দিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করুন।

২৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।

২. পার্বতী ভট্টাচার্য—বাংলা ভাষা।

৩. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম)।

৪. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

একক ২৯ ❐ বাংলা ধ্বনির পরিচয়

গঠন

২৯.১ উদ্দেশ্য

২৯.২ প্রস্তাবনা

২৯.৩ বাংলা স্বরধ্বনি

২৯.৩.১ বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য এবং তজ্জনিত শ্রেণিভেদ

২৯.৪ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

২৯.৪.১ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য এবং তজ্জনিত শ্রেণিভেদ

২৯.৫ স্বনিম এবং পূরকধ্বনি/ উপধ্বনি

২৯.৬ সারাংশ

২৯.৭ উত্তরমালা

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ভাষার ন্যূনতম একক হিসাবে ধ্বনির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণের প্রকারভেদ ধ্বনির নানা বৈচিত্র্য কীভাবে সৃষ্টি হয় তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- বাংলা ধ্বনিগুলিকে তাদের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে সজ্জিত করতে পারবেন।

২৯.২ প্রস্তাবনা

ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ধ্বনি বলতে মুখনিঃসৃত বা উচ্চারিত ধ্বনিকেই বোঝানো হয়। প্রতিনিয়িত বাতাস মানুষের নাক ও মুখ দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং একইপথে আবার নির্গতও হয়ে আসে। এই নির্গমনের সময় বাতাস ফুসফুস থেকে শ্বাসনালীপথে আমাদের স্বরযন্ত্রের মধ্যে যদি প্রবাহিত হয় এবং তারপর স্বরযন্ত্র থেকে মুখগহ্বরে এসে, বিভিন্ন বাক্‌প্রত্যঙ্গ যেমন আলজিহ্বা, জিহ্বা, তালু ও মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠাধার ইত্যাদিতে আঘাত করে বা এইগুলির দ্বারা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ প্রতিহত হয়, তবে ভাষার ধ্বনি সৃষ্টি হয়।

মনে রাখবেন, যে কোনো ভাষারই ক্ষুদ্রতম গঠনগত একক হল ধ্বনি (sound)। বিভিন্ন ধ্বনির গুচ্ছবদ্ধতা, যা সুনির্দিষ্ট অর্থবহনকারী তাকে আমরা বলি শব্দ (word)। আর এই শব্দের ন্যূনতম যতটুকু অংশ আমরা

উচ্চারণের স্বল্পতম প্রয়াসে বা একেবারে উচ্চারণ করতে পারি, তাকে বলে অক্ষর (Syllabe)। যেমন ধরুন 'কলম' শব্দে 'ক', 'ল', 'ম' ধ্বনি এবং 'ক' ও 'লম্' দুটি অক্ষর। সাধারণভাবে ধ্বনি বা অক্ষরের নিজস্ব কোনো অর্থবহনক্ষমতা থাকে না। নানা ধ্বনির বিচিত্র বিন্যাসেই শব্দ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়।

ভাষায় ধ্বনিগত যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার প্রধান কারণ-ফুসফুস থেকে বহির্গামী বাতাসকে আমরা কোন্ প্রক্রিয়ায় মুখবিবরপথে নির্গত করছি তার উপর। সব ভাষাতেই এই কারণে দুটি প্রধান ধ্বনিশ্রেণি উদ্ভূত হয়। এদের একটিকে বলা হয় **স্বরধ্বনি** (Vowel)। এবং অপরটিকে ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant)। বাতাস স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করার পর যদি মুখবিবরের মুক্ত পথে বার হয়ে আসে তবে স্বরধ্বনি সৃষ্ট হয়। আর স্বরযন্ত্র থেকে বেরিয়ে বাতাস যদি সঙ্কুচিত বা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ পথে চালিত হয়, তবে যে ধ্বনিগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। আসুন, বাংলাভাষার স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে আমরা এবার জানতে চেষ্টা করি।

২৯.৩ বাংলা স্বরধ্বনি

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়গুলি মনে রাখবেন সেগুলি সূত্রাকারে নিম্নরূপ ঃ

(ক) স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের স্বরযন্ত্রস্থিত দুটি তন্ত্রী নিকটবর্তী অবস্থায় থাকে এবং নিঃশ্বাসবায়ু এদুটিকে ঠেলে, বাধা অপসারণ করে নির্গত হয়। এর ফলে এই তন্ত্রীদুটিতে কম্পন বা অনুরণনের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই স্বরধ্বনিগুলি ঘোষধ্বনি (voiced)।

(খ) মুখবিবরের ভেতর দিয়ে বাতাস বেরোবার সময় তার প্রবাহ থাকে সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থাৎ বাতাস কোথাও অবরুদ্ধ হয় না।

(গ) বাতাস নির্গমনের সময় কোনো বাক্প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সংস্পর্শে সঙ্কীর্ণ পথের কারণে ঘষা খায় না।

(ঘ) বাংলাভাষার স্বরধ্বনিগুলি সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের বিবর্তনপথ ধরে আগত। কিন্তু বাংলা বর্ণমালা আমরা নিয়েছি সরাসরি সংস্কৃত থেকে। তাই কথ্য বাংলায় বর্তমানে অপ্রচলিত বহু ধ্বনির লেখ্যরূপ আমাদের বর্ণমালায় এখনও প্রচলিত। যেমন—ঋ, ঌ

বাংলায় প্রচলিত স্বরধ্বনিগুলিকে যদি একটু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, তবে স্পষ্টতই তাদের মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করতে পারবেন, ই-ঈ, উ-ঊ এই রকম ধ্বনিযুগ্মগুলিতে দেখুন—প্রথমটি হ্রস্ব এবং দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। অর্থাৎ প্রথণটিতে (ই বা উ) হ্রস্ব উচ্চারণ ও দ্বিতীয়টিতে (ঈ বা ঊ) দীর্ঘ উচ্চারণ বিহিত। কিন্তু উচ্চারণের এই বিধি বানানের চেহারায় ধরা পড়লেও আমাদের দৈনন্দিন কথ্যবাংলায় তার কোনো প্রয়োগ বৈষম্য নেই।

আবার আরও একটি বিষয় দেখুন—'ঐ' ও 'ঔ' ধ্বনিদুটি আসলে দুটি অন্যধ্বনির যৌগিক রূপ, যেমন—ঐ = ও + ই এবং ঔ = ও + উ। ঔ লেখার সময় না হলেও 'ঐ' লেখার সময় তাই দুরকম প্রবণতাই আমাদের চোখে পড়ে 'ঐ' ও 'ওই'।

এই অবস্থায় বাংলা স্বরধ্বনি নিরূপণে বা মৌলিক দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—

(১) যে ধ্বনিগুলি একটিমাত্র নির্দিষ্টধ্বনি বা মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal vowel)।

(২) যে ধ্বনিগুলি একাধিক মৌলিক স্বরধ্বনি দ্বারা গঠিত বা যৌগিক স্বরধ্বনির (Diphthong)। এগুলিকে সন্ধিস্বর নামেও অভিহিত করা হয়।

মৌলিক স্বরধ্বনি ঃ

বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি মোট সাতটি—অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। এই শেষোক্ত স্বরধ্বনিটিকে এবার লক্ষ্য করুন। এটি সংস্কৃতে ছিল না, এটি বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ প্রবণতাজাত স্বরধনি। কিন্তু যেহেতু সংস্কৃত বর্ণমালায় এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বর্ণচিহ্ন ছিল না তাই এখনও এটিকে লিখিত চেহারায় প্রকাশ করতে কখনও এ (এখন), কখনও অ্যা (অ্যাঙ্গোলা), কখনও বা 'অ' বা 'আ' (অকাদেমী/আকদেমী) ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হই।

যৌগিক স্বরধ্বনি / সন্ধিস্বর ঃ

একাধিক মৌলিক স্বরধ্বনির সমবায়ের ফলে সৃষ্ট এই জাতীয়ধ্বনির লিখিত বর্ণচিহ্ন হিসাবে আমরা পাই মাত্র দুটিকে—'ঐ', 'ঔ'। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বাংলায় পঁয়ত্রিশটিরও বেশি যৌগিক স্বরধ্বনি প্রচলিত। এগুলি সবসময়ই যে দুটি স্বরধ্বনি দ্বারা গঠিত, তা নয়, তিনটি, চারটি বা পাঁচটি স্বরধ্বনি দ্বারাও যৌগিকস্বর গঠিত হতে পারে। তবে দ্বিস্বরবিশিষ্ট যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যাই বেশি ?

দ্বিস্বরধ্বনি—অএ (নয়), অও (চওড়া), আই (বাইরে), আএ (খায়), আও (নাও), আউ (লাউ), ইই (নিই), ইএ (বিয়ে), ইআ (দিয়া), ইও (নিও), ইউ (শিউলি), এ্যায় (ব্যয়) ইত্যাদি।

ত্রিস্বরধ্বনি—আইও (যাইও), ইএই (নিয়েই), উআও (শুনাও) ইত্যাদি।

চতুস্বরধ্বনি—আওআএ (খাওয়ায়), এওআই (দেওয়াই) ইত্যাদি।

পঞ্চস্বরধ্বনি—আওআইও (খাওয়াইও)।

এই যে সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনির অস্তিত্ব আমরা পেলাম, এই সাতটি কিন্ত পরস্পরের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, যে কারণে তাদের উচ্চারিতরূপ ও প্রকাশ বর্ণচিহ্ন ভিন্ন। এইবারে আসুন, আমরা সেই বৈশিষ্ট্য নিরূপণের কারণ অনুসন্ধান করি।

২৯.৩.১ বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য ও তজ্জনিত শ্রেণিভেদ

স্বরধ্বনিগুলি শ্রুতিগোচর যে ভিন্নতা তারজন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী বাক্‌প্রত্যঙ্গের নানা অবস্থান। জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয়ের আকৃতি এবং অবস্থানই স্বরধ্বনিগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিরূপ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এইবার দেখুন, কীভাবে জিহ্বার বিভিন্ন অবস্থান, ওষ্ঠাধরের আকৃতি এবং এর ফলে মুখবিবরের আয়তনগত ভিন্নতা স্বরধ্বনির

স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে চলে। বিষয়টিকে আমরা কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করে এইভাবে সাজাতে পারি—

(ক) জিহ্বার মুখবিবরের সম্মুখ কিংবা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান।

(খ) জিহ্বার মুখবিবরের ঊর্ধ্ব, মধ্য বা নিম্নভাগে অবস্থান।

(গ) ওষ্ঠাধরের কুঞ্চিত বা প্রসারিত অবস্থা।

(ঘ) মুখবিবরের সংবৃত বা বিবৃত আয়তন।

জিহ্বার সম্মুখ বা পশ্চাদভাগে অবস্থান ঃ

'ই', 'এ', 'অ্যা'—এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখবিবরের সম্মুখভাবে অবস্থান করে। এই কারণে এই স্বরধ্বনিগুলি সম্মুখ স্বরধ্বনি নামেও (Front vowel) পরিচিত।

আবার 'উ', 'ও', 'অ' এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখবিবরের পশ্চাদভাগে আকর্ষিত অবস্থায় থাকে। তাই এগুলি পশ্চাদবস্থিত স্বরধ্বনি (Back vowel) নামেও পরিচিত।

'আ' ধ্বনি উচ্চারণপর্বে জিহ্বার অবস্থান পুরোপুরি সম্মুখভাগে নয়, আবার পশ্চাতেও আকর্ষিত নয়, এমন মধ্যপর্বে থাকে। তাই এটিকে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি (Central vowel) বলা হয়।

জিহ্বার ঊর্ধ্ব, মধ্য বা নিম্নভাগে অবস্থান ঃ

'ই', 'উ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখবিবরের সর্বাপেক্ষা উচ্চে অবস্থান করে। এই কারণে এই দুটিকে ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি (High vowel) বলা হয়। 'এ', 'ও' উচ্চারণের সময় জিহ্বা আর একটু নীচে নেমে আসে বলে এদুটিকে বলা হয় উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি (High-mid vowel)। 'অ্যা', 'অ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা অনেকখানি নীচে নেমে আসে এবং সে কারণে এই দুই ধ্বনি নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি (Low-mid vowel) হিসাবে পরিচিত। 'আ' ধ্বনি উচ্চারিত হয় জিহ্বার সর্বাধিক নিম্ন অবস্থানে। তাই এটি নিম্ন স্বরধ্বনি (Low vowel)।

ওষ্ঠাধরের কুঞ্চিত বা প্রসারিত অবস্থা ঃ

সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলি অর্থাৎ 'ই', 'এ' 'অ্যা' উচ্চারণের সময় ওষ্ঠাধারের আকৃতি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। তাই এগুলিকে প্রসৃত স্বরধ্বনি (Spread vowel) বলে। আবার 'উ', 'ও', 'অ'—এই পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠাধার সংকুচিত হয়ে বর্তুল বা গোলাকার প্রাপ্ত হয়। এই গোলাকৃতির ওষ্ঠাধারের কারণে এই স্বরধ্বনিগুলিকে বলা হয় বর্তুল বা কুঞ্চিত স্বরধ্বনি (Rounded vowel)।

মুখবিবরের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

এইক্ষেত্রে 'ই', 'উ' উচ্চারণকালে মুখবিবর পুরোপুরি সংবৃত, 'এ', 'ও' উচ্চারণের সময় খানিকটা সংবৃত, 'এ্যা' 'অ' উচ্চারণে প্রায় বিবৃত এবং 'আ' ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিবৃত বা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। মুখবিবরের এই খোলা থাকার আয়তনের উপর নির্ভর করেই এই চারটি ক্ষেত্রে উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে—সংবৃত স্বর (Closed vowel), অর্ধ-সংবৃত স্বর (Half-closed vowel), অর্ধ বিবৃত স্বর (Half-open vowel) এবং বিবৃত স্বর (Open vowel)।

যে চারটি পর্বের কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সেই পর্ব অনুযায়ী বাংলার সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে বর্গীকরণ করতে পারি—

	সম্মুখবস্থিত (Front)	কেন্দ্রীয় (Central)	পশ্চাদবস্থিত (Back)
	প্রসৃত (Spread)	বিবৃত (Open)	বর্তুল (Round)
উচ্চ (High) ..... সংবৃত (Closed)	ই		উ
উচ্চ-মধ্য (High-mid) ..... অর্ধ-সংবৃত (Half-closed)	এ		ও
নিম্ন-মধ্য (Low-mid) ..... অর্ধ-বিবৃত (Half-open)	অ্যা		অ
নিম্ন (Low) ..... বিবৃত (Open)		আ	

২৯.৪ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

মুখবিবরের যে কোনো জায়গায় যদি বাক্‌প্রত্যঙ্গাগুলির কোনো কোনোটির পরস্পর স্পর্শ বা সংলগ্নতার কারণে, শ্বাসবায়ু নির্গত হবার পথে কোনো বাধা পায়, তবে যে ধ্বনিগুলির উদ্ভব হয়, সেগুলিকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। এই ধ্বনিগুলির ক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয় মনে রাখবেন—

(ক) ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর নির্গমপথ আংশিক বা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে।

(খ) নির্গম পথের বাধা অপসারণ করতে শ্বাসবায়ুকে আঘাত বা ঘর্ষণ করতে হয়।

(গ) বিভিন্ন বাক্‌প্রত্যঙ্গ ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় হয় পরস্পর সংলগ্ন হয়ে থাকে, নয়তো এতটাই কাছাকাছি থাকে, যাতে শ্বাসবায়ুর সচ্ছন্দ নির্গমনে বাধা সৃষ্টি হয়।

(ঘ) স্বরধ্বনির মতোই ব্যঞ্জনধ্বনিতেও বর্ণমালা সরাসরি সংস্কৃত থেকে গৃহীত। তাই এখানেও অনেক ধ্বনিরই অস্তিত্ব আমাদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে না থাকলেও লিখিত বর্ণচিহ্নে বর্তমান। যেমন—'জ' 'য' আমাদের কাছে অভিন্ন, 'ঙ' 'ং' ও একইভাবে আমরা উচ্চারণ করি।

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির স্বরধ্বনির মতোই নানা শ্রেণিতে বিন্যস্ত হতে পারে। এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি মানদণ্ড প্রাথমিকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে—

(১) ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সক্রিয় বাক্‌প্রত্যঙ্গের ভিন্নতা।

(২) ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর নির্গমনের প্রকৃতি।

(৩) ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর নির্গমপথ।

আসুন, এবার আমরা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে এই তিনটি মাত্রা প্রয়োগে বিভিন্ন শ্রেণিতে সাজিয়ে চিনে নেবার চেষ্টা করি।

২৯.৪.১ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণবৈচিত্র্য ও তজ্জনিত শ্রেণিভেদ

বাংলা বর্ণমালার প্রথম পঁচিশটি বর্ণের উচ্চারিত ধ্বনিরূপকে স্পর্শধ্বনি বলা হয়। কারণ এগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বার কোনো না, কোনো অংশ কণ্ঠ, তালু বা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে। এগুলিকেও আবার উচ্চারণস্থানের এই ভিন্নতা অনুযায়ী পাঁচটি বর্গে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এবার লক্ষ্য করুন কীভাবে এই বিন্যাসের প্রক্রিয়াটি কার্যকর হয়েছে—

(১) **ক-বর্গ বা কণ্ঠ্যধ্বনি**—জিহ্বার মূল বা পশ্চাদভাগ দ্বারা গলার কাছাকাছি নরম তালু স্পর্শ করে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। ক, খ, গ, ঘ, ঙ-এই পাঁচটি ধ্বনি বর্গভুক্ত।

(২) **চ-বর্গ বা তালব্য ধ্বনি**—জিহ্বার মধ্যভাগ দিয়ে তালুর সামনের কঠিন অংশ স্পর্শ করে এই বর্গের চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়।

(৩) **ট-বর্গ বা মূর্ধন্যধ্বনি**—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ-এই পাঁচটি ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে উলটিয়ে তালুর কঠিন অংশ যাকে মূর্ধা বলা হয়, সেই অংশ স্পর্শ করা হয়। তাই এগুলির নাম মূর্ধন্যধ্বনি।

(৪) **ত-বর্গ বা দন্ত্যধ্বনি**—জিহ্বার অগ্রভাগকে সামনে প্রসারিত করে দাঁতের পিছনের অংশে স্পর্শ করিয়ে এই বর্গে পাঁচটি ধ্বনিকে উচ্চারণ করা হয়। যেমন—ত, থ, দ, ধ, ন।

(৫) **প-বর্গ ওষ্ঠ্যধ্বনি**—ওষ্ঠাধর পরস্পরের সংলগ্ন অবস্থায় থাকলে শ্বাসবায়ু জোরে ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিয়ে নির্গত হয়। এইভাবে উচ্চারিত প, ফ, ব, ভ, ম ধ্বনিগুলি ওষ্ঠ্যধ্বনি হিসাবে পরিচিত।

এই যে পঁচিশটি ধ্বনি দেখলেন, মনে রাখবেন—এগুলির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই এগুলি স্পৃষ্টধ্বনি নামে (Stop) পরিচিত।

এরপর আমরা পাই য, র, ল, ব যার মধ্যে 'য' ও 'ব' আমাদের বর্গীয় 'জ' ও 'ব'-এর সঙ্গে উচ্চারণে একাকার হয়ে গেছে। বাকি থাকে 'র' ও 'ল'। এই দুটি ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ যথাক্রমে দন্তমূল ও দন্ত স্পর্শ করে থাকে ও শ্বাসবায়ু জিহ্বার দুইপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। তাই এগুলিকে পার্শ্বিক ধ্বনি (Latteral) বলা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে আসে তিনটি শ, ষ, স এবং 'হ'। এগুলির মধ্যে 'শ' উচ্চারণে জিহ্বাগ্র তালু, 'ষ' উচ্চারণে মূর্ধা এবং 'স' উচ্চারণে দন্তমূল স্পর্শ করে এবং বায়ুপ্রবাহ এক সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে বাইরে আসে। তাই এগুলিকে উষ্মধ্বনি বলা হয়। এদের মধ্যে 'হ' ধ্বনিটির উৎপত্তিস্থল কণ্ঠনালী।

ড় ও ঢ় ধ্বনিদুটি উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র উলটিয়ে যথাক্রমে মূর্ধা এবং তালুর কঠিন অংশে আঘাত করতে হয়। তাই এ দুটি তাড়নাজাত ধ্বনিরূপে (Flapped) পরিচিত।

'য়' ধ্বনিটি 'ইঅ' রূপে উচ্চারিত হয়। তাই এটিকে অর্ধস্বর বলা হয়। 'ং' বাংলায় 'ঙ' ধ্বনির সঙ্গে সমীকৃত, তাই এটিকেও আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। 'ঃ' ধ্বনিটি সংস্কৃতে থাকলেও বাংলায় প্রায়ই এটি অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত বা অবলুপ্ত (দুঃখ > দুক্‌খ, কার্যতঃ > কার্যত)। ঁ(চন্দ্রবিন্দু) প্রকৃতপক্ষে স্বরধ্বনির অনুনাসিক উচ্চারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তাই এই কয়টি ধ্বনি বাংলা ভাষায় পূর্ণ ব্যঞ্জনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আমরা বলতে পারি না।

এইবার লক্ষ করুন, যে পাঁচটি বর্গের কথা আমরা আলোচনা করলাম তার প্রত্যেকটির ধ্বনিগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ লক্ষ্য বর্তমান। যেমন—

(১) প্রতিটি বর্গের পঞ্চম ধ্বনিটি নাসিক্য। অর্থাৎ এগুলির উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু নাসাপথে নির্গত হয়। যেমন—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

(২) বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিগুলির তুলনায় তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিগুলি গাম্ভীর্যপূর্ণ ও নাদযুক্ত। তাই এই কম গাম্ভীর্যের মৃদু ধ্বনিগুলিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি এবং নাদযুক্ত গম্ভীর ধ্বনিগুলিকে বলা হয় সঘোষ ধ্বনি। ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি অঘোষ। গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি সঘোষ।

(৩) বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিতে প্রাণ বা নিশ্বাস (হ-কার জাতীয় ধ্বনি) যুক্ত হয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থধ্বনির উৎপত্তি হয়। এই কারণে প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণধ্বনি ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণধ্বনি। ক, গ, ট, ড, প, ব ইত্যাদি অল্পপ্রাণ। অন্যদিকে খ, ঘ, ঠ, ঢ, ফ, ভ ইত্যাদি মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অর্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের তিনটি পর্যায়ভুক্ত বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে—উচ্চারণস্থান, শ্বাসবায়ুর গতিপথ (নাসাপথ বা মুখবিবর) এবং শ্বাসবায়ু নির্গমনের প্রকৃতি (পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত বা আংশিক বাধাপ্রাপ্ত)। তবে লক্ষ করে দেখুন, ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে জিহ্বা এবং ওষ্ঠাধর।

২৯.৫ স্বনিম ও পুরকধ্বনি / উপধ্বনি

এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয়ই একটি বিষয় অনুধাবন করতে পেরেছেন যে প্রত্যেকটি ধ্বনির একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চারণরীতি আছে, যে কারণে সেটি অন্য ধ্বনির থেকে পৃথক রূপে শ্রুতিগ্রাহ্য হচ্ছে।

এবার লক্ষ করুন, কোনো ধ্বনি শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হবার সময় অন্যধ্বনির সান্নিধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে (শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত) থাকতে বাধ্য হয়। অনেক সময় দেখা যায় এই আবস্থানিক কারণ বা অন্যধ্বনির প্রতিবেশ কোনো বিশেষ একটি ধ্বনিকে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে এবং তার উচ্চারণপদ্ধতি বদলে দেয়। একটি দৃষ্টান্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন 'আলতা' শব্দটি উচ্চারণ করছেন, দেখবেন 'ল' ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বাগ্র তখন দন্ত স্পর্শ করছে। আবার যদি 'উলটা' শব্দটি বলতে যান, তখন খেয়াল করুন জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করছে

মূর্ধা। এর কারণ 'ল' ধ্বনির ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধ্বনিপ্রতিবেশ—'আলতা'য় 'দন্ত্য' ধ্বনি 'ত' এর এবং 'উলটা'য় মূর্ধন্যধ্বনি 'ট'-এর। অর্থাৎ 'ল'-এর দুটি ধ্বনিরূপ পাচ্ছেন—দন্ত্য 'ল' ও মূর্ধন্য-'ল'।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছেন যে 'ল'-এর উচ্চারণস্থান দন্ত। এক্ষেত্রে দন্ত 'ল' ধ্বনিটিকে আমরা বলব মূলধ্বনি বা স্বনিম (Phoneme)। একে ধ্বনিমূলও বলা হয়। আর এই 'ল' স্বনিমের যে নানা উচ্চারণ বৈচিত্র্য তাকে বলব পূরকধ্বনি বা উপধ্বনি (Allophone) যাদের সহধ্বনি বা বিস্বন নামেও চিহ্নিত করা হয়। যে কোনো ধ্বনিমূল বা স্বনিমেরই এক বা একাধিক উপধ্বনি থাকতে পারে।

২৯.৬ সারাংশ

এতক্ষণ আমরা বাংলা স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। সামগ্রিক পর্যালোচনায় বাংলাভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহ সম্পর্কে যে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হল, সেগুলি এইপ্রকার—

(ক) স্বরধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর নির্গমপথে কোথাও বাধা সৃষ্টি হয় না, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু আংশিক বা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(খ) স্বরধ্বনিগুলি সবই সঘোষ কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি সঘোষ ও অঘোষ—উভয় প্রকারেরই হয়।

(গ) স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি—উভয় ধ্বনির উচ্চারণকালেরই বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে জিহ্বা ও ওষ্ঠাধর এই বাক্‌প্রত্যঙ্গ দুটি।

(ঘ) সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনুসরণ করার কারণে আমাদের লিখিত ধ্বনিরূপে যতগুলি ধ্বনির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, উচ্চারিত রূপে ধ্বনির সংখ্যা তার চেয়ে কম। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা সাতটি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে ত্রিশটিতে এই সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

(ঙ) স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়ধ্বনির সমবায়ে অর্থপূর্ণ শব্দের উৎপত্তি। আর এই শব্দগুলির যতটুকু অংশ আমাদের উচ্চারণের স্বল্পতম প্রয়াসে তৈরি হয় তাকে বলা অক্ষর।

২৯.৭ অনুশীলনী

১। **নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন ঃ**

ধ্বনি ও বর্ণ, সংবৃত ও বিবৃত স্বরধ্বনি, স্পৃষ্ট ও উষ্ম ব্যঞ্জন, মৌলিক ও যৌগিক স্বরধ্বনি, সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি,

২। **নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলিতে কোন্ কোন্ ধ্বনির উচ্চারণ হয় তা নির্ণয় করার চেষ্টা করুন ঃ**

(ক) মুখবিবরে কোথাও বাধাসৃষ্টি না করে ও ওষ্ঠাধর গোলাকৃতি করে।

(খ) মুখবিবরে কোথাও না কোথাও বাধাসৃষ্টি করে এবং শ্বাসবায়ু নাসাপথে নির্গত করে।

(গ) জিহ্বার অগ্রভাগ উলটিয়ে মূর্ধা স্পর্শ করে।

৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন ঃ

(ক) সম্মুখ স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

(খ) বর্গীয় অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ এবং সঘোষ-অঘোষ ধ্বনি।

(গ) বাংলা বর্ণমালাভুক্ত কিন্তু উচ্চারণে অপ্রচলিত ধ্বনিসমূহ।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দৃষ্টান্তসমূহ বিশদ আলোচনা করুন ঃ

(ক) বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিভেদ।

(খ) স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ।

(গ) বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পারস্পরিক তুলনা।

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. ড. পবিত্র সরকার—ভাষা জিজ্ঞাসা।

একক ৩০ ❐ বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন

গঠন

৩০.১ উদ্দেশ্য

৩০.২ প্রস্তাবনা

৩০.৩ ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

৩০.৪ ধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ প্রক্রিয়া

৩০.৫ বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তন

৩০.৬ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

৩০.৭ সারাংশ

৩০.৮ অনুশীলনী

৩০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যাপারটিকে একটি অনিবার্য নিয়ম হিসাবে বুঝতে পারবেন।
- ধ্বনির পরিবর্তন ঘটাবার পিছনে সক্রিয় কারণগুলি খুঁজে নিতে পারবেন।
- ধ্বনি পরিবর্তন যে কয়টি সাধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটে, সেগুলির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে পারবেন।
- বাংলাভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের ধারাটি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৩০.২ প্রস্তাবনা

যে কোনো ভাষায় সময়ের সঙ্গেসঙ্গে যে-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ নিহিত থাকে ওই ভাষার বিভিন্ন ধ্বনির পরিবর্তনের মধ্যে। প্রতি মুহূর্তে লোকমুখে ব্যবহৃত হ'তে হ'তে, আমাদের অজ্ঞাতেই এই ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তনের ব্যাপারটি এত সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে, আমরা দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারের অসচেতন চেষ্টায় তা টের পাই না। দীর্ঘদিন বা সুদূরস্থানের ব্যবধান ঘটলে, তখন আমাদের কানে এই পরিবর্তনের ব্যাপারটি ধরা পড়ে।

বক্তার মুখ থেকে শোনা বাক্য বা ধ্বনিসমষ্টি শ্রোতার কানে পৌঁছলে তবে ভাষার মাধ্যমে মনের ভাবের বিনিময় ঘটেছে—আমরা বলতে পারি। কিন্তু এই বক্তার বলা ও শ্রোতার শোনার মধ্যে অনেকরকম স্খলন বা

ত্রুটি ঘটতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে এই ত্রুটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। কিন্তু এই ঘটনাটি পরম্পরাক্রমে চলতে থাকলে, একটা সময় আসে যখন মূলের সঙ্গে পরিবর্তিত ধ্বনির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ধ্বনির এই মূল রূপ এবং পরিবর্তিত রূপের বিবর্তনের পথটিকে চিনতে হলে যে-শব্দের ক্ষেত্রে এই বিবর্তন ঘটেছে তারও মূলরূপটিকে আমাদের জেনে নিতে হয়। তাছাড়া ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাটিকে সামগ্রিকভাবে বুঝে নিয়ে, কেন পরিবর্তন ঘটে—সেই কারণও আমরা নির্ণয় করতে পারি। উপরন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করলে এই ধ্বনিপরিবর্তনের বিচিত্র প্রকাশরূপের মধ্য থেকে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্রও নির্দিষ্ট করে নিতে পারি।

আসুন, আমরা ক্রমান্বয়ে ধ্বনিপরিবর্তনে দায়ী কারণগুলিকে এবং পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলিকে প্রথম বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

৩০.৩ ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণসমুহকে নানাজন নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেন। এই সবগুলি মতের সমবায়ে প্রধানত একটি সিদ্ধান্ত আমরা প্রাথমিকভাবেই করতে পারি—ধ্বনিপরিবর্তনের জন্য দায়ী দুটি কারণ, একটি—ভাষার উপর বহিঃপ্রভাব এবং অন্যটি আভ্যন্তরীণ। এই বাহ্য বা বহিঃপ্রভাবজাত কারণগুলির মধ্যে রয়েছে অন্যভাষার সংশ্রব, বিশেষ কোনো ব্যক্তির প্রভাব বা লিপিবিভ্রাট। আভ্যন্তরীণ কারণগুলি প্রধানত নির্ভর করে ভাষাব্যবহারকারী বক্তা ও শ্রাতার উপর—বক্তার জিহ্বার জড়তা, শ্রোতার সঠিক না শুনতে পাওয়া, দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে উচ্চারণবিকৃতি, উচ্চারণের প্রয়াস লাঘব এবং সর্বোপরি বক্তা-শ্রোতার মানসিক কিছু কারণ এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আসুন, আমরা নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে এই কারণগুলিকে চিহ্নিত করি—

(ক) ধ্বনিপরিবর্তনে বাহ্যিক প্রভাব।

(খ) ধ্বনিপরিবর্তনের বক্তা-শ্রোতার শারীরিক কারণ।

(গ) ধ্বনিপরিবর্তনের বক্ত-শ্রোতার মানসিক কারণ।

(ক) ধ্বনিপরিবর্তনে বাহ্যিক প্রভাব ঃ

ভিন্ন ভাষার প্রভাব—কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভিন্ন কোনো ভাষাগোষ্ঠীর সংশ্রবে এলে একভাষার কিছু ধ্বনির অন্যভাষায় সংক্রামিত হতে পারে। যেমন আররি ও ইংরেজিভাষার সংস্পর্শে বাংলার ওষ্ঠধ্বনি 'ফ' রূপান্তরিত হয়েছে দন্তোষ্ঠ্য 'ফ' ধ্বনিতে।

ব্যক্তিগত প্রভাব—কোনো পরিবার বা ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণরীতি অপর কোনো ব্যক্তির উচ্চারণ বা সামগ্রিকভাবে ভাষার ধ্বনিতে পরিবর্তন আনতে পারে। 'শ' ধ্বনিটির এইরকম বিশিষ্ট উচ্চারণ আজকাল রেডিও বা দূরদর্শনের ঘোষক-ঘোষিকার মুখে হয়ত শুনে থাকবেন।

লিপিবিভ্রাট—কোনো একভাষার শব্দ অপর ভাষায় শিখতে গেলে, সমধ্বনিপ্রকাশক বর্ণের অভাবে অনেক সময় কাছাকাছি উচ্চারণে নিয়ে আসা হয়। এরফলে ধ্বনিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। যেমন—চিনের রাজধানীর নাম পিকিং/পেইচিং/বেইজিং নানারকমভাবে লেখা হয়, অথচ এর কোনোটিই চিনাভাষায় মূল

উচ্চারণের সদৃশ নয়। ইংরেজি নামকরণেও দেখবেন এরকম ধ্বনিবিভ্রাট অনেক হয়েছে, যেমন—'কলকাতা' হয়েছে 'ক্যালকাটা', পদবী 'বসু' হয়েছে 'বোস'।

(খ) বক্তা-শ্রোতার শারীরিক কারণ ঃ

বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি—জিহ্বার জড়তা থাকলে অনেক সময় কোনো ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারিত না হয়ে ভিন্নতর রূপ লাভ করে। যেমন সংস্কৃত 'ষ' ধ্বনিটি বাংলায় 'শ'-এ পরিণত হয়েছে।

শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি—শ্রোতার শ্রবণযন্ত্রে কোনো ত্রুটি থাকলে বক্তার কথা যথাযথভাবে তিনি শুনতে পাবেন না। সেক্ষেত্রেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। তবে এরকম পরিবর্তন সামগ্রিক ভাষার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

উচ্চারণে অক্ষমতা—অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে দুরুচ্চার্য শব্দ বা বিদেশি শব্দ উচ্চারণে অনেক সময় এই জাতীয় ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। যেমন—ইংরেজি Box শব্দটি আমাদের উচ্চারণে হয়েছে 'বাকস্' বা বেঞ্চ > বেঞ্চি। মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত গল্পে পাই তিনি 'উষ্ট্র'কে বলেছিলেন 'উট্র'।

উচ্চারণে দ্রুততা—খুব তাড়াতাড়ি কথা বলার সময় শব্দমধ্যস্থ কোনো ধ্বনি স্খলিত হয়ে পড়তে পারে, যার ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। যেমন—কোথা যাবে > কোজ্জাবে বা কোথা থেকে > কোত্থেকে।

অল্পায়াসপ্রবণতা—শব্দের উচ্চারণকে সহজ করার জন্য অনেকসময় নানাবিধ উপায়ে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—যুক্তব্যঞ্জন ভেঙ্গে (জন্ম > জনম), অন্যধ্বনি জুড়ে (স্কুল > ইস্কুল), দুটি আলাদা ব্যঞ্জনকে একই ব্যঞ্জনে পরিণত করে (কর্ম > কম্মো) বা ধ্বনি লুপ্ত করে (মধু > মউ)।

শ্বাসাঘাত—নিজের অজান্তে শব্দের মধ্যে সঠিক জায়গায় শ্বাসাঘাত না পড়লে, ধ্বনিতে পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন—গামোছা > গাম্‌ছা, অলাবা > লাউ।

(গ) বক্তা-শ্রোতার মানসিক কারণ :

অজ্ঞতা—অজ্ঞতাহেতু অনেকসময় যথাযথ উচ্চারণে অক্ষমতা আসে। না জেনে ভুল শব্দকে শুদ্ধ ভেবে উচ্চারণ করলেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন—ব্যাজ (Badge) > ব্যাচ, উচ্চারণ > উশ্চারণ।

ভাবপ্রবণতা—আবেগাতিশয্যে অনেক সময় শব্দে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন—সবাই > সব্বাই, ছোট > ছোট্ট, সকলে > সক্কলে, একেবারে > এক্কেবারে।

বিশুদ্ধিপ্রবণতা—অনেকসময় শব্দকে সাধুভাষার উপযোগী বা শিষ্টতর রূপ দিতে গিয়ে, শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ বিবেচনা করে, তার ধ্বনিপরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—পুষ্ট > পুরুষ্ট।

ছন্দ রক্ষা—কবিতায় ছন্দ বজায় রাখার জন্য অনেক সময় শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—স্নান> সিনান, মুক্ত > মুকুতা।

লোকনিরুক্তি—অপরিচিত বিদেশি শব্দকে নিজে ভাষার চেনা শব্দের সদৃশ করে উচ্চারণ করার চেষ্টায় ধ্বনিপরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন—'হাঁসপাতাল' শব্দটি——Hospital'-কে 'হাঁস' ও 'পাতাল' শব্দের সাদৃশ্যে নিয়ে আসার ফলশ্রুতি।

সাদৃশ্য—কোনো দুটি সদৃশ শব্দের কোনো একটিতে যদি কোনো ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, তবে অপরটিতেও সেই পরিবর্তন ঘটবে, এই বোধ থেকে অপর শব্দটিতেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—'বৌ' আর 'বউড়ি' শব্দদুটি সমার্থক। এদেরই সাদৃশ্যে 'শাস' শব্দটিকে করা হয়ে 'শাসুড়ি', 'ঝি' হয়েছে 'ঝিউড়ি'।

৩০.৪ ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ প্রক্রিয়া

এইভাবে নানা কারণে শব্দস্থিত ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়। বিভিন্ন শব্দের মূল রূপ এবং পরিবর্তিত রূপের যদি একটি তালিকা তৈরি করেন, তবে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন—ধ্বনিগত পরিবর্তনের সাধারণ কয়েকটি প্রক্রিয়া শব্দগুলির ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়েছে। আসুন, এবার আমরা এই সাধারণ প্রকির্য়া বা নিয়মগুলিকে লক্ষ করি। মূলত চারীটি নিয়মে বাংলা শব্দের যাবতীয় পরিবর্তনগুলিকে গুচ্ছবন্ধ করা সম্ভব, যে চারটি নিয়ম হ'ল নিম্নপ্রকার :—

(১) **ধ্বনির সংযোজন**—উচ্চারণের সুবিধার্থে বা সৌন্দর্যসাধনে শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত অবস্থানে নতুন কোনো ধ্বনি যুক্ত করা হয়। যেমন—স্পর্ধা > আস্পর্ধা, গ্লাস > গেলা, মিষ্ট > মিষ্টি।

(২) **ধ্বনির বিয়োজন**—উচ্চারণে দ্রুততায় বা অন্য ধ্বনিতে প্রবল শ্বাসসাঘাত পড়ায়, শব্দস্থিত কোনো ধ্বনি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—উদ্ধার > ধার, কলিকাতা > কলকাতা, জল > জল্ ইত্যাদি। ধ্বনিলোপ শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত—যেকোন অবস্থানেই ঘটতে পারে।

(৩) **ধ্বনি পরিবর্তন**—উচ্চারণের সুবিধার্থে অনেকসময় এক ধ্বনির পরিবর্তে অন্যধ্বনি ব্যবহার করে শব্দকে সহজতর রূপ দেওয়া হয়। যেমন—কর্ম > কম্মো (র > ম), জুতা > জুতো (আ > ও), কাক > কাগ (ক > গ)।

(৪) **ধ্বনির স্থানপরিবর্তন**—উচ্চারণের দ্রুততায় বা অজ্ঞতাহেতু অনেকসময় শব্দস্থিত ধ্বনিদ্বয় পরস্পর স্থান বদল করে। যেমন—রিক্সা > রিসকা, মুকুট > মটুক।

৩০.৫ বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তন

আপনি ধ্বনিপরিবর্তনের চারটি সূত্র দেখলেন। এইবার এই চারটি সূত্র অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ধারাটিকে সজ্জিত করে নিয়ে, আসুন তার গতিপ্রকৃতিটি বুঝে নেওয়া যাক।

১. স্বরধ্বনির সংযোজন ঃ

স্বরাগম : উচ্চারণসৌন্দর্যের জন্য বা উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তে স্বরধ্বনি এনে বসাবার রীতিকে স্বরাগম বলা হয়। যেমন—

আদিস্বরাগম—স্ত্রী > ইস্ত্রি (প্রাকৃতে), স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

মধ্যস্বরাগম—একে বাংলা ব্যাকরণে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—ইন্দ্রা > ইন্দিরা, ভক্তি > ভকতি, ফিল্ম > ফিলিম, প্রীতি > পিরীতি।

অন্তস্বরাগম—দিশ > দিশা, কায় > কায়া, ট্যাকস > ট্যাকসো, মিষ্ট > মিষ্টি।

২. স্বরধ্বনির বিয়োজন ঃ

স্বরলোপ : শব্দস্থিত স্বরধ্বনি অনেকসময় লুপ্ত হয়ে যায় দুর্বল শ্বাসাঘাত বা শ্বাসাঘাতহীনতার কারণে। এক্ষেত্রে লুপ্ত স্বরধ্বনি বাদে অন্য কোনো ধ্বনিতে শ্বাসাঘাত পড়ে। এই রীতিটিকেই স্বরলোপ বলা হয়। এই জাতীয় ধ্বনিপরিবর্তনও শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত—তিনরকম অবস্থানেই ঘটতে পারে।

আদিস্বরলোপ—অভ্যন্তর > ভিতর, আনোনা > নোনা, উদুম্বুর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ—গামোছা > গাম্ছা, আমাড়া > আমড়া, ঘোড়াদৌড় > ঘোড়্দৌড়।

অন্তস্বরলোপ— ফল > ফল্, ষট্ > ছয় > ছ', বৃদ্ধি > বাড়্, রাতি > রাত।

৩. স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঃ

স্বরসঙ্গতি : বাংলায়, বিশেষ করে মৌখিক বা চলিত বাংলায়, কোনো কোনো শব্দে পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়, বাংলার উচ্চারণগত সেই বিশিষ্ট রীতিকে স্বরসঙ্গতি বলে। স্বরসঙ্গতি চার প্রকার—

(ক) পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তীস্বর পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন—জুতা > জুতো, ঠিকা > ঠিকে।

(খ) পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন—অতি > ওতি, মিশে > মেশে।

(গ) পূর্ব এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে এই দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন—বিলাতি > বিলিতি।

(ঘ) পূর্ব এবং পরবর্তী স্বর উভয়েই যদি পারস্পরিক প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তাবে তাকে বলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি। যেমন—(ঝোলা > ঝুলি)।

অভিশ্রুতি : অপিনিহিতি-জাত 'ই'-কার বা 'উ'-কার এক বিশেষ সন্ধির নিয়মে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে তার রূপের যে পরিবর্তন ঘটায়, সেই পরিবর্তনই হল অভিশ্রুতি। যেমন—মাছুয়া > মাইচ্ছা (অপিনিহিতি) > মেছো (অভিশ্রুতি), রাখিয়া > রাইখ্যা (অপিনিহিতি) > রেখে (অভিশ্রুতি)।

৪. স্বরধ্বনির স্থান-পরিবর্তন ঃ

অপিনিহিতি : শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনযুক্ত কোনো 'ই'-কার বা 'উ'-কার থাকলে, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত আগেই উচ্চারণ করে ফেলার রীতিকে অপিনিহিতি বলে। যেমন—আজি > আইজ, চারি > চাইর, গাছুয়া > গউচ্ছা, কন্যা > কইন্যা, বাক্য > বাইক্ক।

৩০.৬ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

বাংলা স্বরধ্বনির মত বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকেও আমরা ধ্বনি পরিবর্তনের ওই চারটি সূত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত করেই এইবার পর্যালোচনা করব।

১. ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোজন ঃ

ব্যঞ্জনাগম : স্বরধ্বনির মতোই শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত অবস্থানে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্ত করার প্রবণতা বাংলাভাষায় দেখা যায়। এই রীতিকে বলা হয় ব্যঞ্জনাগম। যেমন—

শব্দের আদিতে—ওঝা > রোজা, উপকথা > রূপকথা

শব্দের মধ্যে—বানর > বান্দর, মকদ্দমা > মোকর্দমা, অল্প > অম্বল, পুষ্ট > পুরুষ্ট,

শব্দের শেষে—ছাই > ছালি, তাঐ > তালৈ

শ্রুতিধ্বনি : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি নিলে যৌগিকস্বর উৎপন্ন না হলে, ওই দুই স্বরের মাঝখানে একটি অর্ধব্যঞ্জনের আগমন ঘটে। এইরকম ধ্বনির আগমকে শ্রুতিধ্বনি বলে। য, ব, হ ইত্যাদি ধ্বনিকে শ্রুতিধ্বনি হিসেবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন—

কি করে খাই > কিয়ার খাই

যা + আ > যাওয়া ('ওয়া' আসলে অন্তঃস্থ 'ব' আ)

বিপুলা > বিউলা > বেহুলা

রাজকুল > রাউল > রাহুল

২. ব্যঞ্জনধ্বনির বিয়োজন ঃ

ব্যঞ্জনলোপ : স্বরধ্বনির মতোই শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তস্থিত ব্যঞ্জন অনেকসময় লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—

আদি ব্যঞ্জন লোপ—স্থিত > থিতু, শ্মশান > মশান।

মধ্য ব্যঞ্জন লোপ—শৃগাল > শিয়াল, ফলাহার > ফলার, অন্ধকার > আঁধার।

অন্ত ব্যঞ্জন লোপ—কহি > কই, আম্র > আম, রাধিকা > রাই।

সমাক্ষরলোপ : পাশাপাশি অবস্থিত সদৃশ বা সমধ্বনির ব্যঞ্জন উচ্চারণ দ্রুততায় অনেক সময় লুপ্ত হয়ে যায়, যাকে বলা হয় সমাক্ষর লোপ।

যেমন—পটললতা > পলতা, পাটকাঠি > প্যাকাটি, মধ্যদেশীয়া > মদেশীয়া, বড়দাদা > বড়দা, ছোটকাকা > ছোটকা।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান-পরিবর্তন ঃ

বিপর্যাস/বর্ণবিপর্যয় : শব্দমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিদ্বয় যদি পরস্পরের স্থান বিনিময় করে, তবে সেই রীতিটাকে বলা হয় বিপর্যাস বা বর্ণবিপর্যয়।

যেমন—পিশাচ > পিচাশ, বারাণসী > বেনারস, হ্রদ > দহ, প্লাটুন > পল্টন।

৪. ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঃ

সমীভবন : পাশাপাশি বা যুক্ত অবস্থায় থাকা দুটি পৃথক ব্যঞ্জনধ্বনিকে সদৃশ বা একই ব্যঞ্জনে পরিণত করার যে প্রবণতা, তাকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবন তিন প্রকার—

(ক) পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি সমতা প্রাপ্ত হলে তাকে বলা হয় প্রগত সমীভবন। যেমন পদ্ম > পদ্দ, পক্ক > পক্ক।

(খ) পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন সম অবস্থায় এলে তাকে বলা হয় পরাগত সমীভবন। যেমন—কর্ম > কম্মো, তর্ক > তক্কো, মূর্খ > মুখ্খু, সাতজন > সাজ্জন।

(গ) যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ব্যঞ্জনই পরস্পরের প্রভাবে বদলে গিয়ে অন্য আরেকটি ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, তখন তাকে বলা হয় অন্যোন্য সমীভবন। যেমন—অদ্য > অজ্জ > আজ, সত্য > সচ্চ (প্রাকৃতে)।

বিষমীভবন : শব্দস্থিত দুটি সদৃশ বা সমব্যঞ্জনের কোনো একটি যদি পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, তবে তাকে বলে বিষমীভবন। এই প্রক্রিয়াটি সমীভবনের বিপরীত বলা যায়। যেমন—শরীর >শরীল, লাল > নাল, মর্মর > মার্বল।

ঘোষীভবন ও অঘোষীভবন : শব্দের অঘোষধ্বনিকে ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত করলে তাকে বলা হয় ঘোষীভবন। এরই বিপরীতক্রমে ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হ'লে, তাকে বলে অঘোষীভবন। যেমন—

ঘোষীভবন—কাক > কাগ (ক > গ), বাপবেটা > বাববেটা (প > ব)

অঘোষীভবন—গুলাব > গোলাপ (ব > প), বীজ > বীচি (জ > চ)

মহাপ্রাণীভবন ও অল্পপ্রাণীভবন : কোনো মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন যদি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তর লাভ করে তবে তাকে বলা হয় মহাপ্রাণীভবন। এরই উল্টোদিকে মহাপ্রাণ কোনো ব্যঞ্জন যদি অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়, তবে তাকে বলে অল্পপ্রাণীভনব। যেমন—

মহাপ্রাণীভবন—কাঁটাল > কাঁঠাল (ট > ঠ), মস্তক > মাথা (ত > থ)

অল্পপ্রাণীভবন—সুখ > সুক (খ > ক), মধু > মদু (ধ > দ), শৃঙ্খল > শেকল (খ > ক)।

নাসিক্যীভবন ও বিনাসিক্যীভবন : নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ ও অনুনাসিক করে তোলে তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাসিক্যীভবন। যেমন—হংস > হাঁস, দন্ত > দাঁত, কণ্টক > কাঁটা, সন্ধ্যা > সাঁঝ।

অনেক সময় নাসিক্যব্যঞ্জনের উপস্থিতি—লোপ ইত্যাদি ব্যতীতই শব্দস্থিত কোনো ধ্বনি অনুনাসিক হয়ে উঠতে পারে। একে বলা হয় স্বতঃ নাসিক্যীভবন। যেমন—পুস্তক > পুঁথি, ইষ্টক > ইঁট, পেচক > পেঁচা, যুথী > জুঁই, সূচ > ছুঁচ।

শব্দের নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে গিয়ে যদি অন্য কোনো ধ্বনিকে অনুনাসিক না করে তোলে, তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বিনাসিক্যীভবন। যেমন—মঞ্চ > মাচা, কিঞ্চিৎ > কিছু, শৃঙ্খল > শিকল, অভ্যন্তর > ভিতর।

মূর্ধন্যীভবন : ঋ, র, ষ, ধ্বনি বা কোনো মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাবে দন্ত্যধ্বনি মূর্ধন্যধ্বনিতে পরিণত হ'লে তাকে মূর্ধন্যীভবন বলা হয়। যেমন—বিকৃত > বিকট (ত > ট), তির্যক > টেরা, মৃত্তিকা > মাটি, দক্ষিণ > ডাহিন > ডান (দ > ড)।

অনেক সময় কোনো ধ্বনির প্রভাব ব্যতীতই দন্ত্যধ্বনির মূর্ধন্যীভবন ঘটে যাকে বলা হয় স্বতঃ মূর্ধন্যীভবন। যেমন—পততি > পড়ই > পড়ে, দংশক > ডাঁশা, বাল্‌তি > বাল্‌টি।

দ্বিত্বীভবন : শ্বাসাঘাতের কারণে, বক্তার আবেগপ্রাবল্যে বা গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে একক ব্যঞ্জনকে অনেক সময় যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত করা হয়, যাকে বলে দ্বিত্বীভবন। যেমন—সকাল >সক্কাল, ছোট > ছোট্ট, সবাই >সব্বাই।

এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনির আরও বহুবিধ পরিবর্তন ভাষাদেহের বহু অংশেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

উষ্মীভবন—ফুল > ফুল, জানতে > জানতে

সকারীভবন—গাছতলা > গাস্‌তলা, পাঁচসের > পাঁসসের

রকারীভবন—পঞ্চদশ > পন্নডহ > পন, দ্বাদশ > বারহ > বার।

তালব্যীভবন—মধ্য > মাঝ, চিকিৎসা > চিকিচ্ছে।

৩০.৭ সারাংশ

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছেন যে, কোনো ভাষার ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হলেও শব্দে বা বাক্যে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন তার উপর তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাব কার্যকর হয়। আসুন, সংক্ষেপে আরেকবার সমগ্র বিষয়টিকে ঝালিয়ে নিই—

ধ্বনির পরিবর্তন ঘটা সম্ভব তখনই যখন সেটি শব্দ বা বাক্যে, অন্যান্য ধ্বনির প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়।

শব্দস্থিত ধ্বনি তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়।

ভাষাব্যবহারকারী মানুষের নানা শারীরিক ক্রিয়া, মানসিক অবস্থা বা ভাষাপরিবেশ ধ্বনিপরিবর্তন ঘটাবার অন্যতম কারণ।

ধ্বনির পরিবর্তনের প্রক্রিয়া স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়।

ধ্বনি পরিবর্তনের যাবতীয় দৃষ্টান্তগুলিকে আমরা সাধারণ চারটি সূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারি।

তবে এইসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে ধ্বনি পরিবর্তনের এই যে বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'লে, এগুলি বাংলাভাষার ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। এই প্রক্রিয়া বা ধারাগুলি অন্যভাষায় নাও থাকতে পারে।

৩০.৮ অনুশীলনী

১। **নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন ঃ**

সমীভবন ও দ্বিত্বীভবন, স্বরসঙ্গতি ও অপিনিহিতি, স্বরাগম ও স্বরভক্তি, ঘোষীভনব ও অল্পপ্রাণীভবন।

২। **সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করুন (দৃষ্টান্ত সহ) ঃ**

অভিশ্রুতি, স্বরাগম, মূর্ধন্যীভবন, বিনাসিক্যীভবন, মহাপ্রাণীভবন, অঘোষীভবন, বিষমীভবন।

৩। **নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন কোন নিয়ম কার্যকর হয়েছে তা নির্দেশ করুন ঃ**

ধর্ম > ধম্ম, মুক্তা > মুকুতা, মিষ্ট > মিষ্টি, একেবারে > এক্কেবারে, রাতি > রাইত > রাত, আম্র > আম, মেজদিদি > মেজদি, কাঁটাল > কাঁঠাল।

৪। **দৃষ্টান্তসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করুন ঃ**

(ক) ধ্বনিপরিবর্তনের সক্রিয় বক্তা-শ্রোতার মানসিক কারণ।

(খ) ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ সূত্রাবলী।

(গ) বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিয়োজনমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন।

(ঘ) বাংলা স্বরধ্বনির রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন।

(ঙ) বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান-বিনিময়মূলক পরিবর্তন।

৩০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. ড. জীবেন্দু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

৪. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ভাষাবিদ্যা পরিচয়।

একক ৩১ ❐ রূপগঠন প্রণালী : বাংলা শব্দের রূপতত্ত্ব

গঠন

৩১.১ উদ্দেশ্য

৩১.২ প্রস্তাবনা

৩১.৩ মূলপাঠ

৩১.৩.১ রূপিম / মূলরূপ / রূপমূল

৩১.৩.২ রূপিম, শব্দ ও অক্ষর

৩১.৩.৩ রূপিম সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া

৩১.৩.৪ উপরূপ ও সমধ্বনিরূপ

৩১.৪ সারাংশ

৩১.৫ রূপিমের শ্রেণিভেদ

৩১.৬ অনুশীলনী

৩১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শব্দের গঠন অনুযায়ী তার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- শব্দের রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি যোগ করা) সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমরা প্রথমে একটি ধারণা তৈরি করতে চেষ্টা করব। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনির নানাপ্রকার বিন্যাসে অর্থপূর্ণ নানা শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু শব্দই ভাষার ন্যূনতম অর্থপূর্ণ একক নয়, ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে এই মর্যাদা পাবার যোগ্য রূপিম বা মূলরূপ বা রূপমূল (Morpheme) এই রূপিম ও শব্দের পার্থক্য, অক্ষরের সঙ্গেই বা তার তফাৎ কোথায়, কীভাবে এই রূপিমের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, সেই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করে শব্দ ও রূপের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা অর্জন করার চেষ্টা করব।

৩১.৩ মূলপাঠ

সাধারণভাবে আমরা বলি যে ধ্বনির অব্যবহিত পরের বৃহত্তর একক হল শব্দ (word), কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তম এককটি শব্দ নয়, সেটি হল রূপিম বা রূপমূল বা মূলরূপ (Morpheme)। রূপিম কখনও কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দ হিসাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে, কখনও কখনও একাধিক রূপিম যুক্ত অবস্থায় অর্থপূর্ণ শব্দের মর্যাদা পেয়ে, তবে বাক্যে বা কথায় ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। যেমন ধরুন—'মানুষ' রূপটি এককভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হতে সক্ষম। কিন্তু 'গণ' এই রূপটি অর্থপূর্ণ শব্দি হিসাবে এককভাবে বাক্যে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। সেক্ষেত্রে তাকে 'মনুষ্য' জাতীয় অর্থপূর্ণ রূপকে আশ্রয় করে, যুক্তভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে হয়। যেমন—মনুষ্যগণ। রূপিম হিসাবে এইভাবে আমাদের পরিচিত শব্দগুলি যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি রূপিম হিসাবে বিভিন্ন বচন ও কারকের চিহ্নস্বরূপ বিভক্তিগুলি এবং লিঙ্গানির্দেশক প্রত্যয়গুলিও ব্যবহৃত হয়। তাহলে এইবার রূপিম হিসাবে আমরা কোন্ ভাষা-এককগুলিকে সনাক্ত করব, কীভাবেই বা করব অর্থাৎ এককথায় রূপিম কাকে বলব আর কাকে বলব না, তার বিচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

৩১.৩.১ রূপিম/মূলরূপ/রূপমূল

বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী রূপিম সম্পর্কে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেগুলিকে একত্র করলে রূপিম সম্পর্কে একটি সম্যক সংজ্ঞার্থ পাওয়া সম্ভব। মোটামুটি এইভাবে আমরা বলতে পারি : রূপিম বা মূলরূপ বা রূপমূল হ'ল এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত এমন এক অর্থপূর্ণ, ক্ষুদ্রতম একক যা বারংবার ব্যবহৃত হ'তে পারে এবং যার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য নেই।

এইখানে লক্ষ্য করুন, রূপিম চিহ্নিত করার স্পষ্টত চারটি সূত্র এখানে আমরা পেতে পারি। যেমন—

(১) এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম একক হতে হবে।

(২) এই এককটির একটি অর্থ থাকতে হবে।

(৩) এই এককটি ভাষায় বারবার ব্যবহৃত হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

(৪) এই এককটির অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য এককের কোনো ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল থাকবে না।

উদাহরণ হিসাবে ধরুন 'ছেলেদের' শব্দটি। অর্থবোধের সহজাত ক্ষমতায় আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি শব্দটির দুটি অংশ—'ছেলে' এবং 'দের'। এই দুটি হল দুটি রূপিম। পূর্বোল্লিখিত শর্ত কীভাবে এখানে রক্ষিত হয়েছে দেখুন। 'ছেলে' এবং 'দের' দুটিই একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত। এই দুটিরই অর্থ আছে। যদি 'দের' রূপিমটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি না, কিন্তু এটি যে বহুত্ববোধক একটি অর্থ বহন করছে, তা আমরা মনে মনে ঠিকই বুঝতে পারি। 'ছেলে' রূপিমটি এককভাবে বা অন্যান্য বহু রূপিমের (প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ শব্দগুলি সবই এক একটি রূপিম) সঙ্গে যুক্তভাবে বারংবার ভাষায় পুনরাবৃত্ত হতে পারে। যেমন—ছেলেরা, ছেলের, ছেলেটি, ছেলেমানুষী ইত্যাদি। ঠিক তেমনভাবে 'দের' রূপিমটি এককভাবে ব্যবহৃত হবার যোগ্য না

হলেও অন্য রূপিমের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—আমাদের, বুড়োদের, যাদের ইত্যাদি অর্থাৎ লক্ষ্য করুন কিছু রূপিম একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিছু রূপিম তা পারে না। এইবার শেষ শর্তটির দিকে লক্ষ্য করুন। যদি বলি 'আহ্লাদের কথা' তবে 'আহ্লাদের' শব্দটিতে 'দের' রূপিমটির ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বহুবচনাত্মক 'দের' এটি নয়। 'আহ্লাদ' শব্দটির সঙ্গে সম্বন্ধবাচক 'এর' বিভক্তি যোগ করে এটি দাঁড়িয়েছে 'আহ্লাদের'। আরও দেখুন—এই শব্দটিকে যদি আহ্লা' এবং 'দের' এইভাবে ভেঙে দিই, তাহলে কোনো খণ্ডাংশেরই কোনো অর্থ বজায় থাকে না, অথচ রূপিম হতে গেলে অর্থগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে ঐ খণ্ডাংশগুলি কোনোটিই রূপিম হবার যোগ্যতা রাখে না।

মোটের উপর, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যদি পূর্বোল্লিখিত চারটি শর্তই পূরণ করে, তবেই তাকে রূপিম বলা যাবে। অন্যথায় তাকে রূপিম বলতে পারব না। কখনও একটিমাত্র রূপিম একটি শব্দ গঠনে সক্ষম, যেমন—আম ; মাতৃ ইত্যাদি। আবার কখনও একাধিক রূপিম একটি শব্দ গঠনে প্রয়োজন। যেমন—আমসত্ত্ব ('আম' এবং 'সত্ত্ব' দুটি আলাদা রূপিম) বা মাতৃচরণ (মাতৃ' এবং 'চরণ' দুটি আলাদা রূপিম)।

৩১.৩.২ রূপিম, শব্দ ও অক্ষর

রূপিম বা রূপমূল বা মূলরূপ কাকে বলে আমরা দেখলাম। অবধারিত ভাবেই শব্দ (word) বা অক্ষরের (Syllable) সঙ্গে তার পার্থক্য কী সেই প্রসঙ্গ এসে যায়। পূর্বের উদাহরণগুলিতে আমরা দেখেছি এক বা একাধিক রূপিম একটি শব্দ গঠনে সক্ষম। রূপিমেরও নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ আছে, শব্দেরও তাই। রূপিমের গঠনগত একক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি, শব্দের গঠনগত এককও তাই। তাহলে একটি শব্দ বা রূপিমের পার্থক্য কোথায় ?

এই প্রসঙ্গে মনে করুন রূপিমের চারটি শর্তের কথা, রূপিমে ঐ চারটি শর্তই একযোগে পূরণ হওয়া প্রয়োজন। 'শব্দ' (word) হ'তে হ'লে কিন্তু এই শর্তাবলী পূরণের বাধ্যবাধকতা নেই। লক্ষ্য করুন, 'শব্দ' (word) হ'তে গেলে এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয় এবং অর্থপূর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক শর্ত। কিন্তু তা ক্ষুদ্রতম একক নাও হ'তে পারে। যেমন—'মানুষকে' শব্দটি 'মানুষ' ও 'কে' এই দুই রূপিমের সমন্বয়ে গঠিত। এর 'মানুষ' অংশটি একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু 'কে' একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। 'কে' অংশটি তবে শব্দ পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। কারণ সমস্ত শব্দই একা ব্যবহৃত হবার ক্ষমতা রাখে। তাই 'মানুষ' অংশটি শব্দ ও রূপিম—যুগপৎ এই দুই ভূমিকা নিতে পারলেও 'কে' তা পারে না, তাই 'মানুষ' একটি শব্দ, 'কে' একটি রূপিম, অর্থাৎ সংক্ষেপে শব্দ ও রূপিমের সূক্ষ্ম পার্থক্যরেখাটি চিহ্নিত হতে পারে এইভাবে—সব শব্দই একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, সেইসব রূপিম শব্দ মর্যাদাভুক্ত বলে গৃহীত হতে পারে (যেমন—মানুষ, মাতৃ, আম)। কিন্তু যে রূপিমগুলিকে এককভাবে ব্যবহার করা যায় না (যেমন—কে, দের, সত্ত্ব) সেগুলি শব্দ হিসাবে গৃহীত হবার যোগ্য নয়।

এইবারে আসুন অক্ষর ও রূপিমের তুলনায়। রূপিম যদিও ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ, কিন্তু তা অক্ষর নয়। কারণ অক্ষর অর্থবহ হবার কোনো দায়ই কখনও পালন করে না। অথচ রূপিমকে অর্থানুষঙ্গ ছাড়া অস্তিত্ব বজায়

রাখতে কখনই দেখা যায় না। যেমন ধরুন 'আমের' শব্দটিকে অক্ষর (syllable) অনুযায়ী ভাগ করলে আ + মের এইরকম একটি চেহারা পাওয়া যায়। এখানে 'আ' একটি অক্ষর, 'মের' একটি অক্ষর। এই দুটি অক্ষরই কিন্তু অর্থহীন, যদিও এদের সম্মিলিত 'আমের' কথাটির অর্থ আছে। আবার এই শব্দটিকে যদি রূপিম অনুযায়ী ভাগ করি তাহলে দাঁড়ায় আম এর। এখানে 'আম' এবং 'এর' দুটিরই অর্থ বজায় আছে। অবশ্য কখনই কোনো অক্ষরের অর্থ থাকে না, এমন ব্যাপার নয়। কখনও কখনও কোনো অক্ষরের অর্থ থাকতেই পারে। যেমন—'মূলরূপ' শব্দটিকে অক্ষর অনুযায়ী ভাগ করলে 'মূল' ও 'রূপ' এই দুই অক্ষর পাই, যাদের নিজস্ব অর্থ আছে। এই দুই ভাগ আবার এই শব্দটির দুটি রূপিমও বটে। তাহলে এবার দেখুন—যে অক্ষরের একটি নিজস্ব অর্থ থাকে, তা অবশ্যই রূপিমের মর্যাদাসম্পন্ন অর্থাৎ তা একাধারে অক্ষর ও রূপিম। কিন্তু যে অক্ষরের কোনো অর্থ নেই, তা শুধু অক্ষর, তা কখনই রূপিম হবার যোগ্য নয়।

আসলে, অক্ষর হ'ল এমন এক ধ্বনিগুচ্ছ, যা উচ্চারণপ্রয়াসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত হ'তে পারে। আরও একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়—প্রতিটি অক্ষরে একটিমাত্র স্বরধ্বনি থাকে। কিন্তু রূপিম ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ হলেও সর্বদা তা এমন ক্ষুদ্রতম নয় যে উচ্চারণের প্রয়াসের এক ধাক্কাতেই তা উচ্চারিত হবে। সর্বোপরি রূপিমে একটিমাত্র স্বরধ্বনি থাকবে—এমন নির্দিষ্টতাও নেই। তাই রূপিম কখনও অক্ষরের মতো ক্ষুদ্রতম হতেও পারে, কখনও নাও হ'তে পারে। আসল কথা যেটি, সেটি হ'ল—অক্ষর ও রূপিমের ভেদরেখাটি মূলত অর্থনির্ভর।

এইবার যদি সামগ্রিকভাবে শব্দ, রূপিম ও অক্ষরের পারস্পরিক তুলনার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে সংক্ষেপে আমরা বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে পারি এইভাবে—শব্দের রূপিম নির্ণয়ে ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এককের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এগোতে গিয়ে যখন দেখা যাবে যে আরও ক্ষুদ্র একক নির্ণয় করলে তার কোনো অর্থ হয় না, তখন সেইখানে থেমে যেতে হয়। অর্থাৎ শব্দের শেষ ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক হল রূপিম। একটি রূপিম যে সর্বদাই এক অক্ষরবিশিষ্ট হবে—এমন নয়। একটি শব্দে এই বিষয়টিকে কীভাবে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, তা দেখুন—'দুল্‌কিচাল' শব্দটি—'দুলকি', 'চাল' এই দুই রূপিমে গঠিত। 'দুল্‌কি' রূপিমটি 'দুল্‌' ও 'কি' এই দুই অক্ষরে গঠিত। 'চাল' রূপিমটির এই একটিই অক্ষর। আবার কখনও এমনও হ'তে পারে যে একটি শব্দ একটিমাত্র রূপিম এবং ওই একটিমাত্র অক্ষর দারাই গঠিত। যেমন-'মা'। এখানে শব্দ, রূপিম এবং অক্ষর সমাপর্তিত হয়েছে।

৩১.৩.৩ রূপিম সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া

এইবার আসুন, কীভাবে রূপিমকে চিনে নেওয়া যায় তার প্রক্রিয়াটিকে বুঝবার চেষ্টা করি। যেকোনো ভাষার ক্ষেত্রেই ভাষাতাত্ত্বিকগণ রূপিম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটি করেন তা হ'ল কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর নমুনাসংগ্রহ করা। এইবার দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁদের কাজ থাকে—এই নমুনাগুলির থেকে ধ্বনিগত সদৃশ শব্দগুলিকে একত্রে গুচ্ছবদ্ধ করা। তৃতীয় পর্বে তাঁরা খুঁজে বার করেন এই তুলনীয় শব্দগুলির সদৃশ অংশ কতটুকু। শেষপর্বে যেটি তাঁদের লক্ষণীয় বিষয় তা হ'ল—তুলনীয় শব্দগুলির সদৃশ অংশগুলি একই সঙ্গে ধ্বনিগত ও অর্থগতভাবে সদৃশ কিনা। অর্থাৎ একযোগে ধ্বনি ও অর্থগত মিল যদি দেখা যায় কোনো অংশে, তবে সেই অংশটুকু একটি

দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি লক্ষ করি। ধরুন 'কাছে' এবং 'ঘরে শব্দ দুটির পারস্পরিক তুলনায় (কাছ্ + এ, ঘর + এ) দেখা গেল উভয়ের সদৃশ অংশ একমাত্র 'এ'। ধ্বনিগত দিক থেকে তো বটেই, অর্থগত দিক থেকেই (অইধকরণে কোনো স্থান বোঝাতে) এটি একই। সুতরাং এক্ষেত্রে 'এ' একটি রূপিম হতে পারে।

কিন্তু যদি একাধিক রূপের মধ্যে শুধুমাত্র ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে, অর্থগত সাদৃশ্য আদৌ না থাকে, তবে সেগুলি একই রূপিম হতে পারে না। যেমন ধরুন 'দুহিতা' ও 'লতা' শব্দের 'তা' অংশটিতে ধ্বনিগত সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এদের তাৎপর্য দুটি শব্দে দুরকম। সেক্ষেত্রে এই দুটি 'তা' কখনই একই রূপিম বলে গণ্য হতে পারে না।

আবার এই প্রক্রিয়ায় বিপরীত ব্যাপারাটিও লক্ষ করুন। কখনও কখনও একাধিকবার রূপের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য না থাকলেও অর্থবোধের দিক থেকে মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধরুন—আচার্যা, অধ্যাপিকা, নদী ইন্দ্রানী। এই শব্দগুলিতে স্ত্রীলিঙ্গাবাচক কিছু প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, যথা—-আ, -ইকা, -ঈ, -আনী। এদের ধ্বনিগত সাদৃশ্য নেই, কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য আছে, কারণ এরা একই অর্থ বহন করছে—স্ত্রীবাচক অর্থ। এইরকম ক্ষেত্রে এগুলি একই রূপিম হিসাবে গণ্য হয়। তবে এইসঙ্গে অতি অবশ্যই মনে রাখবেন—এইরকম ধ্বনিগতভাবে বিসদৃশ অথচ অর্থগতভাবে সদৃশ অংশগুলিকে পরিপূরক অবস্থানে (Complementary Distribution) থাকতে হবে, অর্থাৎ একটি অন্যটির স্থানে পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন এখানে ইন্দ্র + আনী-রই বদনে ইন্দ্র + ইকা হতে পারবে না।

৩১.৩.৪ উপরূপ ও সমধ্বনিরূপ

রূপিম নির্ণয় বা চিহ্নিত করার সূত্রেই অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে যায় উপরূপ বা সমধ্বনি রূপের প্রসঙ্গ। কখনও কখনও দেখবেন—কিছু রূপিম অর্থগত দিক থেকে সদৃশ, ধ্বনিগত দিক থেকে পুরোপুরি সদৃশ নয়। এরকম ক্ষেত্রে তাদের পার্থক্য ব্যাখ্যযোগে সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হতে পারে। কিছু শব্দ ধরে বিষয়টিকে লক্ষ্য করা যাক। ধরুন—সংবাদ, সম্ভব, সন্তাপ, সঞ্চয়, সঙ্কোচ শব্দগুলির কথা, এগুলির প্রতিটির আদিতে 'সম্' উপসর্গটি আছে, যেটি শব্দগুলিতে যথাক্রমে 'সং', 'সম্-', 'সন্-' 'সঞ্-' 'সঙ্' রূপে ধরা দিয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এই 'সং', 'সম', 'সন্' 'সঞ্' এহং 'সঙ্' একই রূপিম হতে পারে কি না। সেক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত হবে—এগুলি একই রূপিম 'সম্' এর রূপান্তর। পরবর্তী বিভিন্ন ধ্বনির প্রতিবেশ, এদের ওই পরবর্তী ধ্বনির কাছাকাছি উচ্চারণে নিয়ে এসেছে। যেমন—

'সম্ভব'-এ ওষ্ঠ্যধ্বনি 'ভ' এর প্রভাবে ওষ্ঠ্য 'ম'-তে,

'সন্তাপ'-এ দন্ত্যধ্বনি 'ত' এর প্রভাবে দন্ত্য 'ন'-তে,

'সঞ্চয়'-এ তালব্য 'চ' এর প্রভাবে তালব্য 'ঞ'-তে

'সঙ্কোচ'-এ কণ্ঠ্যধ্বনি 'ক' এর প্রভাবে কন্ট্যধ্বনি 'ঙ'-তে,

রূপান্তরিত হয়েছে 'সম্'-এর 'ম' ধ্বনিটি। সুতারং এই শব্দগুলিতে 'সম' রূপটির যে ধ্বনিগত পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তা ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যাযোগ্য এবং তা বাহ্যপার্থক্য। অর্থগত কোনো পার্থক্য এখানে নেই। এই

অবস্থায় 'সম্'-টি রূপিম আর তার প্রাতিবেশিক রূপান্তর 'সং', 'সন্-' 'সঞ্'- বা 'সঙ্-' কে বলা হবে 'সম্-' রূপিমের উপরূপ বা সহরূপমূল (Allomorph)।

বাংলায় এরকম আরও কিছু উপরূপের দৃষ্টান্ত দেখতে পারবেন। -টা (একটা), -টি (চারটি), -টে (তিনটে), টো (দুটো) এইভাবেই সহরূপমূলের ভূমিকা পালন করে। কিংবা বহুবচনাত্মক 'গুলি', 'গুলো', 'গুলা' ইত্যাদিও উপরূপের দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

শুধুমাত্র প্রত্যয় বা বিভক্তির ক্ষেত্রেই নয়, ধাতুর ক্ষেত্রেও উপরূপের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। যেমন—বাংলায় 'গি' ও 'যা' ধাতু দুটি উপরূপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। 'গি' শুধু অতীতকালে (গেল, গিয়েছিল) এবং 'ইয়া' ও 'ইলে' অসমাপিকা বিভক্তি যোগে (গিয়া, গেলে) ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র কখনও নয়। অন্যত্র সবসময়ই 'যা' ব্যবহৃত হয় (যাই, যাবে, যাওয়া)। 'কর্' ধাতুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় 'কোর্'রূপে তার একটি বিভক্তিযুক্ত উপরূপ আছে, যেমন—

আমি করি (= কোরি)—তুমি করো
তুই করিস (= কোরিস)—তুই কর্
তুমি কোরো না—সে করে না

এক্ষেত্রে 'কর্' ও 'কোর্' দুটি সহরূপমূল।

মোটের ওপর এককথায় আমরা বলতে পারি উপকূপগুলির অর্থগত সাদৃশ্য থাকলেও ধ্বনিগত পার্থক্য যেটুকু থাকে সেটি একান্তভাবে অন্যধ্বনির প্রভাবজাত।

এইবারে আসুন 'সমধ্বনি রূপ'-এর বিষয়টিকে আমরা লক্ষ্য করি। যদি কখনও এমন হয় যে দুটি রূপিম-এ অর্থগত সাদৃশ্য কিছু নেই শুধুমাত্র ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে তবে সেই রূপিমগুলিকে 'সমধ্বনি রূপ' (Homophonous morpheme) বলা হয়। যেমন—আমরা যখন বলি 'সে বই পড়ে' কিংবা 'গাছ থেকে পাতা পড়ে' তখন এই দুই বাক্যে 'পড়্' ধাতুর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে ঠিকই, কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য যে কিছু নেই তা নতুন করে বলে দেবার দরকার নেই। সুতরাং এই দুই 'পড়' ধাতু শুনতে এক হলেও অর্থবৈষম্যের কারণে একই রূপিম হ'তে পারে না। এক্ষেত্রে এই দুই 'পড়' ধাতু সমধ্বনি রূপ হিসাবে বিবেচিত হবে।

আবার দেখুন 'তোমায়' ও 'খায়' শব্দ দুটিতে 'য়' রূপমূল বর্তমান। কিন্তু অর্থের দিক থেকে 'তোমায়' শব্দে কার্মকারকের বোধ এবং 'খায়' শব্দে প্রথম পুরুষে বর্তমানকালের বোঝ জন্মাচ্ছে। সুতরাং এখান 'য়' দুটি পৃথক রূপমূল এবং সমধ্বনিযুক্ত রূপিম বলা যায়।

৩১.৪ সারাংশ

আসুন, এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম সেগুলির প্রতি আরেকবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই। সূত্রাকারে বিষয়গুলিকে এইভাবে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে—

রূপিম হল ভাষার ন্যূনতম অর্থপূর্ণ একক। ধ্বনি বা অক্ষরের সঙ্গে তার পার্থক্য নিহিত রয়েছে মূলত এই অর্থপূর্ণতার মধ্যে।

রূপিম এককভাবে বা পরস্পর যুক্তভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হয়। যে রূপিমগুলি এককভাবে প্রযুক্ত হতে সক্ষম, সেগুলি শব্দ হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

কিছু রূপিম ধ্বনিগত দিক থেকে সদৃশ না হলেও অর্থগত দিক থেকে সদৃশ। এরা যদি পরিপূরক অবস্থানে থাকে, তবে এগুলি উপরূপ বা সহরূপমূল হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

আবার অন্যদিকে কিছু রূপিম ধ্বনিগত দিক থেকে সদৃশ হলেও অর্থগত কোনো মিলই তাদের মধ্যে থাকে না। এগুলিকে আমরা সমধ্বনি রূপ নামে অভিহিগত করতে পারি।

এক একটি রূপিমের কখনও একাধিক উপরূপ থাকে। আবার কোনো রূপিমের একটিই রূপ থাকে, কোনো উপরূপ থাকে না।

৩১.৫ রূপিমের শ্রেণিভেদ

রূপিম বা রূপমূল তার ব্যবহারযোগ্যতার উপর নির্ভর করে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে পারে, যেগুলিকে মুক্ত রূপমূল (Free morpheme) এবং বন্ধ রূপমূল (Bound morpheme) নামে চিহ্নিত করা হয়। আসুন, এবার আমরা দেখি, কোন বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

মুক্ত রূপমূল—যে সমস্ত রূপমূলের স্বাধীন ও একক ব্যবহারযোগ্যতা আছে অর্থাৎ যে সমস্ত রূপমূল বা রূপিমকে অন্য কোনো রূপিমের সাথে যুক্ত না করেই বাক্যে ব্যবহার করা যায়, তেমন রূপিমকে মুক্ত রূপিম বা মুক্ত রূপমূল বলা হয়। যেমন, একটি বাক্য ধরুন—রাম বনে ফুল পাড়ে। এখানে শব্দগুলিকে রূপতত্ত্ব অনুযায়ী ভাগ করলে পাই—রাম = রম্ + ঘঞ, বনে = বন্ + এ, ফুল, পাড়ে = পাড়্ + এ। এবার দেখুন 'রম্' বা 'ঘঞ' এককভাবে বাক্যে প্রয়োগ করার কোনো দৃষ্টান্ত আমাদের ভাষাবোধে নেই। কিন্তু আমরা 'বন' 'ফুল' ও 'পাড়্' রূপিমগুলির স্বাধীন ও একক প্রয়োগে অভ্যস্ত। তাই শেষোক্ত এই তিনটিকেই মুক্ত রূপিম বা রূপমূল বলতে পারি।

অন্যদিকে 'রম্' বা 'ঘঞ', এর মতই 'বনে'র 'এ' রূপিমটি এবং 'পাড়ের' 'এ' রূপিমটিও এককভাবে প্রযুক্ত হবার পক্ষে অনুপযুক্ত। অথচ সেইসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করুন—দুটি 'এ'-ই বিশেষ দুটি অর্থ বহন করছে, 'বনে'র ক্ষেত্রে অধিকরণ বোঝাতে, 'পাড়ে'র ক্ষেত্রে প্রথমপুরুষে ক্রিয়ার সাধারণ বর্তমান কাল বোঝাতে। এই জাতীয় রূপমূলকে বন্ধ রূপমূল বা রূপিম বলা যায়।

অর্থাৎ বন্ধ রূপমূলের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে আমরা বলতে পারি—যে সকল রূপিমের অর্থময়তা আছে, অথচ স্বাধীন বা এককভাবে ব্যবহারযোগ্যতা নেই, অন্য কোনো রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হ'লে তবেই তার অর্থগত তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়, তাকে বলা হয় বন্ধ রূপমূল বা রূপিম।

বন্ধ রূপমূল হিসাবে আমরা যাবতীয় আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গ (Prefix), বিকরণ ও মধ্যপ্রত্যয়/মধ্যসর্গ—(Infix) এবং অন্ত্যপ্রত্যয়, বিভক্তি/পরসর্গ (Suffix) গুলিকে চিহ্নিত করতে পারি। এছাড়া নামপদ ও ক্রিয়াপদেরও মূল যে ধাতু অংশ, সেগুলিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধরূপমূল হিসাবে দেখা দেয়। যেমন আমাদের পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত 'রাম' নামপদের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটতে দেখছেন। 'রম্' ধাতুটি এককভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একেবারেই অচল।

এইবারে দেখুন, ধাতুর সঙ্গে এই উপসর্গ, মধ্যসর্গ বা অনুসর্গ যোগে কীভাবে রূপিম থেকে শব্দ তৈরি হয়। শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ করা হয় তাকে বলে উপসর্গ। বিভিন্ন উপসর্গ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ করে। যেমন—অবেলা, আ-গাছা, অনা-বৃষ্টি, কু-কাজ, সু-চারু, প্র-হার ইত্যাদি।

এইভাবেই শব্দ বা ধাতুর অন্তে যা কিছু যোগ করা হয় তাকে বলে পরসর্গ। আমরা আগেই দেখেছি বিভিন্ন প্রত্যয়, বিভক্তি এবং অনুসর্গগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। অর্থনিরূপণের ক্ষেত্রে এগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন—

ডাকাত + ই = ডাকাতি

ঢাকা + ই = ঢাকাই

গোঁড়া + আমি = গোঁড়ামি

বখা + টে = বখাটে

ন্যাকা + পনা = ন্যাকাপনা

কর্ + আ = করা

যা + ইতেছে = যাইতেছে > যাচ্ছে

বল্ + ইব = বলিব > বলব

ছেলে + দের = ছেলেদের

মেয়ে + টা/টি = মেয়েটা/মেয়েটি

আমাদের ভাষায় মধ্যসর্গ ব্যবহারের নজির বিরল। প্রত্যয় যোগের আগে ধাতুর সঙ্গে অনেকসময় যে ধ্বনি বা রূপিমটি যোগ করে নেওয়া হয়, তাকে বিকরণ বলা হয়। এগুলিই মধ্যসর্গ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যেমন—

ভাঙ্ + ছি = ভাঙছি, আবার

ভাঙ্ + আ (বিকিরণ) + ছি = ভাঙাচ্ছি

এইভাবে মুক্ত এবং বন্ধ রূপিমের নানাবিধ সংযোগ সম্মিলনে শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থগত নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে শব্দ সৃষ্টিতে রূপিমের বৈচিত্র্যসৃষ্টি করার ক্ষমতা একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়।

৩১.৬ অনুশীলনী

১. নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের পারস্পরিক তুলনায় উভয়ের পার্থক্য চিহ্নিত করুন ঃ

রূপিম/রূপমূল এবং শব্দ,

অক্ষর এবং রূপিম

উপরূপ এবং সমধ্বনিরূপ।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের রূপিমগুলিকে চিহ্নিত করুন ঃ

নাবালক, নিখুঁত, ভাসমান, ঘুমন্ত, ফুলগুলি, সংহার, সুখবর, লাঠিগাছা।

৩। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন ঃ

(ক) রূপিম/রূপমূল/মূলরূপের সংজ্ঞার্থ।

(খ) রূপিম সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া।

(গ) রূপিমের শ্রেণিভেদ এবং শব্দগঠনে তাদের ভূমিকা।

৩১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ভাষাবিদ্যা পরিচয়।

একক ৩২ ❐ শব্দার্থতত্ত্ব

গঠন

৩২.১ উদ্দেশ্য

৩২.২ প্রস্তাবনা

৩২.৩ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

৩২.৪ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-অর্থের নানারূপ

৩২.৫ ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্বের স্থান

৩২.৬ শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

৩২.৭ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

৩২.৮ সুভাষণরীতি

৩২.৯ শব্দার্থ ও ইতিহাস উপাদান

৩২.১০ সারাংশ

৩২.১১ অনুশীলনী

৩২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৩২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- শব্দ ও তার অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- শব্দের ব্যাবহারিক বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে কীভাবে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভাষাচর্চায় শব্দার্থতত্ত্বের গুরুত্ব কোথায় এবং কতটা তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- শব্দার্থ পরিবর্তনের সহায়ক কারণগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শব্দের অর্থান্তর ঘটবার নানা প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা বাগধারায় অর্থপরিবর্তনের বিচিত্র পদ্ধতি হিসাবে 'সুভাষণ' রীতিটিকে চিনে নিতে পারবেন।
- ভাষায় ঐতিহাসিক তথ্যসংরক্ষণে শব্দার্থের ভূমিকা কতখানি তা জানতে পারবেন।

৩২.২ প্রস্তাবনা

যে কোনো ভাষারই দুটি প্রধান দিক হল : তার বাইরের প্রকাশকূপ, যেটি প্রকৃতপক্ষে ভাষার গঠনগত দিক, আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে যেটি তার ধ্বনিনির্ভর দিক। আর ভাষার অন্য প্রধান দিকটি হল তার ভিতরের ভাব বা অর্থ, যেটি প্রকৃতপক্ষে ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের নানা মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি তার ভিতরের অর্থেরও নানা পরিবর্তন হয়। কোনো শব্দের সঙ্গে এই পরিবর্তনশীল অর্থের সম্পর্কে কতখানি নিকট সেই বিষয়টি এবার আমরা দেখব।

৩২.৩ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

শব্দ কোনো বস্তু বা ভাব সম্পর্কে আমাদের চেনাকে নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট করে। কোনা শব্দকে তার ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে, কোন্ অর্থ বোঝাবার জন্য তার উৎপত্তি তা বুঝতে পারা যায়। কখনও কখনও দেখা যায় একটি শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম। যেমন—'রাগ' শব্দটি ক্রোধ অর্থে, প্রণয় অর্থে বা গানের নির্দিষ্ট স্বরসমন্বয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়াও লক্ষ্যণীয়। একটি বস্তু বা একটি ভাব একাধিক শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। যেমন নদী বোঝাতে তটিনী, স্রোতস্বিনী, গাঙ নানাধরেনর শব্দ প্রযুক্ত হয়। এর থেকে একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গী কোনো ব্যাপার নয়। শব্দ সময়ে সময়ে পোশাক বদলের মত অর্থানুষঙ্গ বদল করে। আসলে সভ্যতার বিবর্তনের অমোঘ নিয়মে ভাষার ধ্বনিগত গঠনের দিকটি যেমন প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে, সেই একই অনিবার্য কারণে অর্থের সঙ্গে শব্দের সম্পর্কসূত্রও শিথিল হয়ে উঠেছে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সীমান প্রসারিত হয়েছে, তার পরিচিত বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, যার ফলে অনেক সময়ই একটি শব্দ বা শব্দমূল একাধিক বস্তু বা ভাবের বোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে—যার প্রত্যক্ষ ফল—শব্দ ও তার অর্থের নির্দিষ্ট সম্পর্ক বন্ধন থেকে মুক্তি। শব্দের অর্থ পরিবর্তনও এরই ফলশ্রুতি। মোটের উপর আমরা বলতে পারি অর্থ শব্দের এমন এক শক্তি যা পরিবর্তনশীল। সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে, সভ্যমানুষ মনের ভাব প্রকাশ করতে চেয়ে, শব্দের এই বিশেষ শক্তিকে নানাভাবে রূপান্তরিত করেছে।

৩২.৪ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-অর্থের নানারূপ

অর্থকে শব্দের একটি বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতা হিসাবে আমরা চিহ্নিত করলাম। সেইসঙ্গে এও দেখলাম যে এই শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে। শব্দের অর্থশক্তির নানারূপ বৈচিত্র্যকেই অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা—এই তিনটি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই তিনটি শক্তির মধ্যেই শব্দার্থের মূল রহস্য ধরা আছে। শব্দশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্রে এই তিনটি অর্থরূপ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এই সকল শাস্ত্রে যেভাবে এই তিনটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে এই প্রকার—অভিধা দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের এবং লক্ষণা দ্বারা গৌণার্থের বোধ জন্মায়। আর এই দুই শক্তি যে তাৎপর্যার্থ জ্ঞাপন করতে পারেন না, সেই ব্যঙ্গার্থের বোধ জন্মায় ব্যঞ্জনশক্তি।

উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক। ধরুন আমরা যখন বলি 'রিকসা' বা 'ট্যাকসি' তখন ওই বিশেষ যান দুটি সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট যে ধারণা তার দ্বারা অর্থবোধ ঘটে। এটি ওই শব্দদুটির অভিধা শক্তির দ্বারা ঘটেছে—আমরা এইভাবে বিষয়টি দেখতে পারি। আবার দেখুন ; পথচলতি অবস্থায় যখন এই যানগুলির প্রয়োজনে আমরা রিকসাচালক বা ট্যাকসিটালককে ডাকি, তখনও ডাক দিই শুধু মাত্র 'রকসা' বা এই 'রিকসা' কিংবা 'ট্যাকসি' বলে। বলাবাহুল্য নিষ্প্রাণ যানদুটি আমাদের লক্ষ্যবস্তু নয়, আমাদের লক্ষ্য তাদের চালক। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু 'ট্যাকসি' বা 'রিকসা' বলে ডাক দিলেও চালকরা বোঝেন যে তাঁদেরই ডাকা হচ্ছে। অর্থবোধের এই বিশিষ্টতা শব্দের লক্ষণাশক্তির প্রকাশ। প্রথম উদাহরণে অভিধা হিসাবে আমরা শব্দের মুখ্যার্থকে প্রধান হতে দেখছি। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে শব্দের গৌণার্থই লক্ষণা হিসাবে প্রধান হয়ে উঠেছে।

এইবার অর্থের তৃতীয় রূপভেদটিতে আসুন। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী হিসাবে আমরা সবাই 'গাছ' এবং 'পাথর' শব্দদুটির অর্থ জানি। কিন্তু কথায় আমরা যখন 'গাছপাথর' শব্দটি প্রয়োগ করি (বয়সের গাছপাথর নেই) তখন উদ্ভিদ বা প্রস্তর—কোনোটিই অর্থে বজায় থাকে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অর্থ—অতিবৃদ্ধ, এমনই একটি অর্থবোধ ঘটে। তাৎপর্যগত অর্থ প্রকাশের এই বিশেষ ক্ষমতাকেই 'ব্যঞ্জনা' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এইভাবে ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দের অর্থগত ত্রিশক্তি লক্ষ করা যায়। ভাষাব্যবহারকারী মানুষ শব্দের কোন্ শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে, কোন্ অর্থটিকে বজায় রাখবেন, তা নির্ভর করে দেশকালানুযায়ী ভাষার ঔচিত্যবোধের উপর এবং ওই ব্যক্তির প্রকাশ ক্ষমতার উপর। মাতৃভাষায় আমাদের যে সহজাত অধিকার, তার উৎস আমাদের প্রতি মুহূর্তের শ্রবণ জাত অভিজ্ঞতা। এর থেকেই শব্দ ও তার অর্থ সম্পর্কে বোধের জন্ম এবং ব্যবহারিক সক্ষমতার জন্ম।

৩২.৫ ভাষা বিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্বের স্থান

শব্দার্থতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্পর্কবিচার, অর্থপরিবর্তনের কারণ ও পরিবর্তিত অর্থের নানা শ্রেণিভেদ সম্পর্কে ভাষাতত্ত্বের যে দিকটি গড়ে উঠেছে সেটিকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার আওতায় আনতে প্রথমদিকে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীই নারাজ ছিলেন। তাঁদের মতে—অর্থপরিবর্তন আসলে মানুষের মনের খেলর ফলশ্রুতি এবং যেহেতু এই মনকে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা যায় না, তাই শব্দ ও অর্থের বিষয়টি ভাষাবিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative) ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ যেহেতু ভাষার শব্দাবলীর দ্বারা বাক্য গঠনের আভ্যন্তরীণ নির্মাণের প্রক্রিয়াটির (deep structure) সঙ্গে অর্থ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এর থেকে একটি জিনিস আমাদের কাছে স্পষ্ট—তা হ'ল শব্দার্থই যে কোনো ভাষার প্রাণ। এই ভাব বা অর্থ বাদে ভাষার কোনো উপযোগিতাই থাকে না। তাই শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

৩২.৬ শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

আমরা আগেই দেখেছি যে কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার অনেকটাই ঐ ভাষা ব্যবহারকারীর ইচ্ছানুগ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বিবর্তন অনুযায়ী মানুষের মনের গঠন ও অভিজ্ঞতার তারতম্য ঘটে। তারই ফলে

মানুষ যখন ভাষা ব্যবহার করে, তার নিজের সেই আভ্যন্তরীণ বদল ভাষার বাইরের কাঠামোটিকে যেমন বদলে দেয়, তেমনি তার ভিতেরর অর্থটিকেও পরিবর্তিত হতে বাধ্য করে। ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনেরও নানা কারণ আছে তেমনি অর্থ পরিবর্তনেরও নানা কারণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই কারণগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বেশি যে তাদের সবগুলিকেই একটিমাত্র আলোচনায় সীমিত করা কষ্টাসাধ্য। তবে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর পর্যালোচনা অনুযায়ী এই কারণগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় : (১) স্থূলকারণ এবং (২) সূক্ষ্ম কারণ। এই দুই ক্ষেত্রেই আবার নানা উপশ্রেণিতে বিভাজিত হবার মতো কারণসমূহও লক্ষ করা যায়।

অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণ ঃ

দেশ-কাল, অনুযায়ী, ভাষায় শব্দ ব্যবহারকারী মানুষের অভিজ্ঞতার তারতম্যে শব্দের যে অর্থান্তর ঘটে, সেগুলিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এবিষয়ে প্রভাবসৃষ্টিকারী কারণগুলিকে আমরা তিনটি সূত্রে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন—(১) ভৌগোলিক বা ভিন্ন পারিবেশিক কারণ, (২) ঐতিহাসিক কারণ এবং (৩) উপকরণগত কারণ। আসুন, প্রথমে এই তিনটি কারণে কীভাবে শব্দ তার অর্থ বদলে নেয়, বাংলা ভাষার শব্দ অনুযায়ী আমরা তা লক্ষ করি।

(১) ভৌগোলিক বা ভিন্ন পারিবেশিক কারণ ঃ

একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরুন ফার্সিতে প্রচলিত 'মুর্গ', শব্দটির অর্থ যে কোনো পাখি। কিন্তু আগন্তুক শব্দ হিসাবে বাংলাভাষায় প্রবেশ করে এর প্রয়োগ বিশেষ একটিমাত্র পাখি—মোরগ বা মুরগি (এক কথায় তৎসম 'কুক্কুট' অর্থে) বোঝাতে সীমাবদ্ধ হয়েছে। একইরকমভাবে ফার্সী 'দরিয়া' শব্দটি মূলে 'নদী' বোঝালেও, বাংলায় এই শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'সমুদ্র'। অনুরূপ কারণেই লক্ষ করুন আরও কত শব্দে এজাতীয় অর্থন্তর লক্ষ করা যায়—বাংলায় 'শাক' বলতে ভোজ্য উদ্ভিদকে বোঝালেও, ভারতের হিন্দিভাষী অঞ্চলে 'শাক' নিরামিষ তরকারি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

(২) ঐতিহাসিক কারণ ঃ

জীবনযাত্রার পরিবর্তন অনেকসময়ই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে পিছনে সরিয়ে ভিন্নতর অর্থকে সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন ধরুন 'আর্য' শব্দটি। বুৎপত্তি (ঋ + ন্যৎ = আর্য) অনুযায়ী এই শব্দের অর্থ গমনধর্মী, বন থেকে বনান্তরে যাযাবরবৃত্তিধারী একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। পরে কৃষিনির্ভর, স্থিতিশীল জীবনযাত্রা গড়ে উঠলেও তাদের 'আর্য' নামটিই থেকে যায়, যার পরিবর্তিত অর্থ হয়ে ওঠে 'ইন্দো ইউরোপীয় বংশের নৃজাতি'। এরকম অর্থ পরিবর্তনের আরও একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখতে পারেন 'বিবাহ' 'পাণিগ্রহণ' ইত্যাদি শব্দগুলিকে। আদিমকালে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে বলপ্রয়োগে হরণ করা এবং বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল বলে এই বিশেষরূপে বহন কার অর্থে 'বিবাহ' এবং বলপ্রয়োগে গ্রহণ করা অর্থে 'পানিগ্রহণ' শব্দগুলি ব্যবহৃত হোত। বর্তমানে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বর্বর প্রথার অবসান ঘটলেও শব্দগুলি পরিবর্তিত অর্থ গ্রহণ করে ভাষায় টিঁকে রয়েছে। উল্লিখিত দুটি শব্দই এখন 'পরিণয়সূত্র' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(৩) উপকরণগত কারণ ঃ

যে উপকরণে কোনো বস্তু তৈরি হয়, সেই উপকরণের নাম বা ধর্ম অনুযায়ী অনেকসময় ওই বস্তুটির নামকরণ হয়, কিন্তু পরে সেই উপকরণটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও পুরনো নামটিই বজায় থাকে। যেমন ধরুন 'কলম' শব্দটির মূল অর্থ 'শর' বা 'খাগ' যা একসময় লেখনী হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখন শরের ব্যবহার অবলুপ্ত তো বটেই, উপরন্তু লেখনী নির্মাণে হেন বস্তু নেই যা ব্যবহৃত হয় না। অথচ সবকটি ক্ষেত্রেই 'কলম' শব্দটি ব্যবহার করতেই আমরা অভ্যস্ত।

লক্ষ করুন, পুরনো নামটির যোগ উপকরণটির সাথে। আর এই পুরনো নাম দিয়েই যখন নতুন জিনিসটিকে বোঝাচ্ছি, তখন তার সম্পর্ক আর ওই জিনিসটি কীসে তৈরি হয়েছে সেই উপকরণের সঙ্গে নয়, শুধুমাত্র জিনিসটির সঙ্গেই। এরকম অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আপনি আরও অনেক খুঁজে পাবেন। একসময় জল বা বালিভর্তি ঘড়ার সাহায্যে সময় নিরূপণ করা হত, তাই তার নাম ছিল 'ঘড়ি'। আধুনিক যান্ত্রিক সময়নির্ধারক যন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা একটি ব্যাপার হলেও তার নাম রয়ে গেছে 'ঘড়ি'। তুলো দিয়ে তৈরি হ'ত বলেই 'তুলি' বর্তমানে যা নাইলন তন্তু বা পশুলোম তৈরি হয়, কিন্তু তার 'তুলি' নামটি অপরিবর্তিত।

অর্থ পরিবর্তনের সূক্ষ্ম কারণ ঃ

এই জাতীয় কারণটি মূলত ভাষা ব্যবহারকারীর প্রকাশসামর্থ্য ও ঔচিত্যবোধের উপর নির্ভর করে অর্থ পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রেও অর্থ পরিবর্তনের স্থূল কারণের মতই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় লক্ষ করা যায়, যাদের আমরা শ্রেণিভুক্ত করতে পারে এইভাবে—(১) সাদৃশ্য, (২) বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, (৩) শব্দ প্রয়োগে অসর্তকতা ও অজ্ঞতা, (৪) অল্পায়াস প্রবণতা এবং (৫) আলংকারিক প্রয়োগ।

(১) সাদৃশ্য ঃ

ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন সাদৃশ্যের ভূমিকা অনেকখানি, শব্দার্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাই। যেহেতু দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে মাথাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ অবস্থিত, সেই কারণে এই অর্থসাজুয্যে শ্রেষ্ঠতা বা উচ্চতা বোঝাতে আমরা যথেচ্ছ 'মাথা' শব্দটিকে ব্যবহার করি। যেমন 'গাঁয়ের মাথা', 'গাছের মাথা', 'মাথায় রাখা', 'মোড়ের মাথা' ইত্যাদি। 'বড়' বা 'বৃহৎ' অর্থে 'রাম' শব্দটির ব্যবহার (রাম ছাগল, রামদা) বা অনুরূপভাবে 'রাজ' শব্দটির প্রয়োগও (রাজপথ, রাজহাঁস, রাজগাঁদা) এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। আকারের বিশালত্ব, রাজকীয়তা এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছে এই দুটি ক্ষেত্রেই।

(২) বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার ঃ

সাধারণ মানুষের ধারণা—অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এই সংস্কারের বশেই কোনো বিপজ্জনক বস্তু বা অশুভ বিষয়কে কোনো একটি শুভ বা শোভন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একে আপনি সুভাষণ বলে অভিহিত করতে পারেন। এই প্রবণতায় অনেক সময়ই দেখা যায়—নতুন নামটির নতুন অর্থে প্রয়োগ হতে হতে তার অর্থগত পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন, 'মৃত্যু' অর্থে 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' বা 'সাপ'

বোঝাতে 'লতা', বসন্ত রোগকে 'মায়ের দয়া' বা 'শীতলায় দয়া', কুসীদজীবি'কে 'মহাজন' বলা এই বিশ্বাস বা সংস্কারচ্ছন্ন অর্থবিবর্তনেরই ফলশ্রুতি।

(৩) শব্দ প্রয়োগে অসতর্কতা ও অজ্ঞতা ঃ

কোনো শব্দের মূল অর্থটি না জেনে, তাকে ভিন্ন, সম্পূর্ণ আলাদা কোনো অর্থে প্রয়োগ করলে, অনবধানজনিত অর্থান্তর ঘটার সম্ভাবনা সেখানে থাকে। যেমন ধরুন 'সোচ্চার' শব্দটি। আমরা আমাদের চারপাশে এই শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ করি 'জোরে বলা' বা 'ঘোষণা করা' অর্থে। অথচ দেখুন শব্দটির মূল অর্থ আদৌ এর সঙ্গে জড়িত নয়। কারণ মূল অর্থটি হ'ল 'সশব্দ বমন'। ঠিক তেমনি 'পাষণ্ড' শব্দের মূল অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যসী না বুঝিয়ে 'নিষ্ঠুর' অর্থে প্রয়োগ করা কিংবা অল্প বা ছোট বোঝায় এমন 'স্তোক' শব্দটিকে অজ্ঞাতবশত 'স্তোকবাক্য' হিসাবে ব্যবহার করা—আমাদের এই জাতীয় প্রবণতা থেকেই ভাষায় স্থায়ী হয়ে দেখা দেয়।

(৪) অল্পায়াস প্রবণতা ঃ

ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের বশে আমরা অনেকসময় কোনো একটি শব্দগুচ্ছের সবটুকু ব্যবহার না করে, তার অংশবিশেষ উচ্চারণ করেই কাজ চালিয়ে নিতে চেষ্টা করি। একে শব্দ-সংক্ষেপ বা শব্দের অঙ্গচ্ছেদ বলতে পারেন। যেমন—'দণ্ডবৎ প্রণাম' কালক্রমে 'দণ্ডবৎ'-মাত্র হয়েই প্রণামের প্রক্রিয়াটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। 'খবরের কাগজ' না বলে আমরা প্রায়শই শুধু 'কাগজ' বলে সংবাদপত্রের অর্থটিকে পরিস্ফুট করে তুলি। কিংবা 'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' আমাদের কাচে হয়ে ওঠে 'সন্ধ্যা দেওয়া'।

(৫) আলংকারিক প্রয়োগ ঃ

বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে, আলংকারিক বাচনভঙ্গি ব্যবহারের ফলে বহু শব্দেরই মূল অর্থ পিছনে সরে গিয়ে, বিচিত্র অর্থ প্রকাশ করতে দেখা যায়। যেমন—বাড়ি মাথায় করা, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, মামার বাড়ি (জেলখানা অর্থে), শ্রীঘর (ঐ একই অর্থে) বললে, আমরা ভুলেও মূল অর্থ খোঁজার চেষ্টা করি না। কারণ এই দৃষ্টান্তগুলির আলংকারিক অর্থই আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল। লক্ষ্য করুন, বিনয় বা নম্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাতেও আমরা প্রায়ই শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ করি। নিমন্ত্রিতকে "দুটি ডালভাত" খাবার জন্য অনুরোধ করি, নিজের বাড়িকে বলি 'গরীবের বাড়ি'।

এইভাবে লক্ষ করুন বক্তা বা ভাষাব্যবহারকারী ব্যক্তি কীভাবে তাঁর বিবক্ষা অনুযায়ী শব্দ ও অর্থের সম্পর্কটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যে দৃষ্টান্তগুলি আমরা ইতপূর্বে দেখলাম, নজর করুন তাতে দুটি ধরনের পরিবর্তনসূত্র লক্ষ করা যায়। প্রতমত শব্দ যেখানে নিজেদকে অপরিবর্তিত রেখে অর্থকে বদলে নিচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ('কলম', 'আর্য বা 'দরিযা' জাতীয় শব্দ) দ্বিতীয়ত অর্থ তার প্রাধান্য বিস্তার করে, তার পরিচ্ছদস্বরূপ শব্দটিকে বদলে নিচ্ছে (মাথা, গঙ্গাপ্রাপ্তি, পাষণ্ড, কাগজ, শ্রীঘর ইত্যাদি শব্দের মতো দৃষ্টান্তে)। আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণগুলি প্রথম ক্ষেত্রে সক্রিয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে প্রধানত সক্রিয় হয়ে উঠেছে অর্থপরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব নির্ভর সূক্ষ্ম কারণগুলি।

৩২.৭ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

আমরা পূর্বে দেখেছি শব্দের প্রাথমিক বাচ্যার্থ অভিধারূপে, লক্ষ্যার্থ লক্ষণরূপে এবং ব্যঙ্গার্থ ব্যঞ্জনারূপে পরিস্ফুট হয়। ই সবকটি ক্ষেত্রেই শব্দের অর্থান্তর ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কোনো শব্দ ভাষায় দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হতে হতে, কখনও তার অর্থের ব্যাবহারিক পরিসীমা সংকুচিত হয়, কখনও আবার এই পরিসীমা প্রসারিত হয়। এরই ফলে শব্দার্থ পরিবর্তনের নানা ধারার জন্ম হয়েছে। এই ধারাগুলিকে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে পঞ্চমুখীরূপে দেখা যায়—

(১) অর্থের উন্নতি (Elevation of meaning)

(২) অর্থের অবনতি (Deterioration of meaning)

(৩) অর্থের সংকোচন (Reductiion of meaning)

(৪) অর্থের প্রসার (Expansion of meaning)

(৫) অর্থসংক্রম / অর্থসংশ্লেষ (Transfer of meaning)

আসুন, এইবার আমরা দেখি এই পঞ্চধারা কীভাবে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

(১) অর্থের উন্নতি/অর্থোৎকর্ষ ঃ

কোনো শব্দের অর্থ যদি এমনভাবে পরিবির্তত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো তার চেয়ে সম্মানিত বা আদৃত ভাব বা বস্তুকে নতুন অর্থে প্রকাশ করা হচ্ছে, তাবে তাকে অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ বলে। যেমন 'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ গৃহ, অর্থোন্নতির ফলে 'দেবগৃহ'। একইভাবে 'ভোগ' খাদ্যসামগ্রীর সামান্যতা থেকে দেবতার আহার্যে উন্নীত। 'সম্ভ্রম' শব্দের মূল অর্থ 'ভয়', এখন তা 'মান্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'দর্শন' এর অর্থ দেখা হলেও দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করাতেই এই শব্দটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করি।

(২) অর্থের উন্নতি/অর্থোপকর্ষ ঃ

কোনো শব্দ অর্থপরিবর্তনের ফলে যদি এমন হয় যে, মূল অর্থ অপেক্ষা তুচ্ছ বা হীন কোনো বস্তু বা বিষয়কে, নতুন অর্থের দ্বারা বোঝান হচ্ছে, তবে তাকে বলে অর্থের অবনতি বা অর্থাপকর্ষ। যেমন 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি হলেও প্রচলিত অর্থ 'সুদখোর'। 'ইতর' শব্দের বাচ্যার্থ 'অন্য' বা 'অপর', কিন্তু এখন 'ছোটলোক' বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'প্রীতি' মূল অর্থ 'প্রেম'কে বহন করলেও স্বরভক্তিজাত 'পীরিতি' কিন্তু 'অবৈধ প্রণয়' বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ লক্ষ করে দেখুন, অর্থোন্নতি এবং অর্থাবনতির উভয় ক্ষেত্রেই বাচ্যার্থকে পিছনে সরিয়ে প্রচলিত বা প্রায়োগিক অর্থগুলিই ক্রমশ প্রবল ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

(৩) অর্থের সংকোচ ঃ

প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবেকে বোঝায়, এবং কালক্রমে যদি তার অর্থ পূর্ব প্রচলিত অর্থের কোনো একটিমাত্র বস্তু বা ভাবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে, তবে অর্থপরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়াকে বলে অর্থসংকোচ। যেমন—'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'খাদ্যবস্তু' এখন শুধুই 'ভাত'। 'মৃগ' শব্দটিকেও 'পশু' অর্থের ব্যাপকতা থেকে সঙ্কুচিত করে নিয়ে এখন শুধুমাত্র 'হরিণ' অর্থে আমরা প্রয়োগ করি। আরও দেখুন, সংস্কৃত থেকে আগত 'প্রদীপ' শব্দটি সবরকমের আলো বোঝাবার জন্য প্রস্তুত থাকলেও আমরা তার ব্যবহারসীমা কমিয়ে নিয়েছি একটি বিশেষ ধরনের আলোর ক্ষেত্রে, মাটি বা পিতলের বিশেষ পাত্রে তেল ও সলতে দিয়ে যে আলো জ্বালানো হয়।

(৪) অর্থের প্রসার/অর্থবিস্তার ঃ

শব্দের মূল অর্থ যখন কোনো কারণে তার উদ্দিষ্ট বস্তু বা ভাবকে অতিক্রম করে ওই প্রাথমিক বস্তু বা ভাব নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার অর্থের প্রসার ঘটে। অর্থাৎ এটিকে আমরা অর্থসংকোচের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া বলতে পারি। অর্থের সঙ্কীর্ণতা কালক্রমে অধিকতর বস্তু ও ব্যাপকতর ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রসারিত হয়ে যায়। যেমন কালো রঙের উপাদানে তৈরি লিখবার তরল উপাদান ছিল 'কালি'। এখন যেকোনো বর্ণের লিখন মাধ্যমই 'কালি'। 'গঙ্গা' শব্দজাত 'গাঙ' তার প্রায়োগিক অর্থসীমা বাড়িয়ে. নিয়েছে যেকোনো নদী অর্থে। 'লক্ষ্মী' শব্দের সম্প্রসারিত অর্থ দাঁড়িয়েছে শান্তশিষ্ট। 'তৈল' শব্দের মূল অর্থ তিলের নির্যাস, এখন সর্ষে বা নারকেলের নির্যাসও তৈল বা 'তেল'।

(৫) অর্থ-সংক্রম/অর্থসংশ্লেষ ঃ

শব্দের অর্থপরিবপর্তন কতগুলি স্তর অনুযায়ী ঘটে। এই ধাপগুলি অতিক্রম করার পর শেষপর্যন্ত শব্দটির যে অর্থ দাঁড়ায়, সেই নতুন অর্থের সঙ্গে মূল অর্থের কোনো যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে ভিন্ন কোনো বস্তুতে সরে এসেছে। এইভাবেই অর্থসংক্রম ঘটে। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হ'ল 'সন্দেশ' শব্দটি। এর মূল অর্থ ছিল 'সংবাদ, খবর'। প্রেরক সংবাদ নিয়ে যেতেন কিছু মিষ্টান্নসহ। এই অনুষঙ্গেই শব্দটি মূল অর্থটিকে হারিয়ে 'মিষ্টান্ন' অর্থটিকে আঁকড়ে ধরেছে। অনুরূপভাবে দেখুন 'পাত্র' শব্দটিরও পরিণতি। এর মূল অর্থ ছিল 'পান করার আধার', ক্রমশ এটি 'কন্যা দান করার আধার'-এ পরিণত হয়েছে অর্থ সংক্রমের ফলে।

উপরিউক্ত এই আলোচনায় আমরা দেখলাম যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই একটি অর্থ বোঝাবার জন্য প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনের অমোঘ নিয়মকে স্বীকার করে নিয়েছে তার অর্থবোধের ক্ষেত্রে। এতে ভাষার অর্থগৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে, সাহিত্য রচনায় শাব্দিক সুষমাবৃদ্ধির কাজেও এটি সহায়ক হয়ে উঠেছে। শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে তাই মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি ও চিন্তাধারারই সাক্ষ্যবহনকারী।

৩২.৮ সুভাষণরীতি

অকল্যাণসূচক অথবা নিন্দিত বা কুৎসিত কিংবা বিপজ্জনক কোনো অর্থকে কল্যাণবাচক, ভদ্ররূপ দেবার জন্য মানুষ অনেকসময় প্রায় বিপীত বা পৃথক অর্থবোধক শব্দের আশ্রয় নেয়। একে এককথায় সুভাষণ (Euphemism) রীতি বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

উদ্দিষ্ট অর্থের বিপরীত অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষ্যণীয়। যেমন ধরুন—গার্হস্থ্য জীবনে চাল না থাকা অমঙ্গালে। তাই চালের অভাব বোঝাতে 'বাড়ন্ত' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় (চাল বাড়ন্ত)। বিদায় গ্রহণ প্রিয়জনের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ঘটনা। তাই কোথাও যাবার সময় 'আসি' শব্দটি প্রয়োগ করে 'যাই'-এর অর্থ বোঝানো হয়। বসন্ত রোগ যতই কষ্টকর হোক না কেন, তাকে 'শীতলার দয়া' বা 'মায়ের দয়া' বলে মেনে নেবার মানসিকতাও আমাদের মধ্যে দেখা যায়। নিম্নবর্ণের মানুষকে 'হরিজন' নামে অভিহিত করা, পাচককে 'ঠাকুর' বলে ডাকা বা সুদখোরকে 'মহাজন' রূপে চিহ্নিত করার মধ্যেও এই প্রবণতাই সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আবার দেখুন, কখনও কখনও অভিপ্রেত অর্থবোধক শব্দের থেকে পৃথক শব্দ ব্যবহার করেও আমরা বক্তব্যকে সুভাষিত করে তুলি। যেমন—সাপকে 'লতা' বা সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘকে 'বড় শিয়াল' বলার মধ্য দিয়ে, এদের প্রকৃত নামোচ্চারণে যাতে এদের সাক্ষাৎ না পেতে হয়, এমনই একটা স্বস্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা মিশে থাকে।

তবে সুভাষণের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আলংকারিক ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ প্রয়োগে। মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে আমরা বলি 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি', মানুষের মৃত্যুর পর নশ্বর শরীরের পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবার অমোঘ পরিণতির কথাই এখানে বিবৃত। সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে আবার এই অর্থেই 'তিরোভাব' 'মহাসমাধি', ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করি। শূন্য ভাণ্ড প্রকাশ করতে গিয়ে বলি—ভাঁড়ে মা ভবানী।'

সুভাষণের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখুন, একধরনের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাপ্রকাশের ব্যাপারটিও লক্ষ করা যায়। কন্যাসন্তান যাতে জন্মগ্রহণ না করে, তাই শেষ জাতিকার নাম 'আন্নাকালী' (আর না কালী) রাখার প্রথা এই বাংলাদেশেই প্রচলিত। মৃত্যুর পর চিরআনন্দময় স্বর্গে ঠাঁই পাবার ইচ্ছায় 'স্বর্গলাভ' কথাটি ব্যবহার করে মৃত্যুকে সহনীয় করে তোলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সুপ্ত বাসনার ইঙ্গিত মেলে এই জাতীয় সুভাষণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে।

প্রসঙ্গত সুভাষণের বিপরীত একটি রীতির কথাও কিন্তু আমরা এই অর্থপরিবর্তনের সূত্রে দেখতে পারি। ভালোকে মন্দরূপে প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকে ভাষায় সৃষ্টি হয় দুর্ভাষণ (pejoration) যার নিদর্শন বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও সুলভ। কখনও আদর জানাতেক, কখনও অমঙ্গালের হাতে থেকে রক্ষা করতেই দুর্ভাষণ প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায়। নাতিকে আদর করে 'শানা', বাৎসল্যের আতিশয্যে সন্তানকে 'দুষ্টু, পাজি, পাগলা', পুত্র বা

পুত্রোপম ব্যক্তিকে 'বেটা' (যার প্রকৃত অর্থ বিনা মাইনের মজুর) সম্বোধন করার মধ্যে দুর্ভাষণের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। আবার দেখুন, সন্তানকে যম যাতে স্পর্শ না করেন, তাই ঘৃণ্যবস্তু হিসাবে পরিচিতদানের উদ্দেশ্যে থেকে আদরের সন্তানের নাম রাখা হয় 'গুয়ে' বা 'গোবরা। অর্থাৎ মনের ভাব যাই থাকুক না কেন, উচ্চারিত নামে যেন তার বিপরীতভাব প্রকাশ করে, বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটা ইচ্ছা লক্ষ করা যায়।

৩২.৯ শব্দার্থ ও ইতিহাস উপাদান

শব্দার্থতত্ত্ব ও তার আনুষাঙ্গিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি নতুন শাখা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, যাকে বলা যায় 'ভাষা-আধারিত প্র- ইতিহাস' (Linguistic Palaeontology)। বিষয়টি ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং ভাষা বিজ্ঞান—সকল দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আগ্রহোদ্দীপক হলেও বাংলাভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে এটির আবির্ভাব অনেক দেরিতে। বিজ্ঞানের নানা শাখায়, জীবাশ্মের অস্তিত্ব থেকে, পৃথিবীর আদিমপর্বের অথচ অধুনালুপ্ত বিভিন্ন জীববিষয়ে জ্ঞানলাভ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ভাষাশাস্ত্রেও এইভাবেই বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থবৈচিত্র্যের নানা স্তর থেকে প্রাচীনকালের মানবসভ্যতার নানা চকমপ্রদ তথ্য অনুসন্থানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। একেই ভাষা আধারিত প্র- ইতিহাস বলা হয়। অনক সময় একই ভাষার নানা শব্দের বিশ্লেষণে, আবার অনেক সময় বিভিন্ন ভাষা যারা পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত হলেও পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত (যেমন সংস্কৃত ইংরেজি ফরাসি) এমন ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা থেকে সভ্যতার বিবর্তন ও ইতিহাসের অগ্রগতির একটি স্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে পাবার চেষ্টা করা হয়।

আমাদের প্রদর্শিত কিছু দৃষ্টান্তকেই আমরা বর্তমান বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যেমন ধরুন 'আর্য' শব্দটি। বুৎপত্তি অনুযায়ী যার অর্থ গতিশীল, ভ্রাম্যমাণ জাতি। কিন্তু অরণ্যনির্ভর এই জাতি ভারতবর্ষে এসে ক্রমশ কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠে এবং স্থিতিশীল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পরেও 'আর্য' নামটিই বহাল থাকে। আইদম এই জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের প্রাথমিক উপায়টি চিরস্থায়ী হয়ে আছে এই নামটির মধ্যে।

ইন্দো-ইউরোপীয় এই সম্প্রদায় প্রধানত মৃগয়াজীবী এবং যাযাবর হলেও তাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কসূত্র যে বেশ দৃঢ়বন্ধ অবস্থায় ছিল, তার প্রমাণ হিসাবে ভাষাতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন—প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারূপে-পিতা (পিতর্), মাতা (মাতর্), ভ্রাতা (ভ্রাতর), দুহিতা (দুহিতর) ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক শব্দগুলির ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিজিত পক্ষের বিবাহযোগ্য কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে ঘোড়ার পিঠে নিয়ে আসা হত। এই বিশেষরূপে নিয়ে আসার অর্থেই 'বিবাহ' শব্দটির প্রয়োগ ছিল। কালের অগ্রগতিতে এই প্রথা অবলুপ্ত। কিন্তু 'পানিগ্রহণ' বা 'বিবাহ' শব্দ এখনও সেই পূর্বপ্রথার স্মৃতি বজায় রেখেছে তাদের অস্তিত্বে।

'কলম' হিসাবে আজ আমরা যে বস্তু ব্যবহার করি তার আদিরূপ নির্মিত হয়েছিল শর বা খাগ দিয়ে, যাকে বোঝাবার জন্যই মূল 'কলম' শব্দটির উৎপত্তি। অথচ আজ দেখুন, ধাতু, কাঠ, প্লাস্টিক যাতেই কলম তৈরি হোক না কেন, 'কলম' শব্দটির বর্তমান ব্যবহারের মধ্যে শর বা খাগের ব্যবহৃত হবার ইতিহাস সংগোপনে থেকে যায়।

৩২.১০ সারাংশ

শব্দ ও তার অর্থপ্রকাশক ক্ষমতাকে নিয়ে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, তার মূল সূত্রগুলিকে এবার সংক্ষেপে আর একবার দেখে নিই আসুন। আমরা দেখলাম শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনো নিত্যসম্পর্ক নয়, বরং একটি পরিবর্তনশীল সম্পর্ক বিদ্যমান, যা নির্ভর করে আছে বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থের উপর।

আমরা আরও দেখলাম—স্থান, কাল এবং বক্তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের উপর শব্দের অর্থপরিবর্তনের বিষয়টি নির্ভরশীল। একভাষার শব্দ অন্য ভৌগলিক প্রতিবেশে ব্যবহৃত হলে, ভাবাবেগের আতিশয্যে আলংকারিক বাগ্‌বিন্যাসে, শব্দের যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত, সাদৃশ্যের প্রভাবে, সংস্কার বা বিশ্বাসের কারণে উচ্চারণপ্রয়াসে শৈথিল্যের ফলে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে।

অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে শব্দের মোটামুটি পঞ্চমুখী গতি দেখা যায়। অর্থের উন্নতি ও অবনতি, অর্থের প্রসার ও সংকোচ এবং অর্থ সংক্রম—এই পাঁচটি উপায়ে শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়। এই সবকটি ক্ষেত্রেই, পূর্বোল্লিখিত কারণগুলির কোনো একটি বা একাধিক কারণ একযোগে অর্থান্তরের দায় বহন করে।

শব্দের অর্থ আমাদের অবচেতনেই আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে। প্রাচীনকালে কোনো বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ, একালে ভিন্নতর অর্থে প্রযুক্ত হলেও, তার রূপগত গঠনে সুপ্ত থাকে আদিঅর্থের দ্বারা প্রকাশক তথ্য। শব্দার্থ তাই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবেও একটি পৃথক গুরুত্বের অধিকারী।

৩২.১১ অনুশীলনী

১। অর্থপরিবর্তনের কোন্ বিশেষ কারণটি প্রযুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থান্তর ঘটেছে বলুন ঃ

মহারাজ (পাচক অর্থে), রামধনু, ঝি, শাঁখা বাড়া, গবাক্ষ, অশ্রুবন্যা, সব্জি।

২। অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিচয় দিন ঃ

(ক) শব্দের লক্ষণাশক্তি

(খ) ব্যঞ্জনাগত অর্থ বা ব্যঙ্গার্থ

(গ) দুর্ভাষণ

(ঘ) অর্থপরিবর্তনের আলংকারিক কারণ

৩। অর্থপরিবর্তনের কোন্ কোন্ ধারায় নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থান্তর ঘটেছে, তা বলুন ঃ

বিভীষণ, থান (< স্থান), ফলার, নোয়া (স্ত্রীলোকের লৌহবলয়), উজবুক (< জাতিবাচক 'উজবেক')।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বাংলা শব্দের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন ঃ

(ক) অর্থের উন্নতি এবং অবনতি।

(খ) শব্দার্থে ঐতিহাসিক উপাদান।

(গ) অর্থের প্রসার এবং অর্থসংক্রম।

(ঘ) শব্দের অর্থ সংকোচন।

৩২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

২. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

৩. ড. জীবেন্দু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

একক ৩৩ ❐ বাংলা শব্দভাণ্ডার

গঠন

৩৩.১ উদ্দেশ্য

৩৩.২ প্রস্তাবনা

৩৩.৩ শব্দাবলীর উৎসানুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস

৩৩.৪ বাংলা শব্দভাণ্ডারে ব্যবহৃত শব্দের উৎসনির্ণয়

৩৩.৪.১ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা শব্দাবলি

৩৩.৪.২ সারসংক্ষেপ

৩৩.৫ আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দ

৩৩.৫.১ সারসংক্ষেপ

৩৩.৬ নবগঠিত শব্দ

৩৩.৭ সারাংশ

৩৩.৮ অনুশীলনী

৩৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- ভাষার শব্দভাণ্ডার গড়ে ওঠার সাধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎসগুলিকে নির্দিষ্ট করতে পারবেন।
- বাংলা শব্দ হিসাবে পরিচিত কিন্তু মূলত ভিন্ন প্রাদেশিক বা বিদেশি শব্দগুলিকে চিনে নিতে পারবেন।

৩৩.২ প্রস্তাবনা

কোনো ভাষার সমৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে তার শব্দভাণ্ডারের উপর। যে ভাষার শব্দ-সম্ভার যত বেশি সেই ভাষাও ততবেশি সমযদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। কোনো ভাষার শুধুমাত্র শব্দজ্ঞানের সাহায্যেই কাজ চালিয়ে নেবার মতো মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব। আমরা এর পূর্ববর্তী এককে শব্দার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, শব্দরাশি যে শুধু ভাবপ্রকাশেরই উপাদান তা নয়, এর মধ্য দিয়ে ভাষা ব্যবহারকারী একটি জাতির আচার ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি—এককথায় তার প্রাণরহস্যের সন্ধানও পাওয়া যায়।

সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ফলে, একদা সমাজ প্রচলিত অনেক জিনিস অচল হয়ে যায়, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় পুরনো ধ্যানধারণারও অবলুপ্তি ঘটে। আবার পাশাপাশি নতুন যুগের নতুন বস্তু, নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতা সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দেয়। যেগুলি অপ্রচলিত হয়ে যায়, সেগুলির অর্থপ্রকাশক শব্দাবলিও ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। আবার নতুন বস্তু ও ধারণার উপযোগী শব্দ সেইস্থান অধিকার করে। যেমন একদা আমাদের সমাজে চিকিৎসার কাজে আয়ুর্বেদের বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা আমাদের কাছে আর আদৃত নয়। তাই আমরা ভুলেই গেছি একদা প্রচলিত, অতি-পরিচিত বেশ কিছু ওষুধের নাম যেমন 'বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত' বা 'বৃহৎ প্রাণেশ্বর'। বৈদিক যুগে যেসকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাঁদের অনেকের উপাসনাই আমরা আজ আর করি না। ফলে সেইসব দেবদেবীর নাম এখন অপ্রচলিত। যেমন—অদিতি, পর্জণ্য, পূষণ ইত্যাদি। একই সঙ্গে লক্ষ্য করুন—আসবাব হিসাবে কত নতুন জিনিসের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি এবং তাদের গ্রহণও করেছি নিত্য প্রয়োজনীয় হিসাবে। তাদের নামগুলিও এখন আমাদের কাছে নিত্যব্যবহার্য। অথচ ইংরেজরা আসার আগে ওই বস্তুগলির সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। ইংরেজেদর মাধ্যমেই ওই বস্তুগুলি আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত হয়েছে। যেমন—চেয়ার, টুল, ডিভান, সোফা ইত্যাদি।

এইভাবেই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে কোনো একটি ভাষার শব্দ-সম্পদ গড়ে ওঠে। প্রয়োজনের নিরিখে শব্দাবলীর অস্তিত্ব নির্ভর করে যে কোনা ভাষায়।

৩৩.৩ শব্দাবলির উৎসানুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত থেকে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত অবহট্টের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা জন্মলাভ করেছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা নানা দেশি ও বিদেশি শব্দ আত্মসাৎ করে তাদের নিজের ব্যাকরণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। এই সকল শব্দাবলি অবিকৃত বা ধ্বনিগত বিবর্তনের স্তর পরম্পরা পার হয়ে বাংলাভাষায় প্রবেশ করেছে। উপরন্তু ঐতিহাসিক গতিতে যত বিদেশি জাতি এদেশে এসেছে এবং শাসকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের ভাষার শব্দাবলিও কালক্রমে বাংলার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়ে গেছে। এতরকম উৎস থেকে প্রাপ্ত শব্দাবলিকে তাই প্রাথমিকভাবে তিনট পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

(১) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ (Inherited words)

(২) অন্যসূত্রে আহৃত আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ (Loan / Borrowed words)

(৩) ভাষায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা শব্দ

(১) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ ঃ

এই পর্যায়ভুক্ত শব্দগুলিকে 'মৌলিক শব্দ' নামেও অভিহিত করা হয়। যেহেতু ভারতের প্রাচীন আর্যভাষা ও অনার্য-ভাশার শব্দাবলিই এই অঙ্গীভূত, সেইহেতু দেশজ ঐতিহ্যের দিকে নজর রেখে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই শব্দগুলি কখনও মূল ধ্বনিসংগঠনের রূপ যথাযথ রেখে, কখনও আবার উচ্চারণবিকার

রূপান্তরিতভাবে বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে। এই বিকৃতির দিকে লক্ষ রেখেই এই পর্বে শব্দগুলিকে আমরা তিনটি উচ্চশ্রেণিতে সাজাতে পারি—(ক) তৎসম শব্দ (খ) তদ্ভব শব্দ এবং (গ) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ।

(২) অন্যসূত্রে আহৃত আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ :

এই শব্দগুলি প্রাকৃতের স্তর পার হয়ে আসা, সংস্কৃতে একদা গৃহীত, প্রাচীন বিদেশিভাষার শব্দ নয়। এগুলি মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগে রাজভাষারূপে ব্যবহৃত, বিদেশি, ভিন্নভাষা ব্যবহারকারী শাসকের ভাষা থেকে গৃহীত। বাংলায় তুর্কি শাসনের সময় থেকে এক দীর্ঘ পর্বের ইতিহাস এই বিদেশি শাসকবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে বিভিন্ন বৈদেশিক শব্দ এই সময়পর্বে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। এগুলিকেই আগন্তুক শব্দ বা কৃতঋণ শব্দ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই জাতীয় শব্দে কখনও মূল বানানোর সদৃশ উচ্চারিত রূপ, কখনও বাংলাভাষার নিজস্ব উচ্চারণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্যরূপ প্রচলিত হতে দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রের মাধ্যমেও বহু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছে। এগুলিও এই একই শ্রেণিভুক্ত হবার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে মনে করতে পারেন সোভিয়েত রাশিয়ায় কিছু বছর আগেই যখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদারনীতির হাওয়া বইতে শুরু করেছি, তখন 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা' শব্দদুটি এই পদ্ধতিতেই আমাদের ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।

(৩) ভাষায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা শব্দ :

বাংলাভাষায় কিছু শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়, যেগুলি অন্যভাষাজাত নয়, বিবর্তনের ধারা পার হয়ে আসা দেশজ বা তৎসম শব্দও সেগুলির উৎস নয়।

শব্দ গঠন করতে গেলে রূপমূল ও প্রত্যয়বিভক্তি যুক্ত করার প্রচলিত রীতিটিকে বজায় রেখেই এখানে এমন কিছু শব্দ তৈরি করা হয়েছে যেগুলির রূপমূলটি কাল্পনিক অর্থাৎ সংস্কৃতে তার উৎস পাওয়া যায় না। এইসূত্রে আমরা আমাদের অতিপরিচিত একটি শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে পারি, যেমন—'প্রোথিত'। এর মূল যে 'প্রোথ্' ধাতু, সেটি কাল্পনিক, যার সঙ্গে 'ইত' যোগ করা হয়েছে 'প্রোথিত'। এই ধরনের শব্দগুলির এরকম বর্ণচোরা অস্তিত্বের কারণে ভাষাতাত্ত্বিকরা এগুলিকে 'ভুয়া শব্দ' নামে চিহ্নিত করতে চান। তৎসম শব্দের আচ্ছাদনে এরকম আরও কিছু শব্দ আছে সেগুলি হয় অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের অনূদিত রূপ, (যেমন—যোজনা < Planning, বিশ্ববিদ্যালয় < University ইত্যাদি) অথবা বহিরাগত শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের যুগ্মরূপ (যেমন—মিনতি < আরবী 'মিন্নৎ' + বাংলা 'নতি', 'বিদায়' < আরবী 'ওয়াদা', কিন্তু শব্দটি 'আদায়', 'প্রদায়' এর মত অর্বাচীন সংস্কৃতেও ঢুকে গেছে।) এইভাবে ননোবদিত শব্দ প্রয়োজনের নিরিখেই শব্দ ভাণ্ডারের শূন্যস্থান পূরণ করে চলেছে।

৩৩.৪ বাংলা শব্দভাণ্ডারে ব্যবহৃত শব্দের উৎসনির্ণয়

আসুন, এইবারে শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করা শব্দের উৎসমূল সম্পর্কে যে তিনটি ধারার সন্ধান পেলাম, বাংলাভাষার শব্দগুলিকে সেই ধারায় কীভাবে বিন্যস্ত করা যায় তা লক্ষ করি। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে কথ্য

বাংলার বিভিন্ন শব্দাবলি আমাদের একান্ত অসচেতন প্রয়াসেই উচ্চারিত হয়ে চলে। অর্থপ্রকাশ বা ভাবের যথার্থ পরিস্ফূরণই সেখানে আমাদের মূল লক্ষ্য। শব্দের উৎস, মূলরূপ ইত্যাদি নিয়ে আমরা সচরাচর মাথা ঘামাই না। কিন্তু এ ব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা চমকপ্রদ। বাংলা শব্দভাণ্ডারের যতখানি জুড়ে আছে আমাদের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত দেশজ বা সংস্কৃতজ শব্দ, প্রায় ঠিক ততটাই জুড়ে আছে বহিরাগত বিদেশি ভাষার শব্দ। একান্ত পরিচিত, কথ্যবাংলায় নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলিও দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে বিদেশি ভাষাজাত। আসুন, বাংলার ব্যবহৃত অতিপরিচিত শব্দগুলির মধ্য থেকেই এই ত্রিধারার বহমানতা অনুভব করি।

৩৩.৪.১ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা শব্দাবলি

প্রথম শ্রেণি হিসাবে আমরা দেখেছিলাম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দগুলিকে, যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (ক) তৎসম, (খ) তদ্ভব ও (গ) অর্ধতৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দগুলি। আমাদের পরিচিত, নিত্যব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্য থেকেই এই তিন উপশ্রেণির শব্দাবলি আমরা খুঁজে পেতে পারি। এই তিনটি উপশ্রেণিকে ক্রমান্বয়ে আমরা বিশ্লেষণ করব এইভাবে—

(ক) তৎসম শব্দ ঃ

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক বা সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে 'তৎসম' শব্দ বলা হয়। 'তৎ' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে মূল উৎসস্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে। অর্থাৎ 'তৎ-সম' মানে 'তাহার সমান' বা ঠিক তার মতো, এক কথায় অপরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় এই জাতীয় শব্দের সংখ্যা অনেক। যেমন—জল, বায়ু, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

এই তৎসম শব্দগুলির মধ্যে আবার দুটি শ্রেণি দেখা যায়, যে দুটিকে ভাষাবিদ্‌গণ 'সিদ্ধ' ও 'অসিদ্ধ' এই দুই বিশেষণে নির্দিষ্ট করেছেন। তাদের মতে—

সিদ্ধ তৎসম শব্দ হল সেই শব্দগুলি, যেগুলি বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং ব্যাকরণসিদ্ধ। যেমন—সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি।

আর অসিদ্ধ তৎসম শব্দ হল সেই শব্দগুলি, যেগুলি বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না বা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, অথচ প্রাচীনকালে কথ্য সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে এই নামে চিহ্নিত করা হয় যমন—কৃষাণ, ঘর, চল, ডাল (গাছের ডাল) ইত্যাদি।

(খ) তদ্ভব শব্দ ঃ

এই শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তীপর্বে প্রাকৃতের স্তর পেরিয়ে পরিবর্তিতরূপে বাংলাভাষায় এসেছে। এই জাতীয় শব্দ বাংলাভাশায় সংখ্যার দিক থেকে যেমন প্রচুর তেমনি এগুলির গুরুত্বও লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ এই জাতীয় শব্দগুলি। যেমন—

ইন্দ্রাগার (সং) > ইন্দ্রাআর (প্রা) > ইন্দারা, ইঁদারা (বাং)

হস্ত (সং) > হত্থ (প্রা) > হাথ (প্রাচীন বাং) > হাত (বাং)

নপ্তক (সং) > ণত্তিঅ (প্রা) > নাতি (বাং)

রাজ্ঞিকা (সং) রন্নিআ (প্রা) রাণী (বাং)

তদ্ভব শব্দগুলিকেও দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একটি যথার্থ বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তিত রূপ। এগুলিকে কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক 'নিজস্ব তদ্ভব' বলে চিহ্নিত করেন। যেমন—

কৃষ্ণ (সং) > কণ্হ (প্রা) > কাণ্হ (প্রা. বাং) > কান (ম. বাং)

পরে আদরার্থে 'উ' বা 'আই' প্রত্যয়যোগে কানু, কানাই।

উপাধ্যায় (সং) > উবজ্ঝাঅ (প্রা) > ওঝা (বাং) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টিতে বৈদিক বা সংস্কৃতভাষার এমনকিছু শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেগুলি সর্বপ্রথম ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের কোনো ভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য কোনো বংশের ভাষা থেকে এসে বৈদিক বা সংস্কৃত অনুপ্রবেশ করেছিল। কালক্রমে সেগুলি প্রাকৃতের পথেই বিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় এসেছে। তবে যেহেতু বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব শব্দ এগুলি নয়, বরং বলা ভালো ঋণকৃত, তাই এই জাতীয় শব্দের বিবর্তনের ধারায় প্রাপ্ত তদ্ভব শব্দগুলিকে কেউ কেউ 'কৃতঋণ তদ্ভব' বলে উল্লেখ করতে চান। যেমন—

- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্যভাষাজাত ঃ

  গ্রিক -'দ্রাখমে' > দ্রম্য (সং) > দম্ম (প্রা) > দাম (বাং)

  প্রাচীন পারসিক-'কর্শ' > কার্ষাপণ (সং) > কাহাবণ (প্রা) > কাহন (বাং)

- ইন্দো-ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য ভাষাবংশের কোনোভাষাজাত :

  দ্রাবিড় বংশের তামিল 'পিল্লৈ' > পিল্লিক (সং) > পিল্লিঅ (প্রা) > পিলে (বাং)

  'মুটে' > মুট্টক (সং) > মুডঅ (প্রা) > মোট (বাং)

  অস্ট্রিক ভাষা বংশের থেকে আগত সংস্কৃত 'ঢক্ক' > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলায় ঢাকা।

  মোঙ্গাল ভাষাবংশের থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক > প্রাকৃত তরুক্ক > বাংলায় তুরুক্ক।

মনে রাখবেন, এই যে শব্দগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল, এগুলি বাংলায় এসেছে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার পথ বেয়ে অর্থাৎ ঘুরপথে, সরাসরি নয়। এখানেই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দের সঙ্গে এগুলির তফাত।

(গ) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ :

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক/সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী প্রাকৃতের স্তর পার না হয়ে, সোজাসুজি বাংলায় এসেছ এবং আসর পর কালোচিত বিকৃতি ও পরিবর্তন লাভ করেছে, সেই শব্দগুলিকে অর্থ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে আমরা বিকৃত তৎসম' শব্দ বলে অভিহিত করতে পারি। আমাদের আটপৌরে ভাষারীতিতে এই জাতীয় শব্দের অস্তিত্বও প্রচুর। যেমন—কৃষ্ণ (সং) > কেষ্ট (অর্থতৎ),

নিমন্ত্রণ > নেমতন্ন, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, পুরোহিত > পুরুত, বৈষ্ণব > বোষ্টম, মহোৎসব > মোচ্ছব, যজ্ঞ > যজ্ঞি ইত্যাদি।

৩৩.৪.২ সারসংক্ষেপ

এইবার বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রথম উৎস হিসাবে যেদিকটি নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সার তৈরি করে নিতে পারি এইভাবে—বাংলা শব্দভাণ্ডারে আছে—

সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা থেকে, প্রাকৃতের পথ বেয়ে আগত শব্দাবলি, যার মধ্যে আছে তিন শ্রেণির শব্দ—

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশজাত বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব শব্দ

(খ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাবংশজাত শব্দ (দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মোঙ্গল)

আর আছে (গ) প্রাকৃতের পথে না এসে, বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় গৃহীত শব্দাবলি যেগুলি

(অ) কখনও অবিকৃত উচ্চারণে, মূলের যথাযৃথ রূপ বজায় রেখেই ব্যবহৃত হয়।

(আ) আমবার কখনও বাংলায় নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতির কারণে খানিকটা বিকৃত রূপে ব্যবহৃত হয়।

সেইসঙ্গো আরও একটি বিষয় মনে রাখবেন, কোনো শব্দ শুধু তৎসম রূপে, কোনোটি তদ্ভব রূপান্তরে বা কোনোটি ভগ্ন-তৎসম বিকারে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি একই সঙ্গো দুটি বা তিনটি রূপেই কোনো কোনো শব্দ ভাষায় প্রচলিত থাকতে পারে। যেমন—

তৎসম	অর্ধতৎসম্য	তদ্ভব
বৈদ্য	বদ্দি	—
গৃহিনী	গিন্নি	ঘরনী
চন্দ্র	চন্দর	চাঁদ
রাত্রি	রাত্তির	রাত
কৃষ্ণ	কেষ্ট	কানু
জ্যোৎস্না	জোছনা	—

৩৩.৫ আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দ

আসুন, এইবার বাংলা শব্দভাণ্ডার গঠনে দ্বিতীয় উৎসটিকে তার শব্দাবলি সহ চিনে নেবার চেষ্টা করি। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে—বৈদিক বা সংস্কৃতভাষা থেকে সলাসরি বা প্রাকৃতের পথ বেয়ে যে শব্দাবলি বাংলায় এসেছে, তাছাড়া অন্য সমস্তই শব্দগুলিই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ। এক কথায় আমরা বলতে পারি—এগুলি কোনো অবস্থাতেই বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষাজাত শব্দ নয়, অন্যভাষা থেকে সংস্কৃতের পথ বেয়ে প্রাকৃতের

বিবর্তনধারা পার হয়ে আসা শব্দও নয়, এগুলি ভারতের অন্য কোনো প্রদেশের বা বিদেশি কোনো ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত শব্দাবলি।

মনে রাখবেন 'কৃতঋণ তদ্ভব' শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষায় আগে এসেছিল, তারপর বাংলাভাষায়। কিন্তু আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দগুলির গায়ে সংস্কৃতের ছোঁয়াচ লাগেনি, সেগুলি সরাসরি বাংলায় এসেছে তাদের উৎস ভাষা থেকে।

এই আগন্তুক শব্দগুলিও আবার তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত হতে পারে (১) দেশি, (২) প্রাদিশেক, (৩) বিদেশি।

(১) **দেশি শব্দ**—ভারতবর্ষে আর্যরা আসার আগে যে যে গোষ্ঠী এদেশে বাস করত, তাদের নিজস্ব ভাষার কিছু কিছু শব্দ আমরা বিভিন্ন ভারতীয় আর্যভাষায় গ্রহণ করেছিলাম। এই শব্দগুলির উৎপত্তি কোথা থেকে আসে তা জানা না থাকলেও আধুকিন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক বা ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীকে এগুলির উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগেই দেখেছেন, এইসব ভাষার বেশ কিছু শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়ে তৎসম শব্দের মর্যাদা লাভ করেছে। অন্যান্য আরো কিছু শব্দ বাংলাভাষায় সরাসরি প্রবেশ করে 'দেশি শব্দ' হিসাবে আমাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এই পর্যায়ের শব্দ হিসাবে বাংলা ভাষায় দেখতে পাবেন এদের—

দ্রাবিড় ভাষাজাত— ইডলি, চেট্টি, চুরুট, আকাল ইত্যাদি।

অষ্ট্রিক ভাষাজাত— ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেংকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গো, উচ্ছে, খড়, ডিঙ্গা, মুড়ি, কুলা, চুলা ইত্যাদি।

ভোট-বর্মী ভাষাজাত— লুঙ্গী, লামা ইত্যাদি।

(২) **প্রাদেশিক শব্দ**—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত নব্যভারতীয় আর্যভাষার বেশ কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলিও আগন্তুক বা কৃতঋণ পর্যায়ভুক্ত। যেমন—

পাঞ্জাবী ভাষা থেকে— শিখ, চাহিদা প্রভৃতি।

মারাঠী ভাষা থেকে— বর্গী, পাটিল।

গুজরাটী ভাষা থেকে— হরতাল, গরবা, খাদি, তকলি ইত্যাদি।

হিন্দী ভাষা থেকে— কুত্তা, পানি, লাগাতার, বন্ধ, ঝণ্ডা, মিঠাই, সমঝোতা, বদলা, খতম, জলদি ইত্যাদি।

(৩) **বিদেশি শব্দ**—যেসব শব্দ ভারতবর্ষের বাইরের অন্য কোনো দেশে প্রচলিত ভাষার থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেইসব শব্দগুলি বিদেশি কৃতঋণ শব্দ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশি জাতি এদেশে আসে এবং শাসনতান্ত্রিক বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করে। তাদের নিজস্ব ভাষার বেশ কিছু শব্দ এই সহাবস্থানের ফলে বাংলাভাষায় অনুপ্রবেশ করেছিল এবং বর্তমানে বাংলাভাষার দেহে তারা এমনভাবে মিশে গেছে যে এদের আর বিদেশি বলে চেনার উপায়ও নেই।

এই সূত্রে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হতে পারে তুর্কি-মুঘল-পাঠান জাতীয় মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে

আগত আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দাবলি। প্রায় হাজার বছর আগে আসা এইসব ভাষা-ব্যবহারকারী মুসলমানরা রাজনৈতিক কারণে এদেশে প্রায় সাতশ' বছর শাসক হিসাবে ছিলেন। ফলে রাজভাষা হিসাবে এদেশে এইসব ভাষাগুলির একসময়ে যথেষ্ট অর্থকরী জনপ্রিয়তা এবং প্রতিপত্তি ছিল। এই কারণেই অতি দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে এইসব ভাষার শব্দাবলি বাংলাভাষায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। মূলত ফারসি এবং ফারসির মাধ্যমেই কিছু তুর্কি ও আরবি শব্দকে বাংলাভাষা আত্মীকরণ করে নিজস্ব সম্পদে পরিণত করেছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে প্রায় আড়াই হাজার ফারসি ও ফারসি-মাধ্যমে আগত আরবি ও তুর্কি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। যেমন—

ফারসি শব্দ—হাওয়া, রোজ, হপ্তা, উকিল, জমি, মজুর, আন্দাজ, জাহাজ, পেয়ালা, খুব, জোর দূরবীন, সিন্দুক প্রভৃতি।

আরবি শব্দ (ফারসি মাধ্যমে)—আইন, আক্কেল, কেচ্ছা (কস্‌সা), কিতাব, জেলা, তাজ্জব, নিক্তি, আতর ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ (ফারসি মাধ্যমে)—চাকু, তকমা, বাহাদুর, কাঁচি, কুলী, উর্দু, কাবু, বিবি, বোচকা, আলখাল্লা, ইত্যাদি।

এরই দ্বিতীয় পর্যায় দেখা দিল ঊনবিংশ শতক থেকে যখন ইংরেজি শাসনকর্মের ভাষা হিসাবে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। তখন ইংরেজি ভাষা শুধুই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, পশ্চিমের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন চর্চার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। ফলত ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা দিল এবং বাংলাভাষায় এর বহু সংখ্যক শব্দ ক্রমশ এমনভাবে প্রবেশ করল যে বর্তমানে সেগুলি, সমার্থক তৎসম বা তদ্ভব শব্দের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ও জোরালো। লক্ষ করে দেখবেন, এই শব্দগুলির অথিকাংশেরই কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই (যেমন—টিকিট, সাইকেল, ইঞ্জিন, টেবিল, গ্লাস, ট্রাম, বাস, ইঞ্জেকশন, বাল্ব ইত্যাদি)। অর্থাৎ এরকম ইংরেজি শব্দগুলি আমাদের কাছে অপরিহার্যরূপে বিবেচিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত কথা বলি, তার সিংহভাগই জুড়ে আছে ইংরেজি শব্দ—আপিস (Office), লণ্ঠন (Lantern), বাকস (Box), হাসপাতাল (Hospital), ডাক্তার (Doctgor), স্কুল (School), পুলিশ (Police), চেয়ার (Chair), টেবিল (Table), ক্লাস, জাঁদরেল (General), স্যার (Sir) ইত্যাদি।

সংখ্যাগত দিক থেকে এরপরই আসে পর্তুগিজ ভাষা থেকে আগত শব্দাবলির প্রসঙ্গ। প্রশাসনিক দিক থেকে নয়, বরং অন্য এক বিচিত্র সম্পর্কে বাংলাভাষার সঙ্গে এই ভাষার যোগসূত্র রচিত হয়েছে। এদেশের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অনেক নতুন বস্তু ও নবসংস্কৃতির পরিচয় পর্তুগিজ শব্দের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। যেমন—অঙ্গাতা, আনারস, আলপিন, আলমারি, কেরানি, চাবি, কপি, আলকাতরা, তোয়ালে, জানালা, বোতল, বালতি, কামরা, বেহালা, পেঁপে, মিস্ত্রি, সাবান, গামলা, পেরেক, সাগু, তামাক ইত্যাদি।

ফরাসিরাও পর্তুগিজ ও ইংরেজদের মতো এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় কিছু ফরাসি শব্দও বাংলাভাষায় এসে গেছে। যেমন—কার্তুজ, কুপন, কাফে, রেস্তোরাঁ, রেনেশাঁস, বুর্জোয়া, আঁতাত, ম্যাটিনি, বিস্কুট, মেনু, ওমলেট ইত্যাদি।

সংখ্যালঘু ওলন্দাজ শব্দাবলি বাংলাভাষার ক্ষেত্রে একমাত্র তাসখেলার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। যেমন—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ।

এগুলি ছাড়াও আরও কিছু বিদেশিভাষার শব্দ প্রধানত ইংরেজির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন—

রুশ ভাষা থেকে	—	সোভিয়েত, বলশেভিক, স্পুটনিক
ইতালীয় ভাষা থেকে	—	কোম্পানি, গেজেট, ম্যাজেন্টা, ফ্যাসিস্ট।
জার্মান ভাষা থেকে	—	নাৎসী।
স্পেনীয় ভাষা থেকে	—	কমরেড
চীনা-ভাষা থেকে	—	চা, চিনি
জাপানি ভাষা থেকে	—	রিকসা, জুজুৎসু
মালয়ী-ভাষা থেকে	—	গুদাম
বর্মী ভাষা থেকে	—	ঘুগনি, লুঙ্গি।

শব্দ সম্পদ হিসেবে বিদেশি এতগুলি ভাষার কাছে বাংলাভাষা ঋণী। কিন্তু শুধু এখানেই বিদেশি ভাষাগুলির ঋণদান থেমে থাকেনি। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন যে যুগোপযোগী এবং ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে যুতসই নতুন শব্দ গড়ে নিতেও বাংলাভাষা কতবার কতরকমভাবে হাত বাড়িয়েছে বিদেশি ভাষার ভাণ্ডারে। আসুন, আমরা এবার বিচিত্র পথে আসা বিদেশি শব্দের প্রভাবটিকে দেখি—বাংলা শব্দগঠনের ক্ষেত্রে।

(ক) লিঙ্গান্তর সাধনে—ফারসি ভাষার প্রভাবে পাওয়া মদ্দা-কুকুর, মাদী-কুকুর।

(খ) প্রত্যয় হিসাবে— ফারসি 'আনা', 'গিরি', 'দার', 'বাজ', 'সই' প্রভৃতি যোগ করে তৈরি হয়েছে বিবিআনা, বাবুগিরি, কেরানিগিরি, বাজনদার, চালবাজ, ধড়িবাজ, মাপসই, টেঁকসই ইত্যাদি শব্দাবলি।

(গ) উপসর্গ হিসাবে—ফরাসি থেকে আগত উপসর্গ 'ফি', 'বে', 'গর' ইত্যাদি যোগে ফিসন, ফিহপ্তা, বেমানান, বেহাত, গররাজি, গরহাজির—এই জাতীয় শব্দগুলির উৎপত্তি। আবার ইংরেজি কিছু শব্দও এইভাবে উপসর্গের ভূমিকা পালন করে। যেমন—'হাফ্'-(হাফ-হাতা, হাফ্-আখড়াই), 'ফুল' (ফুল-হাতা, ফুল-মোজা) বা 'হেড' (হেড-পণ্ডিত, হেড মিস্ত্রী)।

(ঘ) সমাসবদ্ধ পদগঠনে—ফারসি এবং ইংরেজি উভয় ভাষার কাছেই বাংলার ঋণ এ ব্যাপারে প্রায় সমান। আমাদের কথ্য বাংলাভাষায় প্রতিনিয়ত কত যে এই গোত্রীয় শব্দ আমরা ব্যবহার করে চলেছি, তা খুঁজে পেতে দেখলে চমকে যেতে হয়।

ফারসি প্রভাবজাত এরকম শব্দ—রাজা-উজির, হাট-বাজার, শাকসব্জী, ধন-দৌলত, কাগজপত্র, আইন-আদালত ইত্যাদি। ইংরেজি প্রভাবজাত এই পর্যায়ের শব্দ হিসাবে দেখতে পাবেন—মাস্টারমশাই, ডাক্তারবাবু, উকিল-ব্যারিস্টার, ডাক্তার-বদ্যি ইত্যাদি শব্দগুলিকে।

(ঙ) ব্যাক্যাংশের আদি বর্ণ সমবায়ে 'শীর্ষক শব্দ' গঠনে—এ বিষয়ে ইংরেজির প্রভাব একচ্ছত্র বলা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করতে পারবেন। যেমন—বি.এ., এম.এ., গ.সা.গু, ল.সা.গু। এখনকার এম.এল.এ. বা এম. পি.-রাও এই একই ধারায় জাত।

শব্দভাণ্ডারের আসল সম্পদ হিসাবে আমরা এই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দগুলিকে অভিহিত করতে পারি। কারণ এতক্ষণের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয় নিশ্চয় আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভাষার সজীবতা নিহিত রয়েছে ক্রমবর্ধমান শব্দভাণ্ডারের মধ্যে, আর শব্দভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধিতে অন্যতম সহায়ক এই কৃতঋণ শব্দগুলি। মানুষের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, ঔৎসুগক্য যত বেশি তাকে নিজের গণ্ডির বাইরে টেনে আনে, তত বেশি সে দেশ-দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। সেই নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত শব্দে কাজ না হলেই, অন্যভাষার থেকে লাগসই শব্দ সে খুঁজে নেয়, নিজের মতো করে তাকে গড়ে নিয়ে, উদ্দিষ্ট ভাবপ্রকাশক রূপে সাজিয়ে স্থায়ী আসন দান করে নিজের ভাষার ক্ষেত্রে।

৩৩.৫.১ সারসংক্ষেপ

আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দগুলি তিনটি ধারা থেকে আগত—(১) প্রাচীন অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটবর্মী ভাষাজাত, (২) ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাজাত এবং (৩) বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষাজাত যেগুলির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে ফারসি এবং ইংরেজি।

তবে এই তিনটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করুন—আমরা এই সবগুলি শব্দকেই প্রায় আমাদের নিজস্ব উচ্চারণপ্রবণতার ছাঁচে ঢেলে এমনভাবে নবরূপ দিয়েছি যাতে সেগুলিকে আর বহিরাগত বলে চেনাই যায় না। যেমন—

তুর্কি 'কোয়ামচি' > বাংলা 'কঞ্চি'

আরবি 'জালা-ওয়াতন' > বাংলা 'জ্বালাতন'

ফারসি 'খুল' + আরবি 'মাল' > বাংলা 'গোলমাল'

ফারসি 'আহিস্তা' > বাংলা 'আস্তে'

পর্তুগিজ 'আনান,' > হাংসা 'আনারস'

ইংরেজি 'লর্ড', 'ল্যাম্প', 'সেন্ট্রি' > বাংলা 'লাট', 'লম্ফ', 'সান্ত্রী'।

এমনভাবে চেহারা পাল্টে ফেলায় বিদেশি শব্দগুলিও আজ আর মূলভাষার কথা মনে পড়ায় না। উচ্চারণগত স্বাভাবিকতা এই শব্দগুলির সঙ্গে এমনভাবে খাপ খেয়ে গেছে যে এগুলি বর্তমানে বাংলাভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। সেইকারণে বাংলার নিজস্ব প্রত্যয়-বিভক্তিও এগুলিতে যোগ করা হচ্ছে, যেমন—মাস্টারি, জজিয়তী, ডেপুটিপনা ইত্যাদি।

৩৩.৬ নবগঠিত শব্দ

সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই নবচেতনার প্রকাশোপযোগী শব্দেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। পূর্বলব্ধ ভাষাজ্ঞানের থেকে তখন নতুন শব্দ তৈরি করে নেবার প্রবণতা দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন ইতিপূর্বে দেখেচেন 'প্রোথিত' শব্দটির উৎপত্তি। 'নিরঞ্জন' শব্দটির উৎসও অনেকটা তেমনি—নীরমঞ্জন (সং) > নীরজ্জণ (প্রা) > নিরঞ্জন। বাংলাভাষায় এইরকম আরও বেশ কিছু শব্দের দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন—'বিধবা' শব্দের সাদৃশ্যে 'সধবা' ('ধব' অর্থ স্বামী ধরে নিয়ে), 'অতিরেক' ('অতিরিক্ত' অর্থে), 'কহতব্য', 'মোক্ষম', 'অতিষ্ঠ', 'আবাহন' ইত্যাদি।

অনেক সময় আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দ বা শব্দাংশ একত্র জুড়েও বাংলায় নবগঠিত শব্দাবলির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এগুলিকে আমরা মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ (Hybrid Word) বলতে পারি। যেমন—

হেড (ইংরেজি) + পণ্ডিত (বাংলা) = হেডপণ্ডিত

ফি (ফার্সি) + বছর (বাংলা) = ফি-বছর

দাদা (বাংলা) + গিরি (ফার্সি) = দাদাগিরি

বাবু (বাংলা) + আনা / আনী (ফার্সি) = বাবুয়ানা / বাবুয়ানী

জমি (বাংলা) + দার (ফার্সী) = জমিদার

নবগঠিত শব্দাবলির তৃতীয় ধারাটি মূলত অনুবাদ-প্রক্রিয়াজাত। বেশ কিছু ইংরেজি শব্দকে বাংলায় অনুবাদ করে ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি প্রভাবিত নবসৃষ্ট এই শব্দগুলিকে বলা চলে অনুদিত ঋণ। এই শব্দগুলি শুনতে অনেকটা তৎসম শব্দের মতো হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ বা অভিধানে এগুলির ঠাঁই নেই। কারণ এগুলি একান্তভাবে আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্ট। যেমন ধরুন—বিশ্ববিদ্যালয়, সিংহভাগ (Lion's Share) সুবর্ণ সুযোগ (Golden Opportunity), পাদপ্রদীপ (Foot light) শীর্ষ সম্মেলন (Summit Conference)। কাঁদানে গ্যাস (Tear Gas), বাতিঘর (Light house), হাতঘড়ি (Wrist-watch) ইত্যাদি শব্দগুলিও এই একইরকমভাবে আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত, তবে এগুলির আকৃতি তদ্ভব শব্দের মতো।

৩৩.৭ সারাংশ

এইবারে আসুন, সমগ্র এককটিতে আলোচিত বিষয়কে আর একবার আমরা ফিরে দেখি। দেশজ ও বৈদেশিক অবদানে বাংলাভাষার যে বৃহৎ শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, তার একটি সারণি আমরা এইভাবে তৈরি করতে পারি—

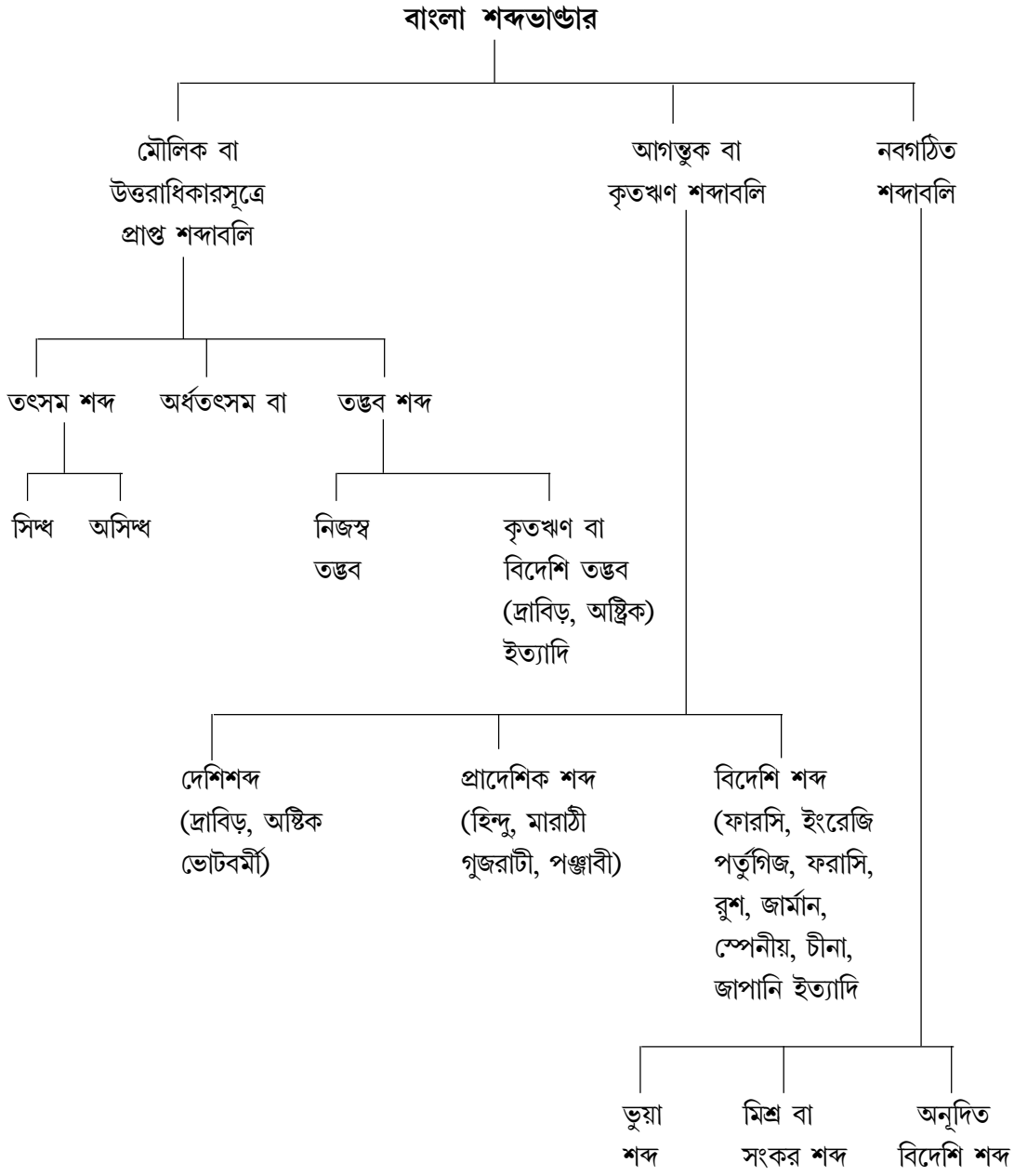

মনে রাখবেন, শব্দভাণ্ডারের এই গড়ে ওঠা এক অনন্ত প্রক্রিয়া। ব্যাকরণের নিয়মবদ্ধতা এখানে সবসময় খাটে না। দৈনন্দিন প্রয়োজনই এখানে শেষকথা। তাই সংবাদপত্রের সূত্রে, দেশি-বিদেশি সাহিত্যের সূত্রে, অধুনা দূরদর্শনের প্রভাবেও অহরহ নতুন শব্দ চলে আসছে আমাদের ভাষায়। এইভাবে বহু নদীধারাপুষ্ট সমুদ্রের মতোই বাংলা শব্দভাণ্ডারও দিনে দিনে স্ফীত ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

৩৩.৮ অনুশীলনী

১। অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিচয় দিন ঃ

(ক) সংকর বা মিশ্র শব্দ।

(খ) অর্থ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ।

(গ) অনূদিত কৃতঋণ শব্দ।

(ঘ) ভুয়া শব্দ।

২। নিম্নোক্ত শব্দগুলির উৎস নির্ণয় করুন ঃ

মানানসই, বেআক্কেলে, দাদাগিরি, হাঁসপাতল, লেডিকেনি, লামা, বাগান, গেরাহ্যি, সেমাখ, সোয়ামি, খড়্গহস্ত, ঢেউ, ডাহা, ওজা, ইঁদারা।

৩। পার্থক্য নির্ণয় করুন ঃ

(ক) কৃতঋণ তদ্ভব শব্দ এবং কৃতঋণ / আগন্তুক শব্দ।

(খ) অসিদ্ধ তৎসম শব্দ এবং তৎসমকল্প 'ভুয়া' শব্দ।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বাংলা শব্দের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন ঃ

(ক) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ সম্পদ।

(খ) বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দাবলি।

(গ) নবগঠিত শব্দাবলি।

৩৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

২. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

৩. ড. জীবেন্দু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা।

ভূমিকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম ৮টি পত্রে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত খ-১ পর্যায়। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাংলা কবিতার ছন্দ। আলোচনা মূলত ২টি ভাগ—ছন্দতত্ত্ব আর ছন্দ-বিশ্লেষণ। ছন্দতত্ত্বকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হল, চতুর্থ ভাগে থাকল ছন্দ-বিশ্লেষণ। গোটা পর্যায়টিও ৪টি এককে বিভক্ত। প্রথম ৩টি এককে ছন্দতত্ত্ব, চতুর্থ এককে ছন্দ-বিশ্লেষণ। প্রতিটি এককের অন্তর্গত বিষয়বস্তু এই রকম ঃ

একক ৩৪ ঃ বাংলা ছন্দের পরিভাষা এই এককের আলোচনার বিষয়। বাংলার দুই প্রথম সারির ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালীন ছন্দচর্চার ফসল থেকে তুলে আনা হয়েছে ৩৬টি পরিভাষা এর মধ্য থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষা বেছে নিয়ে দৃষ্টান্তসহ এদের ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল এই এককে। বাকি ১৩টি পরিভাষা ব্যাবহারিক পর্যায়ের—প্রয়োগসূত্রে তাদের ব্যাখ্যা রয়েছে পরের এককগুলিতে।

একক ৩৫ ঃ বাংলা ছন্দের ৩টি রীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল এই এককে। সবরকমের বাংলা কবিতার ছন্দ যে শেষপর্যন্ত ৩টি রীতির মধ্যে আবদ্ধ, এ বিষয়ে বিতর্ক না থাকলেও এদের নাম নিয়ে বিতর্ক এখনো টিঁকে আছে। সেই কারণে প্রবোধচন্দ্রের আর অমূল্যধনের দেওয়া চূড়ান্ত নামকরণ-দুটিই প্রতিটি রীতির ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হল, এই এককে দৃষ্টান্তসহ সেসব ব্যাখ্যাও করা হল সেইমতো।

একক ৩৬ ঃ বাংলা কবিতার ছন্দবন্ধ এই এককে আলোচিত। ছন্দের রীতি কবিতার ছন্দের ভেতরকার পরিচয়, তার আলোচনা থাকবে একক-২এ। ছন্দবন্ধ ছন্দের বাইরের পরিচয়। বাংলা কবিতায় ছন্দের এই বাইরের রূপটি কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে একঘেয়ে প্রথার শাসন থেকে মুক্তি পেল, ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠল, তার দুটি-একটি দিক তুলে ধরা হল এই এককে। আলোচনা অবশ্য সীমিত রাখতে হল পয়ার, অমিত্রাক্ষর, আর চতুর্দশপদীর গণ্ডির মধ্যে।

একক ৩৭ ঃ বাংলা কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ এই এককের বিষয়। আগের ৩টি একক থেকে শিক্ষার্থীরা বাংলা কবিতার ছন্দ বিষয়ে যে-তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করলেন, তার সঠিক প্রয়োগ কী করে করতে হয়, কবিতার স্তবকে স্তবকে, প্রথমে তা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তারপর একে একে ৩২টি স্তবক নানা মেজাজের নানারকম কবিতা থেকে আহরণ করে তাদের ছন্দ-বিশ্লেষণ করে দেখানো হল এই এককে। অবশেষে, প্রতিটি এককের সংলগ্ন অনুশীলনীর উত্তর-সংকেত জুড়ে দেওয়া হল এই এককের সঙ্গে।

একক চারটি মনোযোগ আর সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে বাংলা কবিতার ছন্দতত্ত্ব আর প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা তৈরি হতে পারবে, ছন্দবোধ আরো সমৃদ্ধ হতে পারবে, ছন্দ জিজ্ঞাসা বাড়বে এবং বাংলা ছন্দের খুঁটিনাটি নিয়ে জমে-ওঠা বিতর্ক-বিভ্রান্তি থেকে শিক্ষার্থীরা দূরে সরে থাকতে পারবেন।

এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে বিস্তর সাহায্য করছে এই ৩টি বই ঃ

১. প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৮৬)।

২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৮৩)।

৩. পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ (১৯৯৯)।

একক ৩৪ ❐ বাংলা ছন্দের পরিভাষা (প্রাথমিক পর্যায়)

গঠন

৩৪.১ উদ্দেশ্য
৩৪.২ প্রস্তাবনা
৩৪.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ, তার উপাদান
৩৪.৩.১ ছন্দ
৩৪.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি
৩৪.৩.৩ অক্ষর, দল
৩৪.৩.৪ মাত্রা, কলা
৩৪.৩.৫ ছেদ, যতি
৩৪.৪ সারাংশ-১
৩৪.৫ অনুশীলনী-১
৩৪.৬ মূলপাঠ-২ ঃ ছন্দের নানাবিভাগ
৩৪.৬.১ পর্ব, পদ
৩৪.৬.২ পর্বাঙ্গ, উপপর্ব
৩৪.৬.৩ চরণ, পঙ্‌ক্তি
৩৪.৬.৪ স্তবক, শ্লোক
৩৪.৭ সারাংশ-২
৩৪.৮ অনুশীলনী-২
৩৪.৯ মূলপাঠ-৩ ঃ উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব
৩৪.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ
৩৪.৯.২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর
৩৪.৯.৩ তান, মিল
৩৪.১০ সারাংশ-৩
৩৪.১১ অনুশীলনী-৩
৩৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি-৩

৩৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন তাহলে—

- বাংলা কবিতার আশ্রয়ে গড়ে-ওঠা বাংলা ছন্দের তত্ত্ব যে আধুনিক বিজ্ঞানেরই আর-একটি শাখা হয়ে

উঠতে পারে এ-রকম বিশ্বাস আপনার মনে তৈরি হবে।

- বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পথে বাংলা ছন্দতত্ত্বের সামনে যেসব তর্কের বাধা আছে, তা কমিয়ে আনার জন্য যুক্তি তথ্য খুঁজে নিতে পারবেন।
- বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পরিভাষা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩৪.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ নিয়ে আলোচনার অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় ছন্দ নিয়ে বিতর্ক বাড়ানো, বিভ্রান্তি ছড়ানো। এর কারণ, বাংলা ছন্দতত্ত্ব এখনো পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি । সেই ফাঁকে ছন্দ-ভাবুকেরা নতুন নতুন কথা বলেন, নতুন নতুন পরিভাষা তৈরি করে এর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেন। এর ফলে ছন্দ-ভাবনার আয়তন ক্রমশ বাড়ে এ কথা ঠিক, কিন্তু সেই বাড়তে থাকা আয়তনে নতুন শিক্ষার্থীরা দিশাহার হয়ে পড়েন, পথ হারিয়ে ফেলেন। এ সমস্যার সমাধান—ছন্দকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করানো। এটা করতে গেলে আবশ্যক এমন নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা, যা সবার কাছে মান্য হতে পারে, যার প্রয়োগে বাংলা ছন্দের সূত্র এবং তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীর কাছে একটিমাত্র রূপ নিয়ে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, অন্তর্বর্তী কালের ব্যবস্থা হিসেবে ততক্ষণ শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হতে পারেন বাংলা ছন্দচর্চায় অগ্রণী ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। এঁদের তৈরি এবং বাবহার করা অনেকগুলি পরিভাষা বাঙালি ছন্দ-জিজ্ঞাসুর কাছে এখনো শ্রদ্ধেয়। এঁদের ছন্দ-ভাবনা দুটি পৃথক স্রোতে প্রবাহিত হলেও কিছু কিছু পরিভাষা দুজনের কাছেই গ্রাহ্য, অবশ্য অনেকগুলিই রূপে বা অর্থে পৃথক। এর মধ্যে যেসব পরিভাষা তর্ক এড়িয়ে এঁদের শেখানো পদ্ধতিকেই বুঝতে সাহায্য করে, তেমন কয়েকটি নেওয়া হল।

অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগে রয়েছে প্রায় ৫০টি প্রধান পরিভাষা (শাখাপ্রশাখা বাদ দিয়ে)। দুজনের ভাগ প্রায় সমান সমান। এ থেকে বেছে নেওয়া হল ৩৬টি—কেবল অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ১০টি, কেবল প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ১৪টি, আর দুজনের মিলিত প্রয়োগ থেকে ১২টি। পরিভাষাগুলির মধ্যে আবার ২টি ভাগ —২৩টি প্রাথমিক পর্যায়ের, বাকি ১৩টি ব্যাবহারিক পর্যায়ের। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রথম এককের বিষয়। ব্যাবহারিক পর্যায়ের ১৩টি পরিভাষা ব্যাখ্যাসহ সরাসরি ব্যবহার করা হবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় এককে। প্রথম এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করা হল ৩টি পৃথক নামে। প্রথম অংশের নাম 'ছন্দ, তার উপাদান'—এতে আছে ৯টি পরিভাষা, দ্বিতীয় অংশ 'ছন্দের নানাবিভাগ'—এতে রয়েছে ৮টি, তৃতীয় অংশ 'উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব'-এ আছে বাকি ৬টি পরিভাষার পরিচয়।

নির্বাচিত পরিভাষার তালিকাটি এইরকম (মোট ৩৬টি)—

১। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি ঃ

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৯টি—দল, কলা, উপপর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি, শ্লোক, প্রস্বর, সংশ্লেষ, বিশ্লেষ।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৬টি—অক্ষর, ছেদ, পর্বাঙ্গ, চরণ, শ্বাসাঘাত, তান।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৮টি—ছন্দ, বর্ণ, ধ্বনি, মাত্রা, যতি, পর্ব, স্তবক, মিল।

২। **ব্যাবহারিক পর্যায়ের ১৩টি ঃ**

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৫টি—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত, প্রবহমানতা, মুক্তক।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৪টি—শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান, চতুর্দশপদী।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৪টি—ছন্দরীতি, ছন্দবন্ধ, পয়ার, অমিত্রাক্ষর।

৩৪.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ, তার উপাদান

ধরুন, আপনি একটি পাকা বাড়ি তৈরির কথা ভাবনেছন। এর জন্য আবশ্যক চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, লোহা—এ সব মাল-মশলা বা উপাদান। সঠিক অনুপাতে আর সঠিক পরিমাণে এদের মিশ্রণ আর সঠিক কৌশলে এদের প্রয়োগ ঘটলেই ক্রমশ গড়ে উঠবে একটি মজবুত বাড়ি। তেমনি, কবিতা লেখার উপাদান **বর্ণ,** কবিতা উচ্চারণের উপাদান **ধ্বনি, অক্ষর** বা **দল**। কবিতার ছন্দ নিয়ে যখন ভাবব, তখন কবিতার উপাদান হয়ে ওঠে ছন্দেরও উপাদান। কবিতার উপাদান ছাড়াও ছন্দ-গঠনের জন্য আবশ্যক হয় ছন্দের নিজস্ব আরো কয়েকটি উপাদান—**মাত্রা** বা **কলা** আর **যতি,** প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে **ছেদ**-এর ভূমিকা। সেই কারণে, ছন্দ আর তার উপাদানগুলির পরিভাষা হবে প্রথম এককের মূলপাঠের প্রথম অংশের বিষয়। মূলত একই উপাদানকে নির্দেশ করে—এ রকম ১টি করে পরিভাষা বেছে নেওয়া হবে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে। প্রয়োগের দিক থেকে প্রতি জোড়া পরিভাষার মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় পার্থক্য, তা আপনাদের দেখানো হবে দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে। **ছন্দ**-ই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়, অতএব শুরুতেই একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পরিভাষাটি বুঝে নিন। তারপর ক্রমশ জেনে নিন ছন্দের ৮টি উপাদানের পরিভাষা আর তাদের পরিচয়।

৩৪.৩.১ ছন্দ

'ছন্দ' কাকে বলব, এই নিয়ে দুজন ছান্দসিকের দু-রকমের কথা শোনা যাক।

১। 'যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়' তাকে 'ছন্দ' বলতে চান অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২। 'উচ্চারণ আর বিরামের সুশৃঙ্খল ও আবর্তনময় বিন্যাসকে 'ছন্দ' বলতে চান পবিত্র সরকার।

প্রথম কথাটির অর্থ—যেভাবে কথার পর কথা সাজালে শুনতে ভালো লাগে, তারই নাম ছন্দ। অর্থাৎ, কথা নয়, কথা সাজানোও নয়, ছন্দ আসলে কথা সাজানোর এমন একটি কৌশল বা শৃঙ্খলা যার গুণে কথা মধুর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ—কথার উচ্চারণ, একটু থামা, আবার উচ্চারণ, আবার থামা—কথাগুলি আলাদা হলেও কথার উচ্চারণ আর বিরাম যদি পরপর একইভাবে বিশেষ একটি নিয়মে বা শৃঙ্খলায় ঘুরে ঘুরে আসে, তাহলে কথার এই বিশেষ নিয়মে ঘুরে-ঘুরে-আসা-টাই হবে ছন্দ।

তাহলে দেখছি, কেউ বলেন—কথা সাজানোর শৃঙ্খলাটাই ছন্দ, আবার কেউ বলতে চান—শৃঙ্খলার সঙ্গে কথা সাজানোটাই (বিন্যাসটাই) ছন্দ। মুখের ছন্দ বললে বুঝি কেবল মুখের গড়নটুকু, চলার ছন্দ বললে বোঝায় চলার ভঙ্গিটাই। কিন্তু, কবিতার ছন্দ বলতে বুঝব কথা সাজানো আর সাজানোর শৃঙ্খলা একই সঙ্গে।

কথার এই ছন্দ বক্তৃতায় থাকতে পারে, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের গদ্যে থাকতে পারে, কবিতায় তো থাকেই। আমরা যে ছন্দ নিয়ে এ পর্যায়ের আলোচনা করব, তা কেবল কবিতারই ছন্দ—আরো নির্দিষ্ট করে বলতে তা হবে কেবল বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

এবারে বাংলা কবিতার একটি অংশ পড়ে পড়ে বুঝে নিই, কথার উচ্চারণ আর বিরামের এই খেলাটি কী রকম—

নৌকা ফি সন । ডুবিছে ভীষণ । রেলে কলিশন । হয় ॥
হাঁটিতে সর্প । কুক্‌কুর আর । গাড়ি-চাপা-পড়া । ভয় ॥

কবি দ্বিজেন্দ্রনাল রায়ের লেখা 'হাসির গান' কাব্যের 'নন্দলাল' কবিতা থেকে নেওয়া এই দুটি ছত্রের প্রথম ছত্রটি পড়তে পড়তে ৪-বার থামলেন। 'নৌকা ফি সন' কথাটুকু উচ্চারণ করে একটু থামা, তারপর 'ডুবিছে ভীষণ' উচ্চারণ করে আর একটু থামা, এরপর 'রেলে কলিশন' উচ্চারণ ও আবার থামা, এবং সবশেষে ছোট্ট কথা 'হয়' উচ্চারণের পর একটু বেহশি থামা (।- চিহ্নের জায়গায় কম থামা আর ॥-চিহ্নের জায়গায় বেশি থামা)। এবারে দ্বিতীয় ছত্রটি পড়ুন। লক্ষ করুন, একইভাবে 'হাঁটিতে সর্প' 'কুক্‌কুর আর' 'গাড়ি-চাপা-পড়া'—এই ৩টি কথার উচ্চারণের পর ৩ বার একটুখানি করে থামা, শেষ কথা ছোট্ট 'ভয়'-এর উচ্চারণ করেই পুরোপুরি থামা।

এখন আন্দাজ করুন এক-একটি কথার উচ্চারণের মাপ। উচ্চারণ শুনতে শুনতে কানে খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে—প্রথম ছত্রের প্রথম ৩টি অংশ (নৌকা ফি সন, ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন) সমান মাপের, শেষ অংশটি (হয়) মাপে বেশ ছোটো। একইভাবে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম ৩টি অংশ (হাঁটিতে সর্প, কুককুর আর, গাড়ি-চাপা-পড়া) পাশাপাশি সমান মাপের, শেষ অংশটি ('ভয়') ছোটো। এবারে ওপরে-নীচে মিলিয়ে দেখুন, প্রথম ছত্রের অংশগুলি পরপর নীচের ছত্রের অংশগুলির সঙ্গে সমান মাপের ('নৌকা ফি সন' আর 'হাঁটিতে সর্প' , 'ডুবিছে ভীষণ' আর 'কুক্‌কুর আর', 'রেলে কলিশন' আর 'গাড়ি-চাপা-পড়া', 'হয়' আর 'ভয়')। মাপগুলি অবশ্যই ইঞ্চি-সেন্টিমিটার বা মিনিট-সেকেন্ড ধরে নয়, কবিতার উচ্চারণ শুনে শুনে কান অভ্যস্ত হয়ে উঠলে সহজেই আমাদের বোধে তখন তৈরি হয়ে যায় কথার মাপের আন্দাজ।

বাংলা কবিতার উদ্ধৃত ছত্র দুটিতে আমরা এতক্ষণ কী দেখলাম ? দেখা গেল, এখানে ৮টি অংশ এমনভাবে সমাজানো যে প্রতিটি ছত্রেই সমান মাপের এক-একটি অংশের উচ্চারণের পর একটি করে ছোটো মাপের বিরাম পর পর ৩-বার একইভাবে (উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম) ঘুরে ঘুরে আসে, শেষে ছোটো মাপের একটি অংশের উচ্চারণের পর একটি বড়ো মাপের বিরাম। উচ্চারণ আর বিরামের এই ঘুরে ঘুরে আসা দুটি ছত্রে একইভাবে ঘটছে। কবি এমনি করে সাজিয়েছেন কথার উচ্চারণ আর বিরাম—একইভাবে পরপর ঘুরে ঘুরে আসার শৃঙ্খলায়। এই বিন্যাস আর শৃঙ্খলার গুণেই ছত্র দুটির অন্তর্গত কথাগুলি মধুর হয়ে শ্রোতার কানে বাজতে থাকে। তখনই তৈরি হয়ে যায় ছন্দ—কবিতার কথা শুনতে ভালোলাগার জাদু।

৩৪.৩.২. বর্ণ, ধ্বনি

আমরা যা উচ্চারণ করি, তা লিখতে গেলেই চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। এই চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। অর্থাৎ, ধ্বনির লিখিত রূপকেই বর্ণ বলে। কবিকেও কবিতা লিখতে হয় চিহ্নের পর চিহ্ন—বর্ণের পর বর্ণ সাজিয়ে। অতএব, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস। যিনি কবিতা পড়েন, তিনি সাজানো বর্ণগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেই সেগুলি একটার পর একটা উচ্চারণ করতে থাকেন, ক্রমে ক্রমে গোটা কবিতাই পড়া হয়ে যায়।

তাহলে দেখা গেল, কবি তাঁর কবিতা লেখেন বর্ণ বিন্যাস করে, পাঠক সেই কবিতা পড়েন বর্ণের পর বর্ণ উচ্চারণ করে। বর্ণের এই উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। অতএব, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। পাঠক বর্ণ চোখে দেখে উচ্চারণ করেন, স্রোতা সেই উচ্চারণ থেকে ধ্বনি শুনতে থাকেন।

অর্থাৎ, কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, ছাপাও হয় বর্ণ দিয়ে। কিন্তু, যখন তা পড়া হয়, তখন সেই কবিতা ধ্বনির সমষ্টি হয়ে স্রোতার কানে পৌঁছয়। সেই ধ্বনির বিন্যাস থেকেই তৈরি হয়ে যায় কবিতার ছন্দ, এবং তা ধরা পড়ে শ্রোতার কানে।

'ধ্বনিবিজ্ঞান'-এর পাঠ থেকে ইতোমধ্যেই আপনারা জেনে নিয়েছেন বাংলা বর্ণ আর ধ্বনির কথা, ব্যবহারের দিক থেকে তাদের পার্থক্যের কথা (FBG 2 ঃ একক ৭ঃ পৃ. ৬-৯)। বাংলায় আমরা ব্যবহার করি ১১টি স্বরবর্ণ ('৯' ব্যবহার করি না), কিন্তু উচ্চারণ করি ৭টি স্বরধ্বনি (অ আ ই উ অ্যা এ ও) ; ব্যবহার করি ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণ করি মাত্র ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি। তার অর্থ, আমাদের কবিরাও বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করে থাকেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে. ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ (মোট ৫১টি)। কিন্তু, পাঠকের উচ্চারণে আর স্রোতার কানে ধরা পড়ে ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি (মোট ৩৬টি)। বাংলা কবিতার ছন্দ তৈরি হয় এই ৩৬টি ধ্বনির নানারকম বিন্যাস থেকে। অতএব, ছন্দের হিসেব করতে গিয়ে আমরা কানের সাক্ষ্যই মানব, চোখের সাক্ষ্য (অর্থাৎ বর্ণ, বানান এসব) যেন বিভ্রান্ত না করে—সেদিকে সতর্ক থাকব।

এবারে শুনি বর্ণ আর ধ্বনি নিয়ে ছান্দসিকেরা কী কী বলেন। বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, আর ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ—এ কথা প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দুজনেই মানেন। কিন্তু, 'ধ্বনি' বোঝাতে দুজনেই অনেক সময় 'বর্ণ' কথাটি প্রয়োগ করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র বর্ণকে বা ধ্বনিকে সরাসরি স্বর-ব্যঞ্জনে ভাগ করেননি। তাঁর বর্ণ-বিভাগ এই রকম ঃ বাংলা বর্ণের সব মিলিটে ৪টি শ্রেণি —মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুদ্ধস্বর, আর ব্যঞ্জন। এটি আসলে তাঁর ধ্বনি বিভাগও, 'বর্ণ' কথাটির বদলে 'ধ্বনি' বসালেই হল। মুক্তস্বর ছ-টি—অ আ ই উ এ ও। যে কোনো মুক্তস্বর বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে, দীর্ঘও হতে পারে। অন্য স্বরের সহায়তা ছাড়াই এদের উচ্চারণ সম্ভব। ই উ এ ও—এই চারটি স্বর কখনও কখনও পরনির্ভর হয়ে পড়ে। তখনই তারা খণ্ডস্বর। তখন তাদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়। মুক্ত 'আ'-এর পাশে খণ্ড 'ই' আশ্রয় নিলেই তৈরি হয় 'আ-ই' (খাই, নাই)। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তস্বরের দরজাটি রুদ্ধ হয়ে যায়, তৈরি হয় রুদ্ধস্বর 'আই'। রুদ্ধস্বর হচ্ছে একটি মুক্তস্বর আর একটি খণ্ডস্বরের যৌথ উচ্চারণ। এমনি করে ৬টি মুক্তস্বর আর ৪টি খণ্ডস্বরের নানারকম মিলনে তৈরি হয় অন্ততপক্ষে ১৬টি রুদ্ধস্বর—অই (কই, সই), অউ (বউ) আও (যাও, খাও), ইউ (মিউ), উই (দুই), এই (সেই), ওএ (শোয়) ইত্যাদি। এই ১৬টি রুদ্ধস্বরধ্বনির মধ্যে কেবলমাত্র 'অই' আর 'অউ' ধ্বনির জন্য

বরাদ্দ আছে 'ঐ' আর 'ঔ' বর্ণ। রইল বাকি ব্যঞ্জন। এদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়—হয় আগে মুক্তস্বর পরে ব্যঞ্জন (অপ্, আখ্, ইট্, উট্), না হয় আগে ব্যঞ্জন পরে মুক্তস্বর (প, খা, টি, টু), অথবা আগে-পরে দুদিকেই মুক্তস্বর মাঝখানে ব্যঞ্জন (আদা = আ-দ্-আ, ইনি = ই-ন্-ই)। ব্যঞ্জন যখন উচ্চারণ করব, তখন তা হবে ব্যঞ্জনধ্বনি, আর যখন লিখবে, তখন তার নাম ব্যঞ্জনবর্ণ।

অমূল্যধনের বিচারে 'বর্ণ' হচ্ছে 'লিখিত হরফ'। বর্ণকে বা ধ্বনিক তিনি অবশ্য পরোক্ষে স্বর আর ব্যঞ্জনেই ভাগ করেছেন। স্বরধ্বনি তাঁর কাছে দুটি জাতিতে বিভক্ত—মৌলিক আর যৌগিক। অ আ ই উ অ্যা এ ও—এই ৭টি মৌলিক স্বর, ওই আই আও ইত্যাদি যৌগিক স্বর। দেখা গেল, প্রবোধচন্দ্রের ৬টি মুক্তস্বরই অমূল্যধনের কাছে মৌলিক স্বরধ্বনি, অমূল্যধনের 'অ্যা'-স্বরধ্বনিটি কেবল প্রবোধচন্দ্রের তালিকার বাইরে। আর, প্রবোধচন্দ্রের রুদ্ধস্বরের সঙ্গেও অমূল্যধনের যৌগিক স্বরের পার্থক্য খুব বেশি নেই।

৩৪.৩.৩ অক্ষর, দল

'ধ্বনিবিজ্ঞান'-এর পাঠ থেকে আপনারা বাগ্‌যন্ত্র আর ধ্বনির কথা আগেই জেনেছিলেন (FBG : একক ৭ পৃ. ৪-৫), ধ্বনির কথা একটু আগে আরো বিশদভাবে জানলেন। আমাদের এক একটা ধ্বনির উচ্চারণ আসলে বাগ্‌যন্ত্রের নানা অংশের মিলিত চেষ্টার ফল। তবে ধ্বনির উচ্চারণ সাধারণত একটা একটা করে হয় না। একটানা কথা বলতে গেলে ধ্বনিগুলি পৃথকভাবে আমাদের কানে ধরা পড়ে না। বাগ্‌যন্ত্রের অংশগুলির একেবারের মিলিত চেষ্টার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২-টি-৩টি ধ্বনির একসঙ্গে উচ্চারণ হয়ে যায়, কখনো-সখনো একটি ধ্বনিরই উচ্চারণ হয়। একেবারের চেষ্টার যে-কটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, ইংরেজিতে তার নাম Syllable (beau-ti-ful), বাংলায় একে কেউ বলেন **অক্ষর,** কেউ বলেন **দল।**

একে **অক্ষর** বলেন অমূল্যধন। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি এই রকম ঃ 'বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর।' ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে অক্ষর হচ্ছে বাক্যের অণু। একটি শব্দ ভাঙলে তা থেকে পাওয়া যাবে কয়েকটি অক্ষর। 'জননী' শব্দে অক্ষর আছে ৩টি—জ-ন-নী, 'শরৎ' শব্দে আছে ২টি অক্ষর—শ-রৎ। 'গুঞ্জন' শব্দেও ২টি অক্ষর—গুন্-জন্। এই ৩টি শব্দ ভেঙে যেসব টুকরো পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটিতেই আছে দুটি বা তিনটি করে ধ্বনি এবং তার উচ্চারণ হচ্ছে একঝোঁকে (জ = জ-অ, ন = ন্-অ, নী = ন্-ই, শ = শ্-অ, রৎ = র্-অ-ৎ, গুন্ = গ্-উ-ন্, জন্ = জ্-অ-ন্)। এই ৭টি অক্ষরের মধ্যে ২টি শ্রেণি লক্ষ্য করুন। জ-ন-নী-শ—এদের শেষ ধ্বনিটি স্বরধ্বনি (অ-অ-ই-অ), রৎ-গুন্-জন্—এদের শেষে আছে ব্যঞ্জনধ্বনি (ৎ-ন্-ন্)। অমূল্যধন শ্রেণিদুটির নাম দিলেন 'স্বরান্ত' (শেষে স্বরধ্বনি আছে বলে) আর 'হলন্ত' (শেষে যার ব্যঞ্জনধ্বনি)। তবে অক্ষরের শেষধ্বনি যৌগিক স্বর হলেও তাকে হলন্ত-ই বলা হবে। যেমন 'ভাসাই' = ভাসাই—এখানে 'ভা'-র শেষধ্বনি মৌলিক স্বর (আ) বলে এটি **স্বরান্ত,** আর 'সাই'-এর শেষধ্বনি যৌগিক স্বর (আই) বলে এটি **হলন্ত**। অতএব, স্বরান্ত অক্ষরের শেষধ্বনি কখনো ব্যঞ্জন, কখনো যৌগিক স্বর।

প্রবোধচন্দ্র Syllable-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অক্ষর' কথাটির বদলে 'দল' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে দল হচ্ছে 'বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড'। 'দল' 'ছন্দ' আর 'ছান্দসিক'

শব্দতিনটি ভেঙে তিনি দেখালেন ১টি (দল্), ২টি (ছন্-দ) আর ৩টি (ছান্-দ-সিক) দল। প্রতিটি দলে থাকবে একটিমাত্র স্বরধ্বনি (মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক), ব্যঞ্জন থাক বা না-থাক। 'অসি', 'আতা', 'ইতি'—এই ৩টি শব্দের প্রথমেই আছে একটিমাত্র মুক্তস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (অ-আ-ই), 'ঐকান্তিক' 'ঔদরিক' 'আইবুড়ো'—এই ৩টি শব্দের প্রথমে রয়েছে একটিমাত্র রুদ্ধস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (ঐ-ঔ-আই) 'অগ্-নি', 'আল্-তা', 'ইন্-দু' শব্দের প্রথম দলে (অগ্-আল্-ইন্) রয়েছে ১টি মুক্ত স্বরধ্বনি (অ-আ-ই) আর একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (গ্-ল্-ন্)। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম **মুক্তদল** ; আর, যে দলের শেষে রুদ্ধস্বর (বৈ = ব্-ঐ, গৌ = গ্-ঔ, সাই = স্-আই) বা ব্যঞ্জনধ্বনি (অ-গ্, আ-ল্, ই-ন্), তার নাম **রুদ্ধদল**।

লক্ষ্য করুন, অমূল্যধনের 'অক্ষর' আর প্রবোধচন্দ্রের 'দল' একই। অমূল্যধনের 'স্বরান্ত অক্ষর'-ই প্রবোধচন্দ্রের 'মুক্তদল', আর অমুল্যধনের 'হলন্ত অক্ষর' প্রবোধচন্দ্রের কাছে 'রুদ্ধদল'। কাজের সুবিধার জন্য আমরা 'দল' কথাটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, এবং সাধ্যমতো সব রুদ্ধদলই মোটা হরফে দেখানো হবে।

৩৪.৩.৪. মাত্রা, কলা

১. দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে

২. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসী ঘুম দিয়ে যাও

৩. বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান

৪. ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে

৫. জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা

৫টি কবিতা থেকে ৫টি ছত্র নেওয়া হল। প্রথম ছত্রটি উচ্চারণ করতে থাকুন। উচ্চারণ হবে এইরকম—'দু-ন্দুভি বেজে ওঠে ডি-ম্ ডি-ম্ রবে'। অর্থাৎ,স 'দুন্' 'ডিম্' 'ডিম'—এই ৩টি হলন্ত অক্ষর বা রুদ্ধদলের উচ্চারণ হবে টেনে টেনে, আর দু ভি বে জে ও ঠৈ র বে — এই ৮টি স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তদলের উচ্চারণ হবে কেটে কেটে। এবার দ্বিতীয় ছত্রটি উচ্চারণ করুন। একই রুদ্ধদল 'ঘুম্'-এর দুবার উচ্চারণ হচ্ছে দুভাবে—প্রথম 'ঘুম্'-এর উচ্চারণ পা ড়া নি মুক্তদল তিনটির মতোই কেটে কেটে—ঘুম্-পা-ড়া-নি, দ্বিতীয় 'ঘুম্'-এর উচ্চারণ 'ঘু-ম্' বা 'ঘুউম্'—অর্থাৎ খানিকটা টেনে। তৃতীয় ছত্রে দলগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করুন বিষ-টি প-ড়ে টা-পুর্ টু-পুর্ ন-দেয়্ এ-ল বান্—১৩টি দলই উচ্চারিত হল একইভাবে কেটে কেটে, এর মধ্যে বিষ্ পুর্ পুর্ দেয়্ বান্—এই ৫টি রুদ্ধদল, বাকি ৮টি মুক্তদল। চতুর্থ ছত্রে দেখুন ঃ নে-র্ মে-ঘ্ দলদুটি রুদ্ধদল, উচ্চারণ টেনে টেনে ; পুন্ অন্ দলদুটিও রুদ্ধদল, কিন্তু উচ্চারণ কেটে কেটে (পুন্-জ, অন্-ধ) ; প্রতিটি মুক্তদলেরই কাটা-কাটা উচ্চারণ। পঞ্চম ছত্রে একমাত্র রুদ্ধদল 'ভাগ্' বাদে আর প্রতিটি দলই মুক্তদল (বা স্বরান্ত অক্ষর)। কিন্তু, ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে দেখুন—না হে ভা ধা তা মুক্তদল হলেও তাদের উচ্চারণ টেনে টেনে, বাকি মুক্তদলগুলির উচ্চারণ কেটে কেটে। 'ভাগ্' অবশ্য রুদ্ধদল (ভা-গ্ গ) এবং তার উচ্চারণ টেনে।

দেখা গেল, উদ্ধৃত ৫টি ছত্রে সব শুদ্ধ ১৬টি রুদ্ধদল (বা হলন্ত অক্ষর), এর মধ্যে ৯টির উচ্চারণ কেটে কেটে, ৭টির উচ্চারণ টেনে টেনে ; অন্যদিকে সর্বমোট ৫৮টি মুক্তদলের (বা স্বরান্ত অক্ষরের) মধ্যে ৫৩টির উচ্চারণ কেটে কেটে, মাত্র ৫টির উচ্চারণ একটুখানি টেনে। এই হিসেব থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, মুক্তদলের সাধারণ কাটা-কাটা উচ্চারণ, কিন্তু রুদ্ধদলের উচ্চারণ দুভাবেই হতে পারে। কোন্ দলের উচ্চারণ কীরকম হবে, সে কথায় আমরা পরে আসব। তার আগে বুঝে নিই, এই দু-রকমের উচ্চারণে আসল তফাত-টা কী।

প্রথম ছত্রের 'দুন্দুভি' কথাটি আর একবার উচ্চারণ করে দেখুন। এর ৩টি দলের উচ্চারণ দু-ন্ দু ভি—'দু-ন্' এর এই টানা উচ্চারণে যেটুকু সময় লাগে, 'দু' বা 'ভি'-র উচ্চারণে সময় লাগে তার চেয়ে কম। দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম 'ঘুম'-এর কাটা-কাটা উচ্চারণ যেন একটু আচমকা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তুলনায় দ্বিতীয় 'ঘু-ম্'-এর উচ্চারণ হয় একটু টেনে, খানিকটা বাড়তি সময় নিয়ে। দল মুক্ত হোক বা রুদ্ধ হোক, কেটে কেটে উচ্চারণ সব ক্ষেত্রেই সব কম সময় নিয়ে, আর টেনে টেনে উচ্চারণ হলেই সময়ের ব্যয় হবে একটু বেশি। দলের উচ্চারণ-কালের এই কম-বেশিকে একটা হিসেবের মধ্যে ধরার জন্য এক ধরনের একক (Unit) তো চাই অনেকটা সেকেন্ড মিনিটের মতো। ছন্দ-বিজ্ঞানে এই এককই হল মাত্রা। এর অর্থ পরিমাণ বা মাপ, ছন্দেরর আলোচনায় এর অর্থ দল-উচ্চারণের মাপ। দলের উচ্চারণ যেখানে কাটা-কাটা, সময়ের ব্যয় সেখানে তুলনায় কম—দল সেখানে ১-মাত্রার। আর দলের উচ্চারণ সেখানে টেনে টেনে, তুলনায় একটু বেশি সময় নিয়ে,—সেখানে দল ২-মাত্রার।

এবারে চলুন ছান্দসিকদের দরবারে। অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনিপরিমাণ। 'মাত্রা' নিয়ে দুই শীর্ষ ছান্দসিকের বিতর্ক যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন বিতর্ক এড়িয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার 'মাত্রা'-কে দলের 'ওজন' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। আমরা অবশ্য খানিকটা অমূল্যধন-ঘেঁষা সময়ের মাপের দিকেই ঝুঁকছি, তবে সেই সঙ্গে দলের উচ্চারণের চরিত্রটিও মাথায় রাখছি (কেটে-কেটে উচ্চারণ আর টেনে-টেনে উচ্চারণ)। কেটে-কেটে উচ্চারণে সময় কম লাগে, টেনে-টেনে উচ্চারণে সময় লাগে বেশি।

একটু আগে বলেছিলাম, মুক্তদলের উচ্চারণ সাধারণত কাটা-কাটা, আর রুদ্ধদলের উচ্চারণ কেটে কেটেও হয়, টেনে টেনেও হয়। এ কথার অর্থ—মুক্তদল সাধারণ ১-মাত্রার, আর রুদ্ধদল ১-মাত্রার বা ২-মাত্রার। ঠিক কোন্ রুদ্ধদলে ১-মাত্রা বা ২-মাত্রা, অথবা কোন্ অবস্থায় মুক্তদলে ২-মাত্রা, এসব নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। তবে, কোন্ অক্ষরে বা দলে কত মাত্রা, এ নিয়ে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্র কার্যত কোনও বিরোধ নেই।

'মাত্রা'র কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই যে ৫টি ছত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তর্গত দলগুলি পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি এবং প্রতিটি দলের মাথায় মাত্রা-চিহ্ন বসিয়ে দিচ্ছি (যে-দলের উচ্চারণ ১-মাত্রায় তার মাথায় ১, যে-দলের উচ্চারণ ২-মাত্রায় তার মাথায় ২)। দলের ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে (হয় কেটে কেটে না-হয় টেনে

টেনে) তার মাথায় বসানো মাত্রা সংখ্যার সঙ্গো মিলিয়ে ছত্রগুলি একটা-একটা করে পড়তে চেষ্টা করুন।

	২	১	১	১	১	১	১	২	২	১	১	
১.	দু-ন্	দু	ভি	বে	জে	ও	ঠে	ডি-ম্	ডি-ম্	র	বে	

	১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১
২.	ঘুম্	পা	ড়া	নি	মা	সী	পি	সী	ঘু-ম্	দি	য়ে	যাও

	১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১	১
৩.	বিষ্	টি	প	ড়ে	টা	পুর্	টু	পুর্	ন	দেয়	এ	ল	বান্

	১	১	২	১	১	২	১	১	১	১
৪.	ঈ	শা	নে-র্	পুন্	জ	মে-ঘ	অন্	ধ	বে	গে
					১	১	১	১	১	১
					ধে	য়ে	চ	লে	আ	সে

	১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১		১	১	২
৫.	জ	ন	গ	ণ	ম	ন	অ	ধি	না	য়	ক		জ	য়	হে
					২	১	১		২	১			১	২	২
					ভা	র	ত		ভা-গ্	গ			বি	ধা	তা

চেনার সুবিধার জন্য রুদ্ধদলগুলি মোটা হরফে ছেপে দেওয়া হল।

এবারে লক্ষ্য করুন—

প্রথম ছত্রে প্রতিটি মুক্ত দলে ১-মাত্রা, প্রতিটি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

দ্বিতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ১টি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

তৃতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, প্রতিটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

চতুর্থ ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ২টি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

পঞ্চম ছত্রে প্রতিটি হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

'মাত্রা'র আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, মুক্তদল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১-মাত্রার, কম ক্ষেত্রেই ২-মাত্রার। রুদ্ধদল ১-মাত্রার হতে পারে, ২-মাত্রারও হতে পারে। ১-মাত্রার দলে হ্রস্ব উচ্চারণ, ২-মাত্রর দলে দীর্ঘ

উচ্চারণ—সে দল মুক্ত হোক বা রুদ্ধ রোগ। অর্থাৎ, মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, দুটি-একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ হতে পারে, রুদ্ধদল হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিই, উচ্চারণ করে বুঝে নিন—

	১ ১	১ ১	২	২	১ ১	১ ১	২
১.	চলি	চলি	পা	পা	টলি	টলি	যায়্

	১ ১ ১ ১	১ ১ ২	১ ১ ২	১ ১
২.	ভালোমন্দ	দুক্খসুখ্	অন্ধকার্	আলো

প্রথম দৃষ্টান্তে চ লি চ লি ট লি ট লি—প্রতিটি মুক্তদল হ্রস্ব, কিন্তু পা পা —দুটি মুক্তদল দীর্ঘ। আবার, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মন্ দুক্ অন্—তিনটি রুদ্ধদল হ্রস্ব, কিন্তু সুখ কার—দুটি রুদ্ধদলই দীর্ঘ।

দল হ্রস্ব হয় তখনই, যখন তার ভেতরকার ধ্বনি একটুখানি কুঁচকে যায়। আর, দলের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ ধ্বনিগুলির আয়তনে বেড়ে যাওয়া। এইরকম একটি কোঁচকানো বা হ্রস্ব দলের সমপরিমাণ ধ্বনির নাম প্রবোধচন্দ্র দিয়েছেন কলা। অর্থাৎ একটি হ্রস্বদলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, একটি দীর্ঘদলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। ওপরের দৃষ্টান্ত-দুটিতে ১-মাত্রার প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, মাত্রা আর কলার সম্পর্কটা দাঁড়াল এই রকম—প্রতিটি হ্রস্ব দলে থাকে প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ১-কলা, অমূল্যধনের হিসেবে ১-মাত্রা ; প্রতি দীর্ঘ দলে এঁদের হিসেবে ২-কলা বা ২-মাত্রা। অর্থাৎ, মাত্রা আর কলা কার্যত একই।

৩৪.৩.৫ ছেদ, যতি

গোড়ার দিকে ছন্দের সংজ্ঞা নিয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের কথাটি আর একবার শুনে নিন। তাতে আছে 'উচ্চারণ' আর 'বিরাম'-এর উল্লেখ। এই 'বিরাম' বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে থামাটাই কখনো ছেদ, কখনো যতি। গদ্য-পদ্য যা-ই হোক, পড়তে পড়তে বা উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে কম বা বেশি থামতে হয় প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথম কারণ—না থামলে কথার অর্থ শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, দ্বিতীয় কারণ—না-থামলে দমে কুলোয় না, তৃতীয় কারণ—থামলে কথা শুনতে ভালো লাগে। প্রথম আর দ্বিতীয় কারণ মূলত গদ্য পড়ার ক্ষেত্রে, কখনো কখনো পদ্যের ক্ষেত্রে খাটে, তৃতীয় কারণটি খাটে মূলত পদ্য পড়ার ক্ষেত্রে। প্রথম দুটি কারণে যে-থামা, তার নাম ছেদ, তৃতীয় কারণে থামার নাম যতি। তার মানে, গদ্য পড়তে পড়তে অর্থ-বুঝে-নেওয়া আর দম-ঠিক-রাখার দায়িত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে অনিয়মিত থামা—এর নাম **ছেদ**, আর কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা—এর নাম **যতি**।

নীচের গদ্যটুকু পড়ুন—

'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বানপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।'

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' থেকে নেওয়া এই গদ্য অংশ এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা কতটা কষ্টসাধ্য, তা একটিবার পরীক্ষা করে দেখুন। আর, তেমন পড়ায় এ অংশে প্রস্রবণগিরির যে বর্ণনা রয়েছে, তাও স্পষ্ট হবে না। সেই কারণে লেখক নিজেই দাঁড়ি-সেমিকোলন-কমা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—কোথায় কতটুকু থামতে হবে। কমা কম থামার চিহ্ন আর দাঁড়ি সেমিকোলন পুরো থামার চিহ্ন। এই থামাটাই ছেদ। ছেদচিহ্নগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায় ছেদগুলি কতটা অনিয়মিত। ছেদের দ্বারা বিভক্ত ৭টি অংশ মাপে অনেকখানি ছোটো-বড়ো।

এবারে নীচের পদ্যটুকু পড়ুন—

দিনের আলো | নিবে এল | সূয্যি ডোবে | ডোবে || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | চাঁদের লোভে | লোভে || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

প্রথম ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম-থামা, শেষে পুরো থামা।

দ্বিতীয় ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম থামা, শেষে পুরো থামা।

প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ৩-বার করে থামার ফলে ৪টি করে টুকরো হল। প্রথম ৩টি টুকরো সমান মাপের (প্রতিটি ৪-মাত্রার), শেষেরটি ছোট (২-মাত্রার)। অর্থাৎ, এক-একটি ছত্র উচ্চারণ করার ফাঁকে ফাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে (এখানে ৪-মাত্রার পরে) নিয়মিত থামছি, শেষে আরো ২-মাত্রার উচ্চারণের পর পুরোপুরি থামছি। এই থামাটাই যতি। যতির পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন, শুনতে ভালোলাগার আকাঙ্ক্ষা। অতএব, ছন্দ বুঝতে গেলে 'যতি'-কেই নিখুঁতভাবে চিনতে হবে, 'ছেদ'-কে তোয়াক্কা না করলেও চলবে।

অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—অর্ধযতি আর পূর্ণযতি। এক-একটি ছত্রের মাঝখানে একদাঁড়ি (।)-চিহ্ন দিয়ে দেখানো কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি, জোড়াদাঁড়ি (।।)-চিহ্নে দেখানো পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি। প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির ১০টি নাম—অনুযতি বা দলযতি, উপযতি বা উপপর্বযতি, লঘুযতি বা পর্বযতি, অর্ধযতি বা পদযতি, পূর্ণযতি বা পঙ্‌ক্তিযতি। এর মধ্যে ৩টি নাম আমাদের কাজে ব্যবহার করা হবে—পর্বযতি (অমূল্যধনের অর্ধযতি), পদযতি আর পঙ্‌ক্তিযতি (পূর্ণযতি)। এদের পরিচয় ক্রমশ জানবেন।

৩৪. ৪ সারাংশ-১

ছন্দ ঃ বাংলা কবিতার পদ্যে কথার পর কথা এমনভাবে সাজানো থাকে যে, কথার উচ্চারণ আর বিরাম পর পর একইভাবে ঘুরে ঘুরে আসে। এই কথা-সাজানো আর সাজানোর কৌশল বা শৃঙ্খলা—এই নিয়েই তৈরি হয় বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

বর্ণ, ধ্বনি ঃ লিখতে গিয়ে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়, তার নাম হরফ বা বর্ণ। আর, বর্ণের উচ্চারিত রূপের নাম ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। অর্থাৎ, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, পড়া হয় ধ্বনি দিয়ে।

বাংলা কবিতায় কবি ব্যবহার করেন ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, পাঠক উচ্চারণ করেন ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রবোধচন্দ্র বাংলা বর্ণ আর ধ্বনিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুদ্ধস্বর আর ব্যঞ্জন। অমূল্যধন ভাগ করেছেন ২টি শ্রেণিতে—স্বর আর ব্যঞ্জন, স্বরের ২টি ভাগ—মৌলিক আর যৌগিক। প্রবোধচন্দ্রের মুক্তস্বর আর অমূল্যধনের মৌলিক স্বর প্রায় এক, রুদ্ধস্বর আর যৌগিক স্বরেও তেমন পার্থক্য নেই।

অক্ষর, দল ঃ বাগ্‌যন্ত্রের একেবারের চেষ্টায় যেকটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, অমূল্যধন তাকে বলেন 'অক্ষর', প্রবোধচন্দ্র বলেন 'দল'। যেসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তার নাম অমূল্যধনের ভাষায় 'স্বরান্ত অক্ষর'। অক্ষরের শেষধ্বনি ব্যঞ্জন বা যৌগিক স্বর হলে তিনি তাকে বলেন 'হলন্ত অক্ষর'। অন্যদিকে, প্রবোধচন্দ্রের ভাষায়—দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর হলে তা 'মুক্তদল', আর রুদ্ধস্বর বা ব্যঞ্জন বলে তার নাম 'রুদ্ধদল'। অতএব, যা 'অক্ষর' তা-ই 'দল', যা 'স্বরান্ত অক্ষর' তা-ই 'মুক্তদল', যা 'হলন্ত অক্ষর' তাই 'রুদ্ধদল'।

মাত্রা, কলা ঃ 'মাত্রা' কথাটির সাধারণ অর্থ পরিমাণ বা মাপ। ছন্দের আলোচনায় এর অর্থ দল বা অক্ষর উচ্চারণের মাপ, অধ্যাপক পবিত্র সরকারের ভাষায় 'দলের ওজন'। যে দলের উচ্চারণ কেটে কেটে, তার মাপ বা ওজন কম—দল সেখানে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার। যে দলের উচ্চারণ টেনে টেনে, তার মাপ বা ওজন তুলনায় বেশি—দল সেখানে দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর সাধারণত ১-মাত্রার, রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার।

অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কাল পরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনি-পরিমাণ। দলের ভেতরকার ধ্বনি কুঁচকে গেলে দল হয় হ্রস্ব। এই রকম হ্রস্ব দলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা। দলের ধ্বনি আয়তনে বাড়লে দল হয় দীর্ঘ, এ রকম দলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, অমূল্যধনের 'মাত্রা' আর প্রবোধচন্দ্রের 'কলা'-র মধ্যে কার্যত কোনও পার্থক্য নেই।

ছেদ, যতি ঃ কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝে নেওয়া আর দাম ঠিক রাখা—এই ২টি প্রয়োজনে গদ্য বা পদ্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে অনিয়মিত যে থামা, তার নাম 'ছেদ'। আর, কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নিয়মিত যে থামা, তরা নাম 'যতি'। ছেদের জায়গা বোঝানোর জন্য ২-রকমের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়—কম থামার চিহ্ন কমা (,) আর পুরো থামার চিহ্ন দাঁড়ি ; সেমিকোলন (। ;) ইত্যাদি। অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—কম থামার নাম অর্ধযতি, পুরো থামার নাম পূর্ণযতি। অর্ধযতির চিহ্ন (।), পূর্ণযতির চিহ্ন (॥)।

৩৪. ৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৩ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ

ছন্দ, দল, মাত্রা।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ

বর্ণ আর ধ্বনি, মাত্রা আর কলা, ছেদ আর যতি।

২. (ক) ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন কীভাবে বর্ণ আর ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

(খ) ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় কীভাবে বর্ণ আর ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

(গ) প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কীভাবে দল বা অক্ষরের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

৩. (ক) বিকল্প পরিভাষা লিখুন ঃ

স্বরান্ত অক্ষর, হলন্ত অক্ষর, মৌলিক স্বর, যৌগিক স্বর।

(খ) নীচের ৪টি ছত্রে প্রতিটি দল পৃথক করে দেখান এবং জলের মাথায় মাত্রা-সংখ্যা বসিয়ে দিন ঃ

i) বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান

ii) সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়

iii) ঝর্ণা, ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা

iv) বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়

(গ) অর্ধযতি আর পূর্ণযতির চিহ্ন বসিয়ে দিন ঃ

i) কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল

মঞ্জরী চীরহি ঝাঁপি

ii) আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে

মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত গীতে

iii) হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে

iv) যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে

(ঘ) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

i) _____ চোখে দেখার জিনিস, _____ কানে শোনার জিনিস।

ii) মাত্রাকে অমূল্যধন বলেন _____, প্রবোধচন্দ্র বলেন _____।

iii) _____ র সমপরিমাণ ধ্বনির নাম কলা।

iv) _____ র পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন।

v) কথার অর্থ শ্রোতার কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্য যে থামা, তার নাম _____।

৩৪.৬ মূলপাঠ ঃ ছন্দের নানা বিভাগ

এত সমুদ্র জল টুকরো করতে করতে শেষপর্যন্ত এক ফোঁটা জল হাতে তুলে নেওয়া হয়। নোনা জলের নুনটুকু সরিয়ে বিশুদ্ধ জলের ফোঁটাকেও ভাঙতে ভাঙতে জলের অণু পর্যন্ত পৌছে যেতে পারেনা। এমন কী, ঐ অণুটিকে ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণুও পেয়ে যেতে পারেন। একইভাবে একটি কবিতাকে যদি টুকরো করতে থাকেন, তাহলে পৌঁছে যাবেন একটি অক্ষর বা দলের (Syllable) উচ্চারণে, আর, দলটিকেও ভাঙলে পাওয়া যাবে কয়েকটি ধ্বনি। দল যেন কবিতার অণু, ধ্বনি তাহলে পরমাণু। উল্টোদিক থেকে ভাবা যায় কয়েকটি পরমাণু মিলেমিশে যেমন অণুর গঠন, অসংখ্য অণুর জোড় লেগে যেমন এক-একটি পদার্থ তৈরি হতে পারে, তেমনি করে কয়েকটি ধ্বনির এক ঝোঁকে উচ্চারণে দল, আর দলের পর দলের উচ্চারণ হতে হতেই অবশেষে একটি গোটা কবিতার উচ্চারণ কানে বেজে ওঠে। এই ধ্বনির উচ্চারণ থেকে কবিতার উচ্চারণ হয়ে ওঠার পথে নানারকম ছন্দ-বিভাগ পেরোনোর ঘটনা ঘটে যায়। এই বিভাগগুলি চিনে নেওয়াই আমাদের এখনকার কাজ। উচ্চারণে প্রথম ধাপে 'ধ্বনি' আর 'দল' (বা 'অক্ষর')-কে ছন্দের মূল উপাদান হিসেবে আপনারা জেনেছেন। এবারে ক্রমে ক্রমে জেনে নিন পরের বিভাগগুলির কথা—ছান্দসিকেরা যাদের নাম দিয়েছেন, পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব, পর্ব বা পদ, চরণ বা পঙ্‌ক্তি, শ্লোক বা স্তবক। সেইসঙ্গে ক্রমশ বুঝে নিন—যাতে কীভাবে উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দ-বিভাগ বলে চিনিয়ে নেয়।

৩৪.৬.১ পর্ব, পদ

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'কড়ি ও কোমল' কাব্য থেকে 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতার প্রথম ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

দিনের আলো । নিবে এল । সূয্যি ডোবে । ডোবে ॥ = ৪ + ৪+ ৪+ ২

পর পর ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে কম-থামার জায়গাগুলি আর শেষে একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) দিয়ে পুরো-থামার জায়গাটি চিহ্নিত করা হল। এর ফলে কবিতার ছত্রটি ৪টি টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল—৩টি সমান, শেষেরটি ছোটো। এই এক-একটি টুকরোই এক-একটি পর্ব। 'পর্ব' নিয়ে আরো বিশদ আলোচনায় একটু পরে আসছি। যে ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে ছত্রটিকে ৪টি পর্বে ভাগ করা হল তাকে অমূল্যধন বলেন 'অর্ধযতি'-র চিহ্ন, প্রবোধচন্দ্র বলেন 'পর্বযতি'-র চিহ্ন। ছত্রশেষের একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) অমূল্যধনের দেওয়া নাম 'পূর্ণযতি'-র চিহ্ন। পরপর ২টি যতির মাঝখানে রয়েছে এক-একটি পর্ব।

প্রথম ৩টি পর্ব যে সমান তার কারণ, প্রতিটি পর্বেই আছে ৪টি করে মাত্রা। প্রতিটি দলের মাথায় ১ বসিয়ে মাত্রা নির্দেশ করছি, উচ্চারণ করে করে প্রতিটি দলের ১-মাত্রা বুঝে নিতে চেষ্টা করুন—

১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	
দি -নের্	আ- লো	নি-বে এ-ল	সুজ্-জি ডো-বে	ডো-বে	= ৪+৪+৪+২

আগেই জেনেছেন মুক্তদল (বা স্বরান্ত অক্ষর) সাধারণত ১-মাত্রার, রুদ্ধদল (বা হলন্ত অক্ষর) কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার। এখানে লক্ষ করুন—প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রার বটেই, এমনকী প্রতিটি রুদ্ধদলও (নের্, সুজ্) ১-মাত্রারই হয়েছে।

লক্ষ্য করছেন, ছত্রটির পর্ব বিভাগ করে ২-রকম মাপের পর্ব পাওয়া গেল—৪-মাত্রার ৩টি আর ২-মাত্রার ১টি পর্ব। ৪টি পর্বের মধ্যে ৪-মাত্রার পর্ব ৩-বার ঘুরে ঘুরে এল পর পর। অতএব, ৪-মাত্রার পর্বই ছত্রটির মূলপর্ব, মাপের দিক থেকে এটি পূর্ণ। এর নাম **পূর্ণপর্ব**। ছত্রের শেষ পর্বটি 'পূর্ণপর্বে'র চেয়ে ছোট মাপের—২-মাত্রার। অতএব, পর্বটির নাম **অপূর্ণপর্ব** এবার নীচের ছত্রদুটি পড়ুন—

১ ১১	১১ ১	১ ১	১	১ ১	১	২	১১
তোমরা	চাহিলে	সবে	সে	পাত্র	**অক্ষয়্**		হবে

১ ১	১ ১	১১১	১১১	
ভিক্ষা	অন্নে	বাঁচাব	বসুধা	= ৮+৮+১০

এতে আছে ৩টি পর্ব—প্রথম ২টি পর্ব পরপর ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ১০-মাত্রার। ৮-মাত্রার পর্ব ঘুরে ঘুরে এল ২-বার পরপর। অতএব, ৮-মাত্রাই এখানে মূল পর্বের পুরো মাপ, ৮-মাত্রার পর্বই 'পূর্ণপর্ব'। অথচ, শেষ পর্বটির ১০-মাত্রা পূর্ণপর্বের মাপ ছাড়িয়ে গেছে। অমূল্যধনের পথ ধরে এ-পর্বকে বলা হবে 'অতিপূর্ণ পর্ব'।

	২ ১ ১	১ ১	২	
(বল)	উন্নত	মম	শির	= ৬ + ২

	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১ ২	২	১ ২	১ ২	২	
(শির)	নেহারি	আমারি	নতশির্	ওই	শিখর্	হিমাদ্	**রির্**	= ৬ + ৬ + ৬ + ২

প্রথম ছত্রটিতে প্রথম পর্ব ৬-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব ২-মাত্রার। কোনও পর্বই ঘুরে ঘুরে আসে নি। তবু প্রথম পর্বকেই গণ্য করা হবে পূর্ণপর্ব বলে। দ্বিতীয় পর্ব পূর্ণপর্বের চেয়ে মাপে ছোটো বলে অপূর্ণপর্ব হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয় ছত্রে অবশ্য ৬-মাত্রার পর্ব পর পর ৩-বার ঘুরে ঘুরে এসে পূর্ণপর্ব হবার দাবি কায়েম করেছে। শেষপর্ব তার চেয়ে ছোটো বলে অবশ্যই অপূর্ণপর্ব। কিন্তু, লক্ষ করুন, ২টি ছত্রেরই শুরুতে বন্ধনীর মধ্যে ১টি করে ২-মাত্রা মাপের ছোটো পর্ব রয়েছে। পর্বদুটি ছন্দের হিসেবের বাইরে, ছন্দের পক্ষে যেন খানিকটা বাড়তি বোঝা, না থাকলেও ছন্দের ক্ষতি হত না। এ ধরনের পর্বকে ছান্দসিকেরা বলে অতিপর্ব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছত্রের শুরুতেই এসব পর্ব কবিরা বসান, কখনও কখনও ছত্রের মাঝখানে—

ভবের গাছে । বেঁধে দিয়ে (মা) । পাক দিতেছ । অবিরত ।।

'মা' এখানে ছত্রটির মাঝখানে-থাকা 'অতিপর্ব'।

কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি আর পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি—অমূল্যধনের হিসেবমতো এই ২-রকম থামা বা যতির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ্য করলেন আর এক রকমের থামা বা যতি, যা কম-থামার চেয়ে একটু বেশি, অথচ পুরো-থামার চেয়ে একটু কম। এর নাম 'পদযতি'। অমূল্যধনের অর্ধযতিকে প্রবোধচন্দ্র বলেন পর্বযতি। অর্ধযতি বা পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে দেখায়। তেমনি পদযতির কাজ পদ-বিভাগ করে দেখানো। পদযতি পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামায়। একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (।।) দিয়ে অমূল্যধন দেখান পূর্ণযতি, প্রবোধচন্দ্র দেখান পদযতি। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-এর ছত্রটিতে (।।) চিহ্ন দিয়ে দেখানো পদযতিটি চিনে নিন। ক্রমশ বুঝে নিন পদ-বিভাগের তত্ত্ব, পর্ব আর পদের পার্থক্য—

১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১			১ ১	১ ১	১ ১	
দিনের অলো	নিবে এল ||	সুজ্ জি	ডোবে	ডোবে	= (৪ + ৪) + (৪ + ২)

পদযতি (॥) এখানে ছত্রটিকে ২টি খণ্ডে ভাগ করেছে, এক-একটি খণ্ড এক-একটি 'পদ'। প্রথম পদ তৈরি হয়েছে ২টি সমান মাপের পর্ব নিয়ে (৪+৪), দ্বিতীয় পদ তৈরি হয়েছে ২টি ছোটো-বড়ো পর্ব নিয়ে (৪+২)। অতএব, পর্বের চেয়ে 'পদ' বড়ো মাপের খণ্ড। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয়ে এক একটি 'পদ'। ছত্রটিতে আছে ৪টি পর্ব, কিন্তু ২টি পদ।

লক্ষ্য করুন, ওপরের ছত্রটিতে পর্বের মাপ অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবমতো একই (প্রথম ৩টি ৪-মাত্রার, শেষেরটি ২-মাত্রার)। অতএব, অমূল্যধনের ২টি করে 'পর্ব' নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রবোধচন্দ্রের এক-একটি 'পদ'।

এবারে পড়ুন 'কড়ি ও কোমল' কাব্যেরই আর-একটি কবিতা 'প্রাণ'-এর দ্বিতীয় ছত্রটি—

'মানবের্ মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'।

ছত্রটির পর্ব-বিভাগ আর পদ-বিভাগ প্রবোধচন্দ্র করবেন এইভাবে—

১ ১ ২	১ ১ ১ ১			১ ১ ১ ১	২	
মানবের	মাঝে আমি ||	বাঁচিবারে	চাই	=(৪+৪)+ (৪+২)

প্রথম ৩টি পর্বের মাপ ৪-মাত্রা করে, শেষপর্ব ২-মাত্রার। আর প্রথম পদটির মাপ ৮-মাত্রা (৪+ ৪), দ্বিতীয় পদের মাপ ৬-মাত্রা (৪+২)।

অন্যদিকে, অমূল্যধনের পর্ব-বিভাগ হবে এইরকম—

মানবের্ মাঝে আমি | বাঁচিবারে চাই || = ৮+৬

প্রথম পর্ব ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ৬-মাত্রার।

ওপরের ছত্রটির ছন্দ-বিভাগ থেকে প্রবোধচন্দ্রের 'পর্ব' আর 'পদ'-এর সঙ্গে অমূল্যধনের পর্বের সম্পর্ক বিষয়ে ২টি কথা লক্ষ করুন ঃ

(১) পূর্ণপর্ব প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে এখানে ৪-মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ৮-মাত্রার। অর্থাৎ, দুই ছান্দসিকের পর্বের মাপ দু-রকম।

(২) প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২টি পদ ৮ আর ৬ মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ২টি পর্ব ৮ আর ৬ মাত্রার। অর্থাৎ, প্রবোধচন্দ্রের কাছে যা 'পদ', অমূল্যধনের কাছে তা 'পর্ব'।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই ঃ 'পর্ব' আর 'পদ' নিয়ে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের হিসেবে আছে কিছু মিল, কিছু গরমিল। দুজনের 'পর্ব' কখনও সমান, কখনো ছোটো-বড়ো। সেই কারণে, প্রবোধচন্দ্রের 'পদ' কখনো অমূল্যধনের 'পর্বে'র সমান, কখনো বড়ো। 'পদ'-এর কথা অমুল্যধন ভাবেননি।

৩৪.৬.২ পর্বাঙ্গ, উপপর্ব

'পর্ব', সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়ে গেল। বোঝা গেল, কবিতার একটি ছত্র উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে যে যতি পড়ে (অর্থাৎ থামতে হয়), সেই যতির জায়গাটিতে এক-একটি পর্ব তৈরি হতে থাকে। পর্বগুলি পাশাপাশি সমান হবার কথা, তবে শেষপর্ব ছোটো (বা বড়ো) হতে পারে।

এই 'পর্ব'-কে মাঝখানে রেখে ছান্দসিকেরা একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে ছোটো, আর একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে বড়ো ছন্দ-বিভাগের কথাও ভেবেছেন। ছোটো মাপের বিভাগচাই আগে দেখুন। 'দিনের আলো' দিয়ে শুরু-করা ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
দিনের্		আলো		নিবে		এল		সুজ্‌জি		ডোবে		ডোবে	

'দিনের্ আলো' পর্বটির 'দিনের' 'আলো'—এই দুটি অংশে ভাগ হয়ে উচ্চারণ হচ্ছে। ফলে ৪-মাত্রার পর্বটি ২+২ মাত্রায় আবার ২টি টুকরো হচ্ছে। একইভাবে 'নিবে এল' আর 'সুজ্‌জি ডোবে' পর্বদুটিও ২+২ মাত্রায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। শেষের 'ডোবে' পর্বটি অবশ্য ২-মাত্রাতেই থেকে গেল, ভাগ হল না। পর্বের এই ভাগগুলিকে অমূল্যধন বলেন **'পর্বাঙ্গ'** (=পর্বের অঙ্গ), প্রবোধচন্দ্র বলেন **উপপর্ব** (=পর্বের স্বাভাবিক উচ্চারণ-বিভাগ)। 'পর্বাঙ্গে'র চিহ্ন (:), 'উপপর্বের চিহ্ন (:)। এই চিহ্ন দিয়ে ছত্রটি সাজিয়ে দেখুন—

পর্বাঙ্গ ঃ দিনের : আলো । নিবে : এল । সুজ্‌জি : ডোবে । ডোবে

উপপর্ব ঃ দিনের : আলো । নিবে : এল । সুজ্‌জি : ডোবে । ডোবে

অমূল্যধনের 'পর্বাঙ্গ' আর প্রবোধচন্দ্রের 'উপপর্ব' পর্বেরই এক-একটি ভাগ। কিন্তু, পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সবসময় হুবহু এক নয়। এর কারণ, অমূল্যধনের 'পর্ব' আর প্রবোধচন্দ্রের 'পর্ব' সবসময় মাপে এক হয় না। কেন হয় না তা আমরা পরে দেখব। 'দিনের আলো'-র ছত্রটিতে অবশ্য প্রথম ৩টি পর্ব জুদনের হিসেবেই সমান

মাপের (৪-মাত্রার), সে-কারণে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও সমান হতে পেরেছে (২-মাত্রার)। কিন্তু নীচের ছত্রটিতে দেখুন—

পর্বাঙ্গ ঃ একা দেখি : কুল বধূ। কে বট : আপনি ॥ = (৪+৪) +(৩ + ৩)

উপপর্ব ঃ একা : দেখি। কুল : বধূ ॥ কে বট : আপনি = (২+ ২) +(২+ ২)+ (৩+ ৩)

অমূল্যধনের হিসেবে ছত্রটিতে ২টি পর্ব, প্রথমটি ৮-মাত্রার। ৮-মাত্রার প্রথম পর্বে পাওয়া গেল ৪-মাত্রার ২টি পর্বাঙ্গ। অথচ, ৮-মাত্রার এই পর্বটিই প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২টি ৪-মাত্রার পর্বে ভাগ হল, ৪-মাত্রার এক-একটি পর্বে পাওয়া গেল ২-মাত্রার ২টি করে উপপর্ব। 'কে বট আপনি'-অংশটি অমূল্যধনের কাছে ৬-মাত্রার পর্ব, ভাগ হল ৩-মাত্রার ২টি পর্বাঙ্গে। আর, এ অংশটি প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৬-মাত্রার একটি পদ, কিন্তু, সরাসরি এর ভাগ হল ৩-মাত্রার ২-টি উপপর্বে (পদটিকে পর্বে পর্বে ভাগ করা সম্ভব নয় বলে)। পর্বাঙ্গ-উপপর্বের মাপটাও সেই কারণেই সমান (৩-মাত্রার)। অতএব দেখলেন, একই কবিতার একই ছত্রে সব পর্বে মাপ ছান্দসিকদের কাছে সমান হয় না, তার ফলে পর্ব কেটে-কেটে-পাওয়া পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও অসমান হয়ে পড়ে।

এক-একটা পর্ব যে ২টি-৩টি টুকরোয় ভাগ হতে পারে, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে, পর্বের মাঝখানে সত্যিই থামতে হয় কিনা—অর্থাৎ যতি পড়ে কিনা এ বিষয়ে ছান্দসিকেরা একমত নন। অমূল্যধনের মতে পর্বের মাঝখানে যতি নেই, (:) চিহ্নটিও যতিচিহ্ন নয়)। প্রবোধচন্দ্রের মতে যতি অবশ্যই আছে, যতিই পর্বকে উপপর্বে ভাগ করে এবং সে-যতির নাম উপযতি।

৩৪.৬.৩. চরণ, পঙ্‌ক্তি

পর্বের চেয়ে ছোটো ছন্দ-বিভাগের কথা হল। এবারে বড়ো বিভাগের কথা। একটু আগেই আমরা দেখলাম যতির আঘাতে 'দিনের আলো'-র ছত্রটির ৪টি পর্বে ভাগ হওয়ার এবং ছত্রটির শেষে পুরো থেমে যাওয়ার ঘটনা। এই পুরো থামার যতিকে বলা হয় 'পূর্ণযতি', আর শুরু থেকে পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম অমূল্যধনের কাছে **চরণ,** প্রবোধচন্দ্রের কাছে **পঙ্‌ক্তি**। অর্থাৎ, পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকেই অমূল্যধন বলছেন 'চরণ', প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'পঙ্‌ক্তি। প্রবোধচন্দ্র এই কারণে 'পূর্ণযতি'-কে আরো নির্দিষ্ট করে বললেন 'পঙ্‌ক্তিযতি। সেদিক থেকে 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি'-র মধ্যে তফাত থাকার কথা ছিল না। কিন্‌কু, 'চরণ' বা 'পঙ্‌ক্তি'র মাপ যে নির্দিষ্ট করে দেয়, সেই পূর্ণযতিই ঠিক কোথায় পড়বে (অর্থাৎ, পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে কোন্ পর্বের শেষে পুরোপুরি থামতে হবে)—এই নিয়ে ছান্দসিক দুজন সব সময় একমত নন। তার ফলেই 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি' কখনো কখনো পৃথক্ হয়ে যায়।

'দিনের আলো'র ছত্রটি চরণ বটে, পঙ্‌ক্তিও বটে—এটা আমরা দেখলাম। সমান মাপের চরণ-পঙ্‌ক্তি আরো দুটি-একটি দেখা যাক।

	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১	১ ২	১ ১ ১	
১ম চরণ	মরিতে	চাহিনা	আমি	সুন্দর	ভূবনে	= ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার
	১ ১ ২	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	২	
২য় চরণ	মানবের	মাঝে	আমি	বাঁচিবারে	চাই	= ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার
	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১	১ ২	১ ১ ১	
১ম পঙ্‌ক্তি	মরিতে	চাহিনা	আমি	সুন্‌দর	ভূবনে	= ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার
	১ ১ ২	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	২	
২য় পঙ্‌ক্তি	মানবের্	মাঝে	আমি	বাঁচিবারে	চাই	= ৪+ ৪+ ৪+ ২ = ১৪ মাত্রার

এখানে মাত্রা বসেছে এই নিয়মে—প্রতি মুক্তদলে (বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের-প্রথমে-থাকা 'সুন্' রুদ্ধদলেও (বা হলন্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, শব্দের-শেষে-থাকা প্রতি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা। লক্ষ করুন, ২টি ক্ষেত্রেই পূর্ণযতি (পুরো থেমে-যাওয়া) পড়ছে ছত্রের শেষে ১৪-মাত্রার পরে। অতএব, চরণ আর পঙ্‌ক্তির মাপে কোনো পার্থক্য রইল না। পার্থক্য কেবল এদের ছন্দ-বিভাগে। প্রথম চরণ ৮ +৬ মাত্রার ২টি পর্বে ভাগ হয়ে গেছে, আর প্রথম পঙ্‌ক্তির ভাগ হয়েছে ৮ + ৬ মাত্রায় ২টি পদে। দ্বিতীয় চরণে ২টি পর্ব (৮ +৬), কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ৪টি পর্ব (৪+৪+ ৪+২)।

এবারে দেখুন একটি পৃথক্ মাপের চরণ পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত—

১	১ ১	১ ২	১ ১ ২ ২	২ ১ ১
এ	নহে	মুখর্	বনমর্মর্	গুন্‌জিত

১	১	১ ১ ২	১ ১ ১	১ ২	১ ১ ১
এ	যে	অজাগর্	গরজে	সাগর্	ফুলিছে

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ২-বার পূর্ণযতি, তাই ২-টি চরণ। কিন্তু, প্রবোধচন্দ্র প্রথম ছত্রের শেষে পূর্ণযতি মানেন না, মানেন পদযতি। ২টি ছত্র পুরোপুরি উচ্চারণ করার পরে তিনি পুরো থামতে চান (কেবল 'ফুলিছে'-র পর), তার আগে নয়। অতএব তাঁর হিসেবে ২টি ছত্র মিলে এখানে ২টি পঙ্‌ক্তি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য চরণ-পঙ্‌ক্তি সমান। যেখানে সমান নয়, সেখানে দেখা যাবে পঙ্‌ক্তির মাপ চরণের চেয়ে বড়ো। এর কারণ, পর্ব আর পঙ্‌ক্তির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র যে অতিরিক্ত ছন্দ-বিভাগ 'পদ' কল্পনা করে নিয়েছে, তা ককনো কখনো 'চরণ'-এর সমান হয়ে যায়। আপনারা জানেন, কয়েকটি পর্ব মিলে তৈরি হয় 'পদ'। তেমনি, কয়েকটি 'পদ' জুড়ে তৈরি হয় পঙ্‌ক্তি। একটু আগে 'এ নহে মুখর'-এর ২টি ছত্র মিলে যে একটি মাত্র পঙ্‌ক্তি তৈরি হল, তার কারণ এক-একটি ছত্র প্রবোধচন্দ্রের কাছে এক-একটি 'পদ' বলেই মনে হয়েছে, তার বেশি নয়। অর্থাৎ, প্রথম ছত্রের শেষে অমূল্যধন পুরোপুরি থামলেও (পূর্ণযতি) প্রবোধচন্দ্র পুরো

থামছেন না, পর্বের শেষে যতটুকু থামতে হয় (পর্বযতি) তার চেয়ে একটু বেশি থামছেন (পদযতি)।

ফলে এখানে অমূল্যধনের 'চরণ' হয়ে যাচ্ছে প্রবোধচন্দ্রের 'পদ'-এর সমান। অতএব, ২টি 'পদ' নিয়ে তৈরি 'পঙ্‌ক্তি'

এখানে ২টি 'চরণে'রই যোগ ফল। নীচে লক্ষ করুন—

২ ১১ ২	১১ ২১১	১১১ ‖	= ৬ + ৬+ ৩ = ১৫
ঐ আসে ঐ	অতি ভৈরব	হরষে ‖	
১১২১১	১১ ২১১	১১১	
জলসিন্‌চিত	ক্ষিতি সৌরভ	রভসে	= ৬ + ৬+ ৩ = ১৫
১১২১১	১১২১১	১১১ ‖	
ঘনগৌরব	নবযৌবনা	বরষা ‖	= ৬ + ৬+ ৩ = ১৫
	১১২১১	১১১ ‖	
	শ্যামগম্‌ভীর	সরষা ‖	= ৬+ ৩ = ৯

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ৪টি ছত্রই ৪টি চরণ। আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ৪টি ছত্রে আছে ৪টি পদ মিলে একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি। প্রথম ৩টি চরণের মাপ ১৫-মাত্রা করে, চতুর্থটি ৯-মাত্রার। পঙ্‌ক্তিটির মাপ ১৫ + ১৫+ ১৫+ ৯ মাত্রা। চরণ আর পদ সমান হলে প্রবোধচন্দ্রের একপদী পঙ্‌ক্তি ছাড়া আর সব পঙ্‌ক্তিই মাপে চরণের চেয়ে বড়ো হবে গণিতের নিয়ম মেনে।

৩৪.৬.৪ স্তবক, শ্লোক

ছন্দ-বিভাগ নিয়ে যেটুকু কথা হল, তা থেকে এটা বোঝা যাবে, পর্ব আর চরণ এই ২ রকম মাপের বিভাগ থেকেই উচ্চারণ আর বিরামের বিন্যাসের শৃঙ্খলাটা ধরা পড়ে যায়। কবিতার পদ্য পড়তে গেলেই চলতে থাকে পর্বের পর পর্ব উচ্চারণ, মাঝখানে অর্ধযতি। পরপর কয়েকটি পর্বের উচ্চারণ হলেই পড়ে পূর্ণযতি, শেষ হয় একটি চরণের উচ্চারণ। আবার চলতে থাকে একইভাবে পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে আর-একটি চরণের উচ্চারণ আর-একটি পূর্ণযতি পর্যন্ত। এর সঙ্গে বাড়তি যে ২টি বিভাগের কথা আপনারা জানলেন (পর্বের চেয়ে ছোটো মাপের 'পর্বাঙ্গ' বা 'উপপর্ব' আর পর্বের চেয়ে বড়ো মাপের 'পদ'), ছন্দের মূল চরিত্র এদের বাদ দিলেও বুঝে নেওয়া যাবে। আর, 'পদ' বাদ পড়লে 'পঙ্‌ক্তি'ও অবান্তর হয়ে পড়ে। কেননা, **'পঙ্‌ক্তি'র** ধারণা তৈরি হয় কয়েকটি 'পদে'র যোগফল হিসেবেই।

অতএব, কবিতা যখন পড়ি, তখন আমরা পর পর নির্দিষ্ট মাপের (মাত্রা সংখ্যার) চরণই একের পর এক উচ্চারণ করে যেতে থাকি। মনে রাখবেন, একটি কবিতার গোটা শরীরে যতগুলি চরণ ছড়ানো আছে, তাদের

ছন্দ-স্বভাব একটাই। সে-কারণে, কোনও কবিতার ছন্দ বোঝার জন্য গোটা কবিতাই পড়ে পড়ে দেখার প্রয়োজন নেই, কবিতার একটি অংশ এর জন্য বেছে নিলেই চলে। তবে, অংশটি এমন হওয়া চাই, যাতে থাকে মাপ বা মাত্রা সংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা পরপর কয়েকটি চরণ। এই রকম কয়েকটি চরণের গুচ্ছকে ছান্দসিকেরা বলেন স্তবক।

সাধারণভাবে 'স্তবকে'র অন্তর্গত চরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—২ থেকে ৮ পর্যন্ত, এমনকী তার চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে, এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র একটু ভিন্ন কথা বলতে চান। তাঁর মতে 'স্তবকে'র পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা কমপক্ষে ৫ হওয়া চাই-ই। তার চেয়ে কম হলে তার নাম হবে শ্লোক, 'স্তবক' নয়। ৫ বা তার বেশি সংখ্যার পঙ্‌ক্তির গুচ্ছও তাঁর কাছে বড়ো মাপের শ্লোক-ই, কেবল তার বিকল্প নাম 'স্তবক'। আমরা অবশ্য চরণের যেকেতানা গুচ্ছকেই বলব 'স্তবক'। নীচের 'স্তবক'গুলি উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন, পরপর সাজানো চরণগুলি মাত্রা সংখ্যায় শৃঙ্খলায় কিভাবে পরপর বাঁধা পড়েল এক-একটি 'স্তবক' তৈরি করেছে—

১. এ জগতে হায় । সেই বেশি চায় । আছে যার ভূরি। ভূরি ॥ =৬+৬+৬+২=২০
রাজার হস্‌ত । করে সমস্‌ত । কাঙালের ধন। চুরি ॥ =৬+৬+৬+২=২০

২. নিত্‌ত তোমায়্‌ । চিত্‌ত ভরিয়া । স্মরর্ণ্‌ করি ॥ =৬+৬+৬+২=২০
অন্‌তবিহীন । বিজনে বসিয়া । বরর্ণ্‌ করি ॥ =৬+৬+৫ =১৭
তুমি আছ মোর্‌। জীবন-মরণ্‌ । হরণ্‌ করি ॥ =৬+৬+৫ =১৭

৩. মরিতে চাহি না। আমি সুন্‌দর ভুবনে ॥ ৮+৬ =১৪
মানবের্‌ মাঝে আমি। বাঁচিবারে চাই ॥ ৮+৬ =১৪
এই সূরযকরে এই। পুষ্‌পিত কাননে ॥ ৮+৬ =১৪
জীবন্‌ত হৃদয়-মাঝে। যদি স্থান্‌ পাই ॥ ৮+৬ =১৪

৪. দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে ॥ =১০
জাগিয়া উঠিল হাহারবে ॥ =১০
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে। শুধালেন জনে জনে।
ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা ॥ =৮+৮+১০ =২৬
তোমরা লইবে বল কেবা ॥ =১০

১ম স্তবকে ২টি চরণ (৬+৬+৬+২ মাত্রার), ২য় স্তবকে ৩টি চরণ (৬+৬+৫ মাত্রার),
৩য় স্তবকে ৪টি চরণ (৮+ ৬ মাত্রার), ৪র্থ স্তবকে ৪টি চরণ (১০ মাত্রার ৩টি, ৮+৮+১০ মাত্রার ১টি)।

৩৪.৭ সারাংশ-২

পর্ব, পদ ঃ কবিতার ছত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে একটুখানি থামতে থামতে পুরো ছত্র পড়ে ফেলি। ফলে পুরো ছত্রটি কয়েকটি টুকরোয় ভাগ হয়ে যায়। এক-একটি টুকরোর নাম 'পর্ব'। সমান সমান মাত্রার পর থামলে পর্বের মাপও পরপর সমান হবে। এ রকম একই মাপের পর্ব পরপর ঘুরে ঘুরে এলে তার নাম 'পূর্ণপর্ব'। 'পূর্ণপর্বে'-র চেয়ে ছোটো মাপের পর্বের নাম 'অপূর্ণপর্ব', আর বড়ো মাপের পর্বের নাম 'অতিপূর্ণপর্ব'। কবিতার ছত্রের শুরুতে, কখনো কখনো মাঝখানে ছোটো মাপের এমন পর্ব মাঝে মাঝে কবিরা ব্যবহার করেন, যা ছন্দের হিসেবের বাইরে। এ রকম অতিরিক্ত এবং প্রায় অনাবশ্যক পর্বের নাম 'অতিপর্ব'।

অমূল্যধনের অর্ধযতি বা প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে। এই অর্ধযতি বা পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামা, অথচ পূর্ণযতির চেয়ে একটু কম থামা প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করে তার নাম দিলেন পদযতি। এই পদযতি ছত্রকে যেসব খণ্ডে ভাগ করে, তার নাম 'পদ'। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয় 'পদ'।

কবিতার একই ছত্রে অমূল্যধনের পর্বের মাপ কখনো প্রবোধচন্দ্রের পর্বের সমান, কখনো তার চেয়ে বড়ো। তাই, প্রবোধচন্দ্রের 'পদ' কখনো অমূল্যধনের পর্বের সমান, কখনো বড়ো।

পর্বাঙ্গ, উপপর্ব ঃ

১টি পর্বকে ২টি-৩টি ভাগে উচ্চারণ করে এক-একটি ভাগকে অমূল্যধন বলেন 'পর্বাঙ্গ', আর প্রবোধচন্দ্র বলেন 'উপপর্ব'। দুজনের পর্বের মাপ যখন সমান থাকে, সেই পর্বের পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও তখন সমান। কিন্তু, দুজনের পর্ব ছোটো-বড়ো হলে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও হবে ছোটো-বড়ো। আবার, পর্বে পর্বে ভাগ না-হয়ে সরাসরি কয়েকটি উপপর্বে ভাগ হয়ে যায়, প্রবোধচন্দ্রের এ রকম ১টি পদ যদি অমূল্যধনের পর্বের সঙ্গে সমান মাপের হয়, তাহলেও পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সমান হবে।

চরণ, পঙ্‌ক্তি ঃ

পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকে অমূল্যধন বলেন 'চরণ', প্রবোধচন্দ্র বলেন 'পঙ্‌ক্তি'। কবিতার কোনো কোনো ছত্রের শুরু থেকে সেই ছত্রের বা পরের কোনো ছত্রের শেষে-থাকা পূর্ণযতি পর্যন্ত যে ছন্দ-বিভাগ, তার নাম 'চরণ' বা 'পঙ্‌ক্তি'। অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের পূর্ণযতি একই ছত্রের শেষে পড়লে 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি' একই হবে, ভিন্ন ভিন্ন ছত্রের শেষে পড়লে চরণ-পঙক্তি পৃথক্ হবে।

প্রবোধচন্দ্রের পর্ব আর পঙ্‌ক্তির মাঝামাঝি মাপের ছন্দ-বিভাগ পদ। কয়েকটি পদ জুড়ে তৈরি হয় 'পঙ্‌ক্তি'। কখনো কখনো কবিতার এক-একটি ছত্র অমূল্যধনের কাছে তরণ হলেও প্রবোধচন্দ্রের কাছে তা এক-একটি পদ বলে গণ্য হতে পারে। তখনই পঙ্‌ক্তি হয়ে পড়ে চরণের চেয়ে বড়ো মাপের পৃথক ছন্দ-বিভাগ।

স্তবক, শ্লোক ঃ

কোনো কবিতার এমন একটি অংশ, যেখানে পরপর ২, ৩, ৪, ৫, ৬, বা ৮টি চরণের গুচ্ছ মাত্রাসংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা, তার নাম 'স্তবক'। প্রবোধচন্দ্রের বিচারে কমপক্ষে ৫টি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছ হবে 'স্তবক'।

২, ৩ বা ৪টি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'শ্লোক'।

৩৪.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৪ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ

পর্ব, চরণ, স্তবক।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ

পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব, পর্ব আর পদ, চরণ আর পঙ্‌ক্তি।

(গ) অর্ধযতি পূর্ণযতি পর্ব স্তবক—এই ৪টি পরিভাষা অমূল্যধন প্রবোধচন্দ্র দুজনেই ব্যবহার করতেন। প্রতিটি পরিভাষার ব্যবহারে ছান্দসিক দুজনের কোথায় মিল, কোথায় গরমিল—দেখান।

২. (ক) 'আম্রের মঞ্জরী গন্ধ বিলায়'—এই ছত্রটিতে দলগুলিকে পৃথক করে দলের মাথায় মাত্রা বসিয়ে নিন। এরপর—

i) সঠিক চিহ্নের সাহায্যে ছত্রটিতে পর্বাঙ্গ পর্ব আর চরণের বিভাগগুলি দেখান।

ii) সঠিক চিহ্নের সাহায্যে ছত্রটিতে উপপর্ব আর পদের বিভাগগুলি দেখান।

iii) ওপরের দু রকমের ছন্দ-বিভাগ থেকে অমূল্যধনের পর্বাঙ্গো-পর্ব-চরণের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের উপপর্ব-পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তির মাপের কী সম্পর্ক খুঁজে পেলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।'

প্রশ্ন-২ (ক)-এর পদ্ধতিতে i) ওপরের ৪টি ছত্রে পরপর দুরকমের ছন্দ-বিভাগ করুন।

ii) তা থেকে ঐ দু রকমের বিভাগের কী সম্পর্ক খুঁজে পেলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) পর পর এমন ৩টি পদ্যছত্রের দৃষ্টান্ত লিখুন যার—

i) প্রথমটিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার।

ii) দ্বিতীয়টিতে পূর্ণপর্ব ৬-মাত্রার।

iii) তৃতীয়টিতে পূর্ণপর্ব ৮-মাত্রার।

যে কোনো একটিতে ১টি অতিপর্ব থাকবে।

যে কোনো একটিতে ১টি অতিপূর্ণ পর্ব থাকবে।

যেকোনো দুটিতে ১টি করে অপূর্ণপর্ব থাকবে।

(ছত্রের শেষে পর্বের মাত্রাসংখ্যা লিখুন। কোনটি অতিপর্ব, কোনটি কত মাত্রার অতিপূর্ণপর্ব, কোনটি কত মাত্রার অপূর্ণপর্ব প্রতিটি দৃষ্টান্তের নীচে লিখুন।)

৩. **(ক) শুন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

i) _____ উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দবিভাগ বলে চিনিয়ে দেয়।

ii) অমূল্যধন (I)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান _____, চিহ্নটিকে বলেন _____।

iii) প্রবোধচন্দ্র (I)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান _____, চিহ্নটিকে বলেন _____।

iv) অমূল্যধন (II)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান _____, চিহ্নটিকে বলেন _____।

v) প্রবোধচন্দ্র (II)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান _____, চিহ্নটিকে বলেন _____।

vi) প্রবোধচন্দ্র চিহ্ন _____, উপপর্বের চিহ্ন _____।

vii) ৪-ছত্রের কবিতাগুচ্ছকে অমূল্যধন বলেন _____, প্রবোধচন্দ্র বলেন _____।

viii) অমূল্যধনের স্তবকের জন্য আবশ্যক _____ টি চরণ, প্রবোধচন্দ্রের স্তবকের জন্য আবশ্যক _____টি পঙ্‌ক্তি।

(খ) পর্বের মাঝখানে যতি পড়ে কিনা, পড়লে সে-যতি দিয়ে তৈরি ছন্দ-বিভাগের নাম কী, লিখুন।

৩৪.৯ মূলপাঠ ঃ উচ্চরাণের কয়েকটি স্বভাব

উচ্চারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ধ্বনির উচ্চারণ থেকে, এটা আপনারা জেনেছেন। তবে, ছন্দের হিসেব শুরু হয় দলের (অক্ষরের) উচ্চারণ আর উচ্চারণ-বিরতি থেকে—দলের মাত্রাগোনা আর যতি থেকে। দলের মাত্রা ১ না ২, ক-মাত্রার পর কতটুকু থামব—এর ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে ছন্দের চরিত্র। অথচ, বাংলা কবিতা উচ্চারণের এমন কয়েকটি স্বভাব রয়েছে, যা দুদিক থেকেই ছন্দের এই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। দলের উচ্চারণ কখনো হয় কেটে কেটে, কখনো টেনে টেনে, কখনো বাড়তি ঝোঁক দিয়ে, উচ্চারণ হয় কখনো সুর টেনে, কখনো একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। উচ্চারণের এই কটি স্বভাব বোঝার জন্য ৬টি পরিভাষার পরিচয় প্রথম এককের এই অংশে তুলে ধরা হচ্ছে।

৩৪.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ

দলের বা অক্ষরের মাত্রা চিনতে গিয়ে জেনেছেন 'কেটে কেটে' আর 'টেনে টেনে' উচ্চারণের কথা। কেটে কেটে উচ্চারণে দল হয় ছোটো বা হ্রস্ব, মাত্রা যায় কমে (১-মাত্রা), আর, টেনে টেনে উচ্চারণে দল হয় একটু বড়ো বা দীর্ঘ, মাত্রা যায় বেড়ে (২-মাত্রা)। এই হ্রস্ব বা দীর্ঘ হওয়া দলের একটি স্বভাব, এবং তা ধরা পড়ে উচ্চারণ করার সময়। মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষর) মূল স্বভাব হ্রস্ব উচ্চারণ, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষর) দীর্ঘ উচ্চারণ। সেই কারণেই, মুক্তদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ ২-মাত্রায়। হ্রস্ব উচ্চারণে দলের হয় সংকোচন, দীর্ঘ উচ্চারণে প্রসারণ। মুক্তদলের উচ্চারণে সংকোচনটাই স্বাভাবিক, ১-মাত্রাও প্রায় নির্দিষ্ট। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই তার প্রসারণও হয়, তখন তার উচ্চারণ হয় ২-মাত্রায়। যেমন—

১ ১	১ ১	২ ২
হাঁটি	হাঁটি	পা পা

এখানে 'হাঁটি হাঁটি'-র ৪-টি মুক্তদলের উচ্চারণই হ্রস্ব, সংকুচিত, মাত্র-ও ৪-টি। কিন্তু, 'পা পা' ২টি মুক্তদলেরই দীর্ঘ প্রসারিত উচ্চারণ, মাত্রা ২+ ২= ৪। মুক্তদলের এ-রকম প্রসারণ আপনারা লক্ষ করবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, জনগণমনঅধিনায়ক-সংগীতে, আরো দুটি-একটি আধুনিক কালের কবিতায়।

অন্যদিকে, রুদ্ধদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ দীর্ঘ বা প্রসারিত হলেও আবশ্যকমতো এর সংকোচনে বাধা নেই। আপনারা ক্রমে ক্রমে দেখবেন, কোনো কবিতার উচ্চারণে প্রতিটি রুদ্ধদল পায় ২-মাত্রা, কোনো কবিতায় ১-মাত্রা, আবার কোনো কবিতার একই স্তবকে একটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, আর-একটিতে ২-মাত্রা। যেখানে রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, সেখানে তার হ্রস্ব উচ্চারণ, সেখানে তার সংকোচন ; যেখানে রুদ্ধদলে ২-মাত্রা, সেখানে তার দীর্ঘ উচ্চারণ, সেখানে তার প্রসারণ। বাংলা কবিতায় রুদ্ধদলের এই সংকোচন-প্রসারণ অত্যন্ত ব্যাপক—এটা ক্রমশ

লক্ষ করবেন। উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম সংশ্লেষ, আর প্রসারণের নাম বিশ্লেষ। অতএব, এখানে ‘সংশ্লের্ষ এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, আর ‘বিশ্লেষ’-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ। নীচের তিনটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন—

১ ২   ২ ১ | ১ ১   ১ ২ ১ | ১ ১ ২   ২ | ১ ১ ||

১. রাজার্   হসত্ | করে   সমস্ত | কাঙালের   ধন্ | চুরি || =৬+৬ +৬ +২

১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১ | ১ ||

২. আঁধার   রাতে | বাধার্   পথে | যাত্রা   নাঙ্গা | পায় || =৪+৪ +৪ +১

১ ১ ১ ১   ১ ১ ২   ১ ১ ২ | ১ ১ ||

৩. ভালোমন্দ   দুক্খ-সুখ্   অন্ধকার্ | আলো || =৪+৪ +৪ +২ (প্রবোধচন্দ্র)

১ম উদাহরণে প্রতিটি রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষর) ২-মাত্রা ; অর্থাৎ, প্রতিটি রুদ্ধদলেরই বিশ্লেষ, ২য় উদাহরণে প্রতিটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, অর্থাৎ, প্রতিটি রুদ্ধলেরই সংশ্লেষ ; ৩য় উদাহরণে মন্ দুখ্ অন্—এই ৩টি রুদ্ধদলের ১-মাত্রা—এদের সংশ্লেষ, আর, সুখ্ কার্ ২-মাত্রার এদের বিশ্লেষ।

৩৪.৯.২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর

বিনুর বয়স । তেইশ তখন । রোগে ধর্ল । তারে
ওষুধে ডাক্ । তারে
ব'াধির্ চেয়ে । আধি হল । বড়ো

ওপরের স্তবক থেকে প্রতিট পর্ব একটা একটা করে উচ্চারণ করে দেখুন—

প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদলের) উচ্চারণে একটু বাড়তি ঝোঁক পড়ছে অন্য অক্ষরের দলের তুলনায়। প্রতিটি অক্ষরেই থাকে একটি করে স্বরধ্বনি। অমূল্যধনের মতে, পর্বের অন্তর্গত কোনো অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ অন্য অক্ষরের স্বরধবেনির তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলেই ঐ অক্ষরের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়ে। এরকম ঝোঁকের নাম তিনি দিলেন **শ্বাসাঘাত**। অমূল্যধনের বিচারে ‘শ্বাসাঘাত’ বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকের প্রতি পর্বেই থাকবে, থাকবে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের ওপর। তবে যে পর্বে হলন্ত অক্ষর নেই, সেখানে তা পড়বে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর। ওপরের স্তবকটিতে মোটা হরফে দেখানো প্রতিটি হলন্ত অক্ষরেই পড়ছে বাড়তি ঝোঁক বা ‘শ্বাসাঘাত’। লক্ষ করুন, ছত্রশেষের অপূর্ণপর্বে (‘তারে’ ‘তারে’ ‘বড়ো’) আর শেষ ছত্রের দ্বিতীয় পর্বে (‘আধি হল’) হলন্ত অক্ষর নেই, কিন্তু ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত আছে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে।

প্রবোধচন্দ্রও দলের উচ্চারণে ঝোঁকের কথা মানেন। তবে তাঁর বিচারে সে-ঝোঁক তীব্র হয়ে পড়ে কেবল পর্বের প্রথম দলে। এই ঝোঁকের নাম প্রস্বর। পর্বের শেষে দিকে দুর্বল ঝোঁকের ঘা থাকলেও তার গুরুত্ব কম। প্রবোধচন্দ্রের উচ্চারণে ওপরের স্তবকটিতে **'প্রস্বর'** পড়বে *বি তে রো তা ও তা ব্যা আ ব*—এইসব মুক্তদলের ওপর, পর্বের প্রথম দল হবার কারণে। যেকোনো শ্রেণির কবিতার স্তবকেই 'প্রস্বর' থাকবে পর্বের প্রথম দলে।

তাহলে, 'শ্বাসাঘাত' আর 'প্রস্বরে'র মধ্যে মিল শুধু এইটুকু—উচ্চারণের এই দুটি স্বভাবই আসলে কোনো অক্ষর বা দলের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়া। আর, গরমিল এই—'শ্বাসাঘাত' পড়ে বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদলে), পর্বে হলন্ত অক্ষর না-থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে)। কিন্তু, 'প্রস্বর' পড়ে যেকোনো শ্রেণির কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের কেবল প্রথম দলে (মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক)।

৩৪.৯.৩ তান, মিল

মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে বাংলা কবিতা পাঠের এমন একটি বিশেষ রীতি, যেখানে অক্ষরের (দলের) উচ্চারণ হতে হতে অক্ষরের অন্তর্গত ধ্বনির সঙ্গে মিশে থাকে অথবা ধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠতে থাকে একটা টানা সুর। একালে অবশ্য সে-রীতির পাঠ অনেক কবিতার পক্ষেই অচল। তবু, বিশেষ এক-শ্রেণির কবিতার চরণ উচ্চারণ করতে গিয়ে অমূল্যধন এইরকম একটা সুরের টান লক্ষ করেছিলেন। সুরের এই টানটুকু তিনি বোঝাতে চাইলেন সংগীত থেকে তুলে-আনা তান কথাটি দিয়ে। অক্ষরের পর অক্ষরের উচ্চারণ যখন চলতে থাকে, তখন শ্রোতার কানে যেন চলতে থাকে ধ্বনির একটা প্রবাহ। নীচের দুটি ছত্র পড়ে পড়ে লক্ষ করুন কোথায় 'তান' আছে, আর কোথায় নেই ঃ

	১ ১ ১ ১ ২		১ ১	১ ১ ১	১ ২		
১.	মহাভারতের্		কথা	অমৃত	সমান্	‖	= ৮ + ৬
	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১	১ ২ ১ ২	১ ১ ২		
২.	একথা	জানিতে	তুমি	ভারত্-ঈশ্‌শর	শাজাহান	‖	= ৮ + ১০

দেখা যাচ্ছে, ২টি চরণেই রয়েছে ২টি করে পর্ব। প্রথম পর্বের পথ ধরে ধ্বনির প্রবাহ চলতে থাকে দ্বিতীয় পর্বের দিকে। দুটি পর্বের মাঝখানে থাকা যতির জায়গায় ধ্বনির উচ্চারণ থেমে গেলেও একটু সুর কিন্তু থেকেই যায়। এই সুর বা তান পর্বদুটিকে যুক্ত করে ফেলে এবং দ্বিতীয় পর্বের ধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়। রেশ থেকে যায় শ্রোতার মনে, চরণ শেষ হবার পরেও।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় **মিল**-এর বিশেষ করে অন্ত্যমিলের গুরুত্ব ছান্দসিকেরা স্বীকার করে থাকেন। মিল হচ্ছে আসলে স্তবকের মাঝখানে একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পৃথক্ পৃথক অবস্থানে ফিরে ফিরে আসা। একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি দুটি পর্বের শেষে হতে পারে, দুটি পদের শেষে হতে পারে, দুটি পঙ্‌ক্তি

বা চরণের শেষেও হতে পারে। পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তি-চরণ যায় শেষেই হোক, মিলটা শেষে থাকে বলে তার চলতি নাম **অন্ত্যমিল**—পর্বান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক চরণান্ত্য মিল। নীচের দৃষ্টান্ত-কটি লক্ষ করুন—

১. পর্বান্ত্য মিল ঃ রণধারা **বাহি**। জয়গান গাহি। উন্‌মাদ কর। রবে

২. পদান্ত্য মিল ঃ পালিবে যে। রাজধর্ম ॥ জেনো তাহা। মোর কর্ম ॥
রাজ্য লয়ে। রবে রাজ্য। হীন

৩. পঙ্‌ক্তি-অন্তক মিল ঃ ওরে কবি। সন্ধ্যা হয়ে। এল
কেশে তোমার। ধরেছে যে। **পাক**
বসে বসে। উর্ধ্ব-পানে। চেয়ে ॥
শুনতেছ কি। পরকালের। ডাক

৪. চরণান্ত্য মিল ঃ ঝর্ণা ঝর্ণা। সুন্দরী **ঝর্ণা** ॥
তরলিত চন্দ্রিকা। চন্দন **বর্ণা** ॥

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রথম-দ্বিতীয় পর্বের শেষে 'বাহি-গাহি'-তে 'আহি' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, তা থেকে পেলেন পর্বান্ত্যমিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রথম-দ্বিতীয় পদের শেষে 'ধর্ম-কর্ম'-তে 'অর্‌ম' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, পাওয়া গেল পদান্ত্যমিল। তৃতীয় দৃষ্টান্তে পঙ্‌ক্তিদুটির শেষে 'পাক-ডাক'-এ 'আক্‌' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে তৈরি হল পঙ্‌ক্তি-অন্তক মিল। সবশেষে চতুর্থ দৃষ্টান্তে চরণদুটির শেষে 'ঝর্ণা-বর্ণা'-তে 'অর্‌ণা' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি এনে দিল চরণান্ত্য মিল।

৩৯.১০ সারাংশ-৩

সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ঃ

কেটে কেটে উচ্চারণের হ্রস্ব হওয়া, আর টেনে টেনে উচ্চারণে দীর্ঘ হওয়া দল বা অক্ষরের একটি স্বভাব। হ্রস্ব উচ্চারণে হয় দলের সংকোচন এবং ১-মাত্রা, দীর্ঘ উচ্চারণে হয় দলের প্রসারণ এবং ২-মাত্রা। মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষর) উচ্চারণে সংকোচনই স্বাভাবিক এবং ১-মাত্রায় প্রায় নির্দিষ্ট। কোনো কোনো কবিতায় মুক্তদলের উচ্চারণে ঘটে প্রসারণ, তখন তার ২-মাত্রা।

রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষর) উচ্চারণে প্রসারণই স্বাভাবিক, তখন তার ২-মাত্রা। তবে, সংকোচনে বাধা নেই, তখন রুদ্ধদলের ১-মাত্রা। রুদ্ধদলের উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম 'সংশ্লেষ', প্রসারণের নাম 'বিশ্লেষ'। অর্থাৎ-এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, 'বিশ্লেষ'-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ।

শ্বাসাঘাত, প্রস্বর ঃ

পর্বের মাঝখানে কোনো অক্ষরের (দলের) স্বরধ্বনি অন্য অক্ষরের তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলে সেই অক্ষরের ওপর যে বাড়তি ঝোঁক পড়ে, তাকে অমূল্যধন বলেন 'শ্বাসাঘাত'। বিশেষ এক শ্রেণির

কবিতার স্তবকে পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদলের) ওপর, হলন্ত অক্ষর না-থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষত্ররের (মুক্তদলের) ওপর 'শ্বাসাঘাত' পড়ে।

প্রবোধচন্দ্রের মতে, যে কোনো কবিতার স্তবকে প্রতি পর্বের প্রথম দলের ওপর যে তীব্র ঝোঁক পড়ে, তার নাম 'প্রস্বর'।

তান, মিল ঃ

বিশেষ এক শ্রেণির কবিতায় চরণের উচ্চারণে শ্রোতার কানে চলতে থাকে ধ্বনির প্রবাহ, চরণ শেষ হবার পরেও সুরের রেশ থেকে যায় শ্রোতার মনে। সুরের এই টানটুকুকে অমূল্যধন বলেন 'তান'।

একই স্তবকের মাঝখানে পৃথক পৃথক পর্ব চরণ পদ বা পঙ্‌ক্তির শেষে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ফিরে ফিরে আসাকে বলে মিল।

৩৪.১১ অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৬ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে লিখুন ঃ

তান, মিল।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ

শ্বাসাঘাত আর প্রস্বর, সংশ্লেষ আর বিশ্লেষ।

২. সঠিক ছন্দবিভাগ করে পর্বান্ত্য পদান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক আর চরণান্ত্যক মিলের ১টি করে দৃষ্টান্ত দিন।

৩. (ক) দলগুলিকে পৃথক করুন, দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিয়ে পর্ব-বিভাগ করুন, সঠিক মাত্রার ওপর শ্বাসাঘাত-চিহ্ন বসিয়ে দিন ঃ

i) এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর

ii) ময়রা মুদি চক্ষু মুদি
পাটায় বসে ঢুলছে কসে

iii) আর কেঁদো না আর কেঁদো না ছোলাভাজা দেব
আবার যদি কাঁদ তবে তুলে আছাড় দেব

iv) মেঘের উপর, মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ

(খ) দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিন, সঠিক মাত্রার ওপর প্রস্বর-চিহ্ন বসিয়ে দিন ঃ

i) কোথায় ফলে সোনার ফসল সোনার কমল ফোটে রে

ii) সবমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে

iii) রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি

iv) হে আদিজননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার

৩৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক পর্যায়ের পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দ	পৃ-২৪০-৪২	পৃ-২১-২২	পৃ-৯-১৫
বর্ণ	পৃ-১, ২৪-২৭, ২৬০	পৃ-২৩-২৪	পৃ-৩০-৩৩
ধ্বনি	পৃ-২৪-২৭, ২৬৫-৬৭,৩০৫	পৃ-২৩-২৪	পৃ-৩০-৩৩
অক্ষর	×	পৃ-৫,১৪,১৫,২২-২৩,১৬৭	×
দল	পৃ-১,২৭-২৯, ২৪৫-৪৬,	×	পৃ-৩৪-৩৭
মাত্রা	পৃ-১,২৬১	পৃ-৫, ৭, ৩১	পৃ-২৪-২৬
কলা	পৃ-১, ২৩৬-৩৭	×	পৃ-৮৭-৮৮
ছেদ	×	পৃ-৭, ২৪-২৭, ১৪১-৪৭	পৃ-৪০-৪১
যতি	পৃ-৯, ১৬-১৭, ২৬৯-৭০	পৃ-১-৩, ২৭-২৮	পৃ-৪০, ৪১
পর্ব	পৃ-৯৫-১১১, ২৫২-৫৩	পৃ-২৭-২৮	পৃ-৪১-৪৮
পদ	পৃ-১১১-২১, ২৪৯	×	পৃ-৫২-৫৯
পর্বাঙ্গ	×	পৃ-৯-১২, ৩০, ৩১,৫২	×
উপপর্ব	পৃ-৯৪-৯৫, ২৩৫-৩৬	×	পৃ-৪৮
চরণ	×	পৃ-১, ৬৭, ৬৮	×
পঙ্‌ক্তি	পৃ-১২১-৬৫, ২৪৭-৪৮	×	পৃ-৫৯-৬০
স্তবক	পৃ-১৬৫-৭০	পৃ-৬৮,৬৯,৮১-৮৪	×
শ্লোক	পৃ-১৬৫-১৭০	×	×
শ্বাসাঘাত	×	পৃ-৪৪-৫০	×
প্রস্বর	পৃ-৮-৯, ১৫,২৫৭-৫৮	×	পৃ-৬০-৬১
সংশ্লেষ	পৃ-২৬০, ২৯৬	×	×
বিশ্লেষ	পৃ-২৬০	×	×
তান	×	পৃ-১০০	×
মিল	পৃ-৫৫-৬৩,২৬৪	পৃ-৬৯	পৃ-১৩৯-৪৫

একক ৩৫ ❐ বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

গঠন

৩৫.১ উদ্দেশ্য

৩৫.২ প্রস্তাবনা

৩৫.৩ মূলপাঠ

৩৫.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি

৩৫.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

৩৫.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি

৩৫.৪ সারাংশ

৩৫.৫ অনুশীলনী

৩৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৩৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়লে—

- বুঝে নিতে পারবেন, কীভাবে ছন্দের দিক থেকে কবিতার শরীরের গঠন অঙ্কের হিসেবের মধ্যে ধরা পড়ে যায়।
- বাংলায় লেখা অসংখ্য কবিতার উচ্চারণে ভঙ্গি যে কেবল ৩-রকমের ছন্দরীতিতেই ভাগ হয়ে যায়, এই তথা আপনার কাছে স্পষ্ট হবে, এবং কোন কবিতা কোন ছন্দ রীতিতে লেখা, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তা আপনার কানে ধরা পড়বে।
- যেকোনো বাংলা কবিতা সঠিক ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট জায়গায় থামা আর সঠিক সময় ধরে উচ্চারণ করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারবেন।
- অজানতে হোক বা জেনেশুনে হোক, ছন্দের কোনো-কোনো নিয়ম মেনে চলতে কবিরা যে বাধ্য, এই সত্য বুঝে নিয়ে যেকোনা কবিতার ছন্দ বিচার করতে পারবেন।
- ছন্দের নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝে নিয়ে ছন্দের দিক থেকে নিখুঁত কবিতা লেখা সহজ হতে পারে।

৩৫.২ প্রস্তাবনা

সব কবিতা ছন্দের দিক থেকে একই রীতি বা পদ্ধতিতে লেখা হয় না, একই কবির লেখা হলেও নয়, একই বিষয় নিয়ে লেখা হলেও না হতে পারে। এই রীতি বা পদ্ধতি কী ধরনের হবে, তা নির্ভর করে কবি যে নীতিতে

ধ্বনির পর ধ্বনি সাজিয়ে কবিতাটি লিখবেন, তার ওপর। বাংলা কবিতার ছন্দরীতি ক′ -রকমের হতে পারে, এ নিয়ে বহু বছর ধরে বিস্তর বিতণ্ডা চালিয়ে অবশেষে ছান্দসিকেরা মোটামুটি একমত হলেন, বাংলা কবিতায় কবিরা প্রধানত ৩-ধরনের ছন্দরীতিই ব্যবহার করে থাকেন। সংখ্যার বিতর্ক কেটে গেলেও নামের বিতর্ক এখনো কাটেনি। তবে, বিতর্ক থাকলেও প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের তৈরি ৩-জোড়া নামই ছন্দজিজ্ঞাসুদের কাছে প্রিয়। এই এককের মূলপাঠ থেকে বাংলা কবিতার ছন্দরীতি বুঝে নিয়ে আপনারাই স্থির করতে পারবেন—কোন নাম কতখানি সার্থক।

৩৫.৩ মূলপাঠ

বাংলা কবিতার ছন্দরীতি যে ৩টিই, এটা স্থির হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক ছান্দসিক পৃথক পৃথক যুক্তি দেখিয়ে ৩টি ছন্দরীতির ৩টি করে নাম সুপারিশ করে গেলেন। শেষপর্যন্ত মোটামুটি বহাল রইল প্রবোধচন্দ্র অমূল্যধনের তৈরি নাম। প্রবোধচন্দ্রের কাছে যে রীতি দলবৃত্ত, অমূল্যধনের কাছে তা শ্বাসাঘাতপ্রধান ; প্রবোধচন্দ্রের কলাবৃত্ত-ই অমূল্যধনের ধ্বনিপ্রধান ; আর, প্রবোধচন্দ্রের মিশ্রবৃত্ত অমূল্যধনের কাছে তানপ্রধান। এঁদের পদ্ধতি পৃথক, সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এক। কখনো দুজনের পদ্ধতি মেনে, কখনো একটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরপর ৩টি ছন্দরীতির আলোচনা করা হচ্ছে এই এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করে। এক-একটি অংশে পাবেন এক-একটি রীতির সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য দলের মাত্রা, সঙ্গে থাকবে দৃষ্টান্ত।

৩৫.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি

দলবৃত্ত আর শ্বাসাঘাতপ্রধান একই ছন্দরীতির দুটি নাম। এ-রীতির ছন্দে প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, সে-দল মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক। অর্থাৎ, দলই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম প্রবোধচন্দ্র রাখলেন দলবৃত্ত। আবার, অমূল্যধন লক্ষ করলেন, এ-রীতিতে প্রতিটি পর্বে অন্ততপক্ষে ১টি করে শ্বাসাঘাত পড়ে-ই। অতএব, এর নাম হল শ্বাসাঘাতপ্রধান। নীচের দৃষ্টান্তগুলি একটা-একটা করে উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন ঃ

(১) প্রতিটি দলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে কেটে)।

(২) যে দলের মাথায় মাত্রাচিহ্নের (১) ওপর রেফ্-চিহ্ন দেওয়া হল, তার উচ্চারণে আশপাশের অন্য দলের তুলনায় বাড়তি ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত পড়েছে।

	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১		
১.	হায়্ রে	কবে	কেটে	গেছে	কালিদাসের্	কাল	‖	=৪ + ৪ + ৪ + ১
	১ ১ ১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১		
	পন্ডিতেরা	বিবাদ্	করে	লয়ে	তারিখ্	সাল্	‖	=৪ + ৪ + ৪ + ১

১ ১　　১ ১ | ১ ১　　১ ১ | ১ ১　　১ ১ | ১ ||

২. ইল্‌শে　　গুঁড়ি | ইল্‌শে　　গুঁড়ি | ইলিশ্‌　　মাছের | ডিম্‌ || =৪ + ৪ + ৪ + ১

১ ১　　১ ১ | ১ ১　　১ ১　　১ ১　　১ ১ | ১ ||

ইল্‌শে　　গুঁড়ি | ইল্‌শে　　গুঁড়ি　　দিনের　　বেলায় | হিম্‌ || =৪ + ৪ + ৪ + ১

লক্ষ করুন, ২টি দৃষ্টান্তেই প্রতিটি দল বা অক্ষরের মাথায় ১টি করে মাত্রার সংকেত। এটাও লক্ষ করুন, শ্বাসাঘাত পড়ছে প্রতিটি রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষরের ওপর, যে-পর্বে রুদ্ধদল নেই সেখানে অবশ্য শ্বাসাঘাত পড়ছে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) ওপর।

প্রতিটি চরণের ডানদিকে দেওয়া অঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন—

প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার, শেষে অপূর্ণ পর্ব ১-মাত্রার। এ ছন্দরীতিতে প্রায় সব পূর্ণপর্বই ৪-মাত্রার হয়ে থাকে। তবে, প্রবোধচন্দ্র দলবৃত্ত রীতির কোনো কোনো পর্বে ৭মাত্রা ধার্য করে থাকেন। দেখুন এই দৃষ্টান্ত দুটি—

১ ১ ১　　১ ১ ১ ১ | ১ ১　　১ ১

১. আগুনের্‌　　পরশ্‌মণি | ছোঁয়াও　　প্রাণে = ৭ + ৪

১ ১ ১　　১ ১　　১ ১ | ১ ১　　১ ১

এ জীবন্‌　　পুণ্‌্য　　করো | দহন্‌　　দানে = ৭ + ৪

১ ১ ১　　১ ১ ১ ১

২. বাবুদের্‌　　তাল্‌পুকুরে = ৭

১ ১ ১　　১ ১ ১ ১

হাবুদের্‌　　ডাল্‌পুকুরে = ৭

১ ১　　১　　১ ১　　১ ১

সে কি　　বাস্‌　　কর্‌লে　　তাড়া = ৭

১ ১　　১　　১ ১　　১ ১

বলি　　থাম্‌　　একটু　　দাঁড়া = ৭

অমূল্যধন ৭-মাত্রার প্রতিটি পর্বই দুভাগে ভাগ করে নেবেন—হয় ৩+৪ মাত্রার ২টি পর্বে, না-হয় ৩-মাত্রার প্রথম পর্বটিকে অতিপর্ব হিসেবে গণ্য করে, ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব বের করে আনবেনই।

৩৫.৩.২ ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

যে ছন্দ-রীতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে কলাবৃত্ত, তা-ই অমূল্যধনের কাছে ধ্বনিপ্রধান। প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে আগেই জেনেছেন—১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। এখন যে ছন্দ রীতির আলোচনা করছি, সেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি ; প্রতিটি রুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ 'কলা'-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম **কলাবৃত্ত**।

প্রবোধচন্দ্র শেখালেন—'কলা' একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিপরিমাণ, অতএব, 'কলাবৃত্ত' রীতিতে প্রতিটি দলের অন্তর্গত ধ্বনিপরিমাণের হিসেব নির্দিষ্ট, দলের মাত্রা-ও নির্দিষ্ট। অমূল্যধনও এ কথাই বলেন একটু অন্যরকম ভাষায়। তাঁর কথাতেও, এ-রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান। স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি ধ্বনির হিসেব এখানে রাখতে হয়। এই কারণে, স্বরান্ত অক্ষর (মুক্তদল) এ-রীতিতে হ্রস্ব হলেও হলন্ত অক্ষর (রুদ্ধদল) দীর্ঘ হতে চায়। অর্থাৎ, স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা আর হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা নির্দিষ্ট। অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণ বা ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে মাত্রা নির্দিষ্ট হয় বলেই এ রীতির নাম **ধ্বনিপ্রধান**।

নীচের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করুন ঃ

(১) প্রতিটি মুক্তদলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে-কেটে)।

(২) প্রতিটি রুদ্ধদলের উচ্চারণ দীর্ঘ, ২-মাত্রার (টেনে-টেনে)।

	১ ১	১ ১	২ ১ ১	১ ১	২		
১.	খ্যাতি	আছে	সুন্‌দরী	বলে	তার্		= ৪+৪ +৪
	১ ১	১ ১	২ ১১	১ ১	২		
	ত্রুটি	ঘটে	নুন্ দিতে	ঝোলে	তার্		= ৪+৪ +৪
					(প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)		
	১ ২ ১ ১	২ ১ ১১	১ ১ ১	১ ১	২		
২.	নূতন্ জাগা	কুন্‌জবনে	কুহরি	উঠে	পিক্		= ৫+৫+৫+২
	১ ২ ২	২ ১ ১১	১ ২	২	২		
	বসন্‌তের্	চুম্‌বনেতে	বিবশ্	দশ্	দিক্		= ৫+৫+৫+২
	২ ১ ১ ২	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১			
৩.	ঐ আসে ঐ	অতি	ভৈরব	হরষে			= ৫+৫+৫+২
	১১ ২১১	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১			
	জলসিন্‌চিত	ক্ষিতি	সৌরভ	রভসে			= ৬+৬+৩

২ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১১১ | ১ ১
৪. মন্ত্রে সে যে পূত | রাখীর রাঙা সুতো | বাঁধন্ দিয়েছিনু | হাতে
=৭+৭+৭+২

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১১ ||
৫. তোমারে ডাকিনু যবে | কুন্জবনে || = ৮+৫

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ||
তখনো আমের্ বনে | গন্ধ ছিল || = ৮+৫
(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

৬. আম্রের্ মন্জরী গন্ধ বিলায় ||

২ ২ ২ ২ ২ ১ | ১ ২ ||
চম্পার সৌরভ্ শূন্যে | মিলায় || =৮+৬
(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

দেখা গেল, কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রা থেকে ৮-মাত্রা পর্যন্ত যেকোনা মাপের হতে পারে। তবে, অমূল্যধন অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্তে ৮-মাত্রার পূর্ণপর্বই পাবেন ('খ্যাতি আছে সুন্দরী' আর 'ত্রুটি ঘটে নুন্ দিতে'), এ রীতিতে ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব তিনি মানেন না। অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র পঞ্চম দৃষ্টান্তে পাবেন ৮ আর ৫-মাত্রায় ২-টি জোড়া-পর্বের পদ, আর ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে পাবেন ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব, ৮-মাত্রার পর্ব তিনি পারতপক্ষে মানেন না।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, এ কথা জানলেন। এরপর এই রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখবেন। ২-মাত্রার মুক্তদল পাবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। দৃষ্টান্ত দেখুন—

২ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২১ ||
১. মন্দির বাহির | কঠিন কপাট ||

১১ ১১ | ২ ২ | ২ ২
২. তব শুভ | নামে | জাগে

১১ ১১ | ২ ১ ১ | ২ ২
তব শুভ | আশিস | মাগে

২ ২ | ১ ১ ১ ১ | ২ ২
গাহে | তব জয় | গাথা (প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)

	২	১ ১	২	১ ১	|	২ ১ ১	১ ১ ১ ১	|	
৩.	রে	সতি	রে	সতি	|	কাঁদিল	পশুপতি	|	
						২ ১ ১	১ ১	১ ১ ২	||
						পাগল	শিব	প্রমথেশ্	||

	২ ১	২ ১ ১ ১	|	২ ১	১ ১ ১ ১	||
৪.	নীল	সিন্ধুজল	|	ধৌত	চরণতল	||
	১ ১১	১ ২ ১ ১	|	২ ১ ১	২১ ১	||
	অনিল-বিকম্পিত		|	শ্যামল	অন্চল	||

মোটা হরফের প্রতিটি দলই মুক্তদল, তবু এদের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। লক্ষ করুন, দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়া প্রতিটি মুক্তদল এখানে বানানেও দীর্ঘস্বরান্ত (অর্থাৎ দলের শেষে আ-কার ঈ-কার এ-কার)। বানানে হ্রস্স্বরান্দ দলুগলি ১-মাত্রাই পেল। তাহলে ওপরের দৃষ্টান্তকটিতে দলের মাত্রাগোনার নিয়মটা এইরকম দাঁড়ায় ঃ

(১) প্রতিটি হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের হ্রসব উচ্চার, ১-মাত্রা।

(২) প্রতিটি দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

(৩) প্রতিটি রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

তবে, ব্যতিক্রম কিছু কিছু থাকবেই, যেখানে মুক্তদল বানানো হ্রস্বস্বরান্ত হয়েও উচ্চারণে দীর্ঘ বা বানানে দীর্ঘস্বরান্ত হয়েও উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে। এমনকী, রুদ্ধদলও কখনো কখনো উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে পড়ে। তাহলেও হ্রস্ব উচ্চারণে ১-মাত্রা আর দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রা—এ নিয়ম সব সময় বহাল থাকবে। ছন্দরীতি অবশ্যই কলাবৃত্ত, তবু আগেকার দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় এদের মাত্রারীতি একটু অন্যরকম, বিশেষ করে মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়ার ক্ষেত্রে। সংস্কৃত কাব্য কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে চর্যাপদে, এবং ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এ রীতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। এই কারণে প্রবোধচন্দ্র একে বলেন প্রাচীন কলাবৃত্ত। এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্র- কলাবৃত্ত'। তবে আধুনিক কালের কবিতায় এর প্রয়োগ কিছু কিছু যে হয়েছে, শেষ ৩টি দৃষ্টান্ত তারই নমুনা।

৩৫.৩.৩ মিশ্রণ বা তানপ্রধান রীতি

বাংলা ছন্দের আর-একটি রীতিরও দুটি নাম পাশাপাশি চলছে—**মিশ্রবৃত্ত** আর **তানপ্রধান**। আমরা জেনেছি—দলবৃত্ত রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদলও ১-মাত্রার। কলাবৃত্তে মুক্তদল ১-মাত্রার, কিন্তু রুদ্ধদল ২-মাত্রার। আর, আমাদের আলোচ্য রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট হলেও রুদ্ধদল কিন্তু ১-মাত্রার হতে পারে, আবার ২ মাত্রারও হতে পারে। এটা নির্ভর করে রুদ্ধদলটি শব্দের (word) শুরুতে আছে, না মাঝখানে, না

শেষে—তার ওপর। শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে রুদ্ধদল হবে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার আপনার আগেই জেনেছেন,—রুদ্ধদলের ১-মাত্রা হয় দলবৃত্ত রীতিতে, ২-মাত্রা হয় কলাবৃত্ত রীতিতে। আলোচ্য রীতিতে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করলেন রুদ্ধদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল **মিশ্রবৃত্ত**। ধরুন 'রুদ্ধদল' শব্দটি। এতে আছে ৩টি দল—রুদ্‌-ধ-দল্‌। 'রুদ্‌' আর 'দল্‌'—দলবৃত্ত রীতিতে ১-মাত্রার, কলাবৃত্ত রীতিতে ২-মাত্রার। কিন্তু, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে 'রুদ্‌' ১ মাত্রা পায় শব্দের শুরুতে আছে বলে, আর, 'দল্‌' ২-মাত্রা পায় শব্দের শেষে আছে বলে। 'রুদ্‌'-এর ১-মাত্রা পাওয়াটা যেমন দলবৃত্ত স্বভাব, 'দল্‌'-এর ২-মাত্রা পাওয়াটাও তেমনি কলাবৃত্ত-স্বভাব।

'তান' কথাটি অমূল্যধন কী অর্থে ব্যবহার করেন, তা আপনারা আগেই জেনেছেন। এইমাত্র জানলেন, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) মিশ্র স্বভাব দেখে এক শ্রেণির কবিতার ছন্দ-রীতিকে প্রবোধচন্দ্র বললেন 'মিশ্রবৃত্ত'। সেই একই শ্রেণির কবিতা পড়তে পড়তে অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে একটা টানা সুর। এই টানা সুর বা সুরের টান বা 'তান'-কেই এ ছন্দরীতির বিশেষ লক্ষণ বলে তাঁর কাছে মনে হল। সেই কারণেই এ-রীতিকে তিনি বললেন **তানপ্রধান**।

এ 'তান' বা সুর সব শ্রোতার কানে না-ও বাজতে পারে। এ-রীতির 'তানপ্রধান' নামটিও তেমন পাঠক-শ্রোতার কাছে অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। তবে, দলের মাত্রা নিয়ে একটু আগে যা লেখা হল, সে-বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

অতএব, যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদল শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে থাকলে ২-মাত্রার, তাকেই বলব মিশ্রবৃত্ত। স্তবক পড়তে পড়তে কানে সুর বাজুক বা না-ই বাজুক, ঐ মিশ্রবৃত্তেরই অন্য নাম তানপ্রধান।

ধরুণ নীচের দৃষ্টান্তটি—

			১ ১	১ ১	১ ২ ১ ১ ১ ‖			
			শুধু	তব	অন্‌তর্‌বেদনা ‖			= ০ + ১০
১ ১ ২	১ ১	২ |	১ ১ ২	১ ১	১	১ ১ ১ ‖		
চিরন্‌তন্‌	হয়ে	থাক্‌ |	সম্‌রাটের্‌	ছিল	এ	সাধনা ‖		= ৮ + ১০

লক্ষ করুন,

(১) শুধু ত ব ইত্যাদি প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রা।

(২) শব্দের শুরুতে থাকা অন্‌ সম্‌ রুদ্ধদল-দুটি ১-মাত্রার।

(৩) শব্দের মাঝখানে-থাকা রন্‌ (চি-রন্‌-তন্‌) রুদ্ধদলটি ১-মাত্রার।

(৪) শব্দের শেষে থাকা তর্‌ (অন্‌-তর্‌), তন্‌, টের রুদ্ধদল-তিনটি ২-মাত্রার।

(৫) একটিমাত্র রুদ্ধদল দিয়ে তৈরি 'থাক্‌' শব্দটিও ২-মাত্রার।

এখানে ২টি কথা মনে রাখবেন—

(১) 'অন্‌তর্‌বেদনা' কথাটি ভাঙলে পাবেন ২টি পৃথক্ শব্দ 'অন্‌তর্' আর 'বেদনা'। 'তর্' রুদ্ধদলটি 'অন্‌তর্' শব্দের শেষে আছে, তাই ২-মাত্রার। এ রকম ২টি বা ৩টি শব্দের সমাজে তৈরি জোড়-লাগা কথা ভেঙে নেবেন।

(২) 'থাক্' রুদ্ধদলটি শব্দের একমাত্র দল। এ রকম রুদ্ধদলে ২-মাত্রাই ধরবেন।

এবারে নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে লক্ষ করুন ঃ

(১) প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা।

(২) রুদ্ধদলে ১-মাত্রা শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে।

(৩) রুদ্ধদলে ২-মাত্রা শব্দের শেষে

(৪) শব্দের একমাত্র রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১. এই সূর্‌যকরে এই পুষপিত কাননে = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

জীবন্‌ত হৃদয়্-মাঝে যদি স্থান্ পাই = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২

২. এ কথা জানিতে তুমি ভারত্-ঈশ্‌শর শা-জাহান্ = ৮+১০

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২

কালস্রোতে ভেসে যায়্ জীবন্ যৌবন্ ধনমান্ =৮+১০

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১১ ১ ১ ২ ১ ১

৩. নামে সন্‌ধ্যা তন্‌দ্রালসা সোনার্ আঁচল্-খসা হাতে দীপ্‌শিখা =৮+৮+৬

১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১১১১

দিনের্ কল্‌লোর পর্ টানি দিল ঝিল্‌লিস্‌স্বর্ ঘন যবনিকা =৮+৮+৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২

৪. পৃথিবী ডাকিছে আপন্ সন্‌তানে বাতাস্ ছুটিছে তাই =৬+৬+৬+২

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের্ সন্‌ধানে চলিয়াছে কত ভাই =৬+৬+৬+২

এই দৃষ্টান্ত-কটি থেকে লক্ষ করলেন, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে, পূর্ণপর্ব ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে।

৩৫.৩.৩ সারাংশ

বাংলা কবিতার ৩টি ছন্দরীতির চলতি নাম দলবৃত্ত-কলাবৃত্ত-মিশ্রবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান তান প্রধান। প্রথম ৩টি নাম প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া, পরের ৩টি অমূল্যধনের।

দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি ঃ

যে ছন্দরীতিতে দল-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'দলবৃত্ত'। এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত লক্ষ করে অমূল্যধন এর নাম দিলেন 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি দলের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অমূল্যধনের বিবেচনায় এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদল) ওপর, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি ঃ

যে ছন্দরীতিতে কলা-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'কলাবৃত্ত'। যেহেতু, এ রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান, এবং ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে অক্ষরের মাত্রাও নির্দিষ্ট হয়, সেই কারণে অমূল্যধন একে বলেন 'ধ্বনিপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) হ্রস্ব উচ্চারণ ১-মাত্রা, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা ; পূর্ণপর্বে ৪ থেকে ৭ মাত্রা প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে, ৫ থেকে ৮ মাত্রা অমূল্যধনের হিসেবে।

সংস্কৃত কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলাভাষায় লেখা চর্যাপদে আর ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এমন এক ধরনের 'কলাবৃত্ত' ছন্দরীতি প্রয়োগ করা হত, সেখানে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল ২-মাত্রা পায়। হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের ১-মাত্রা আর রুদ্ধদলের ২-মাত্রা অবশ্য বহাল থাকে। প্রবোধচন্দ্রের কথায় এ ছন্দরীতির নাম 'প্রাচীন কলাবৃত্ত'। আধুনিক কালের কিছু কিছু কবিতায় এ রীতির প্রয়োগ রয়েছে।

মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি ঃ

রুদ্ধদলের মাত্রার হিসেব দিয়েই প্রবোধচন্দ্র ছন্দরীতি নির্ধারণ করেন। প্রতিটি রুদ্ধদল যেখানে ১-মাত্রার, রুদ্ধদলের সেখানে দলবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে দলবৃত্ত। প্রতিটি রুদ্ধদল যেখানে ২-মাত্রার, রুদ্ধদলের সেখানে কলাবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে কলাবৃত্ত। কিন্তু, রুদ্ধদল যেখানে শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে ২-মাত্রার, সেখানে তার দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—১ মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব আর ২-মাত্রার কলাবৃত্ত-স্বভাব। ছন্দরীতিও তখন দুটি রীতির মিশ্রণে তৈরি। অতএব, এ রীতির নাম 'মিশ্রবৃত্ত'।

একই রীতির কবিতা পড়তে পড়তে একটা টানা সুর অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে বলে এই সুরের টানা বা 'তান'-কেই তাঁর এ রীতির বিশেষ লক্ষণ বলে মনে হত। অতএব, এ ছন্দরীতির নাম হল 'তানপ্রধান'। এ রীতেতে পূর্ণপর্বে সাধারণ ৬, ৮ বা ১০ মাত্রা।

৩৫.৫ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৬ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত

(খ) কেন এই নামকরণ, বুঝিয়ে দিন ঃ

শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান।

২. (ক) নীচের ছন্দরীতিতে কোন দলে কত মাত্রা, লিখুন ঃ দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত।

(খ) নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিন, পূর্নযতির পরে প্রতিপর্বের মাত্রাসংখ্যা লিখুন, নীচে ছন্দরীতির নাম লিখুন ঃ

i) বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপ-মালা

ii) এ গোঁফ যদি আমার বলিস করবো তোদের জবাই,
এই না বলে জরিমানা কল্‌লেন তিনি সবায়।

iii) আকাশে অসংখ্য তারা
চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা
হেরি একদিঠি

iv) হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।

(গ) কোন ছন্দরীতিতে সাধারণত কত মাত্রার পূর্ণপর্ব থাকে, লিখুন।

৩. (ক) বিকল্প পরিভাষা কী, লিখুন ঃ

দলবৃত্ত, তানপ্রধান, কলাবৃত্ত

(খ) কোন ছন্দরীতিতে প্রতিটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, লিখুন।

(গ) কোন ছন্দরীতিতে প্রতিটি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা, লিখুন।

(ঘ) কোন ছন্দরীতিতে রুদ্ধদলে কখনো ১-মাত্রা, কখনো ২-মাত্রা, লিখুন।

(ঙ) কোন ছন্দরীতিতে মুক্তদলে কখনো ১-মাত্রা কখনো ২-মাত্রা, লিখুন।

৩৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

ছন্দরীতি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দরীতি	পৃ-৩১, ৩২	পৃ-৯৮	×
দলবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৪৬	×	পৃ-৬৫, ৭১-৮৬
শ্বাসঘাতপ্রধান	×	পৃ-১০৯-১২	পৃ-৬৯
কলাবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫,২৩৭	×	পৃ-৬৫,৬৬,৮৭-৯৮
ধ্বনিপ্রধান	×	পৃ-১০৬-০৮	পৃ-৬৮
মিশ্রবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৬৫	×	পৃ-৬৬-৬৯,১০০-০৮
তানপ্রধান	×	পৃ-৯৯-১০৬	পৃ-৬৮

একক ৩৬ ❐ বাংলা ছন্দোবন্ধ

গঠন

৩৬.১ উদ্দেশ্য

৩৬.২ প্রস্তাবনা

৩৬.৩ মূলপাঠ-১ ঃ পয়ার

৩৬.৪ সারাংশ-১

৩৬.৫ অনুশীলনী-১

৩৬.৬ মূলপাঠ-২ ঃ অমিত্রাক্ষর

৩৬.৭ সারাংশ-২

৩৬.৮ অনুশীলনী-২

৩৬.৯ মূলপাঠ-৩ ঃ চতুর্দশপদী

৩৬.১০ সারাংশ-৩

৩৬.১১ অনুশীলনী-৩

৩৬.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

৩৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৩৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ার পর—

- এমন একটি কৌশল আয়ত্ত হওয়া সম্ভব, যার সাহায্যে বুঝে নিতে পারবেন—একটি কবিতায় ছত্রের পর ছত্র ধরে ছন্দ আর অর্থ পাশাপাশি কীভাবে চলতে থাকে, চলতে চলতে এরা কে কোথায় সীমানা খুঁজে পায় আর থামে, এবং এই চলা আর থাা থেকে ছন্দ-অর্থের কী সম্পর্ক তৈরি হয়।
- ছত্রের পর ছত্র সাজাতে গিয়ে ছন্দ আর অর্থের সম্পর্ককে কবি কোন শাসনে বাঁধলেন, তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।
- ছত্রের বিন্যাসে আর ছন্দ-অর্থকে পাশাপাশি চালানোতে কবির দক্ষতা কতখানি, তার পরিমাপ করতে পারবেন।
- প্রথার একঘেয়ে শাসন থেকে কবিরা ক্রমশ বাংলা কবিতার ছন্দকে কীভাবে মুক্ত করে আনলেন, তা আন্দাজ করতে পারবেন।

৩৬.২ প্রস্তাবনা

ছত্রনির্মাণ ছত্রবিন্যাস মিলের ব্যবহার আর ছত্রের পর ছত্র ধরে চলতে-থাকা ছন্দ-অর্থের সম্পর্ক—এসব নিয়ে ছন্দের দিক থেকে কবিতার শরীর গঠনের প্রক্রিয়া প্রায় নির্দিষ্ট বাঁধা ছিল বহুকাল। প্রথার শাসনকে অমান্য করার মতো জোরা বাঙালি কবির ছিলই না। ছন্দের এই বাইরের বন্ধন কী ধরনের ছিল, তা থেকে বাংলা কবিতার মুক্তির পথ কীভাবে তৈরি হল, সেইসঙ্গো বিরক্তিকর একঘেয়েমি কাটিয়ে কবিতার শরীর গঠনে ক্রমশ বৈচিত্র্য কীভাবে এল—তার খানিকটা আভাস এই এককের পাঠে তুলে ধরা হল।

ছন্দরীতির আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, দলের (বা অক্ষরের) সঠিক উচ্চারণ (টেনে-টেনে বা কেটে-কেটে) থেকে বেরিয়ে আসে দলের সঠিক মাত্রা, পর্বের মধ্যে সেই মাত্রার বিন্যাস থেকেই ক্রমশ ধরা পড়ে পর্বের পঙ্‌ক্তির (বা চরণের) স্তবকের, অবশেষে একটি গোটা কবিতার ছন্দ-স্বভাব—ছন্দের ভেতরকার পরিচয়। এবারে এগিয়ে চলুন ছন্দের বাইরের একটা পরিচয়ের দিকে, ছান্দসিকেরা যাকে বলেন **ছন্দোবন্ধ**। ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, আর 'ছন্দোবন্ধ' ছন্দের আকৃতি। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, **'ছন্দোবন্ধ'** নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের ওপর। কোন্ দল কত মাত্রা ধরে উচ্চারণ করব—এর ওপর নির্ভর করে ছন্দরীতি। মাত্রাবিন্যাসের পর যতি কোথায় পড়বে, অর্থাৎ পর্বের মাপ কত মাত্রার হবে, পর্বের পর পর্ব সাজিয়ে কীভাবে পঙ্‌ক্তি বা চরণ তৈরি করব—এর ওপর নির্ভর করে 'ছন্দোবন্ধ'

নীচের দৃষ্টান্ত-দুটি দেখুন—

	২ ১ ১	২ ১ ১	|	২ ১ ১ ২		‖	
১.	তাল্‌গাছে	তাল্‌গাছে	|	পল্‌লবচয়্		‖	= ৮ + ৬
	২ ২	২ ১ ১	|	২ ১ ১ ২		‖	
	চন্‌চল্	হিল্‌লোলে	|	কল্‌লোলময়্		‖	= ৮ + ৬

	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	|	১ ১ ১	১ ১ ১	‖	
২.	পুণ্‌ণে	পাপে	দুক্‌খে	সুখে	|	পতনে	উত্‌থানে	‖	= ৮ + ৬
	১ ২	১ ১ ১	২		|	১ ২	১ ১ ১	‖	
	মানুষ	হইতে	দাও		|	তোমার্	সন্‌তানে	‖	= ৮ + ৬

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রতিটি রুদ্ধদলের উচ্চারণ ২-মাত্রায়—অতএব, রীতি কলাবৃত্ত (বা ধ্বনিপ্রধান)। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রুদ্ধদল শব্দের প্রথমে ১-মাত্রার (পুণ্ দুক্ উত্ সন্), শব্দের শেষে ২-মাত্রার (নুষ্ মার্)—অতএব, রীতি মিশ্রবৃত্ত (বা তানপ্রধান)। ২টি দৃষ্টান্তে পৃথক্ ছন্দরীতি। এবারে যতিচিহ্ন, পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের দিকে তাকান।

২টি দৃষ্টান্তেই—

(১) অর্ধযতি (বা পর্বযতি) পড়েছে ৮-মাত্রার পর।

(২) পূর্ণবতি (পঙ্‌ক্তিযতি) পড়েছে ৮ + ৬ বা ১৪-মাত্রার পর

(৩) পূর্ণযতি (পঙ্‌ক্তিযতি) ৮-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব বা পদ ৬-মাত্রার।

(৪) প্রতি চরণে (বা পঙ্‌ক্তিতে) ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাস (বা পদবিন্যাস)।

২টি দৃষ্টান্তের এই মিল আসলে চরণ বা পঙ্‌ক্তি-গঠনের মিল। এ মিল বাইরের, এ পরিচয় বাইরের। এরই নাম 'ছন্দোবন্ধ'। ভেতরকার পরিচয়ে ভিন্ন হলেও বাইরের পরিচয়ে স্তবক-দুটি এক। ছন্দরীতি পৃথক্ হলেও এদের 'ছন্দোবন্ধ' এক।

এই এককে বাংলা কবিতার তিনরকম ছন্দোবন্ধ নিয়ে তিনটি ভাগে আলোচনা হবে—পয়ার, অমিত্রাক্ষর আর চতুর্দশপদী।

৩৬.৩ মূলপাঠ-১ ঃ পয়ার

পয়ার একটি 'ছন্দোবন্ধে'র নাম। ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাসে চরণ (বা ৮ + ৬ মাত্রার পদবিন্যাসে পঙ্‌ক্তি) তৈরি হলে তার ছন্দোবন্ধের নাম 'পয়ার'। হয়তো 'পদাকার' (পদ + আকার) কথাটি থেকে 'পয়ারে এসেছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যের ৮ + ৮ মাত্রার চরণ ক্রমশ ৮ + ৭ এবং তা থেকে ৮ + ৬-এ নেমে এসে 'পয়ারে'-র বাঁধা নিয়মে স্থির হয়ে রইল আধুনিক বাংলা কাব্য পর্যন্ত। একটু আগে যে-দুটি দৃষ্টান্ত থেকে 'ছন্দোবন্ধে'র পরিচয় পেলেন, সেই দৃষ্টান্ত-দুটি 'পয়ার' ছন্দোবন্ধের। 'পয়ার' নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। একাবলি ত্রিপদী চৌপদী—এইসব প্রাচীন ছন্দোবন্ধ বাংলা কবিতা থেকে ক্রমশ সরে গেছে অথবা সরে যাবার পথে। কিন্তু, 'পয়ার' এখনো টিকে আছে। অবশ্য তার রূপে বৈচিত্র্য এসেছে। সে বৈচিত্র্যের পরিচয় ক্রমশ পাবেন, দেখবেন—'পয়ার' কীভাবে একটি আধুনিক ছন্দোবন্ধ হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে তার নামেরও বদল ঘটেছে।

প্রাচীন ছন্দোবন্ধ হিসেবে পয়ারের মূল শর্ত ৪টি—

১. প্রতি স্তবকে ২টি চরণ (বা পঙ্‌ক্তি) থাকবে।

২. চরণ-দটির অন্ত্যমিল থাকবে (মিত্রাক্ষর)।

৩. প্রতি চরণে (বা পঙ্‌ক্তিতে) ২টি করে পর্ব (বা পদ) থাকবে।

৪. প্রথম পর্ব (বা পদ) ৮-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব বা পদ ৬-মাত্রার হবে।

নীচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ করুন—

১ ১ ১ ১ ২		১ ১	১ ১ ১	১ ২	
মহাভারতের্		কথা	অমৃত	সমান্	= ৮ + ৬
১ ১ ২	২	১ ১	১ ১	১ ১ ২	
কাশীরাম্	দাস্	কহে	শুনে	পুণ্‌বান্	= ৮ + ৬

স্তবকটিতে পয়ারের ৪টি শর্তেরই পূরণ হয়েছে। এটাও জেনে রাখা ভালো—পয়ার ছন্দোবন্ধে লেখো সব পুরোনো কবিতারই ছন্দ-রীতি ছিল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান। আসলে ছন্দ-রীতির এসব আধুনিক নাম চালু হবার আগে পর্যন্ত অমূল্যধন তো তানপ্রধান রীতির পরিচয় দিতেন পয়ারজাতীয় ছন্দ হিসেবেই।

ক্রমশ বৈচিত্র্য এল আধুনিক কবিতার পয়ারের রূপে। প্রবোধচন্দ্র তিনি দিক থেকে এ বৈচিত্র্য তুলে ধরলেন—আয়তনের দিক থেকে, ছন্দ-রীতির দিক থেকে, গতিভঙ্গির দিক থেকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে পর পর পয়ারের বৈচিত্র্য লক্ষ করুন—

১. আয়তনের দিক থেকে পয়ারের ২টি রূপ ঃ পয়ারের যে ৪টি মূল শর্তের কথা আগে জেনেছে, তার চতুর্থ শর্তে ছিল পয়ারের একটিমাত্র আয়তন বা দৈর্ঘ্যের উল্লেখ। পয়ারের আয়তন ছিল নির্দিষ্ট—৮ + ৬ মাত্রা। প্রথম পর্বের (বা পদের) ৮-মাত্রা ঠিক রেখে দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) দৈর্ঘ্য কোনো কোনো পয়ারে বাড়ানো হল—৬-মাত্রার বদলে ১০-মাত্রা। এর নাম হল বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার। অতএব, ৮ + ৬ মাত্রার পয়ার যেমনটি ছিল, তেমনই রইল, এর সঙ্গে যুক্ত হল ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ার'। ৮ + ৬ মাত্রার 'ছোটো পয়ারে'র দৃষ্টান্ত ('মহাভারতের কথা....') একটু আগে দেখলেন। এবারে দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ারে'র দৃষ্টান্ত—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ||
একথা জানিতে তুমি | ভারত্-ঈশ্শর্ শা-জাহান্ || = ৮ + ১০

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ||
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন্ - যৌবন্ ধনমান্ || = ৮ + ১০

২. ছন্দ-রীতির দিক থেকে পয়ারের ৩টি রূপ ঃ পয়ার-বন্ধে লেখা পুরেনো সব কবিতারই একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, এ কথা একটু আগে জেনেছেন। কিন্তু, পয়ার-বন্ধে বাঁধা একটি আধুনিক কবিতার ছন্দরীতি **দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান)** হতে পারে, **কলাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান)** হতে পারে, **মিশ্রবৃত্তও (তানপ্রধান)** হতে পারে। দৃষ্টান্ত দেখুন—দলবৃত্ত পয়ার।

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
আজ্ বিকালে | কোকিল্ ডাকে || শুনে মনে লাগে = ৮ + ৬

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || ১ ১ ১ ১ | ১ ১
বাংলাদেশে | ছিলাম্ যেন || তিন শো বছর | আগে = ৮ + ৬

(প্রবোধচন্দ্রের পদ-বিভাগ)

কলাবৃত্তের পয়ার ঃ

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ ||
নিম্নে যমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল্ || = ৮ + ৬

২ ১ ১ ২ ২ | ২ ১ ১ ২ ||
ঊর্ধ্বে পাষাণ্-তট্ | শ্যাম্ শিলাতল্ || = ৮ + ৬

মিশ্রবৃত্ত পয়ার ঃ

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
দুয়ারে প্রস্তুত্ গাড়ি | বেলা দ্বিপ্রহর || = ৮ + ৬

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
শরতের্ রৌদ্র ক্রমে | হতেছে প্রখর্ || = ৮ + ৬

লক্ষ করছেন, ৩-রকম ছন্দরীতির ৩টি দৃষ্টান্তই পয়ারের প্রতিটি শর্ত (৮ + ৬ মাত্রার অন্ত্যমিল-থাকা ২টি চরণ বা পঙ্‌ক্তি) মেনে চলেছে। কেবল ভেঙে দিয়েছে মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতির একঘেয়ে প্রথার দেয়ালটি।

৩. গতিভঙ্গির দিক থেকে পয়ারের ৩টি রূপ ঃ

পয়ার-বন্ধের চতুর্থ শর্তকে (৮ + ৬ মাত্রার চরণ) খানিকটা শিথিল করে ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ার' তৈরি হল কীভাবে, তা লক্ষ করেছেন। এবার প্রথম শর্তের ওপর আঘাত। পয়ার-বন্ধের প্রথম শর্ত—২টি চরণ (বা পঙ্‌ক্তি) নিয়ে স্তবক তৈরি হবে। এই শর্তটির অর্থ ১টি চরণে না হলে ২টি চরণের মধ্যে একটি বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে কবি বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ, একটি বক্তব্যের মাপ ২-চরণের বেশি নয়। অন্য ৩টি শর্তের সঙ্গে পয়ারের এই শাসনও বাংলা কবিতার কবিরা মেনে চললেন উনিশ শতক পর্যন্ত। এর পর থেকে কোনো কোনো পয়ার সব শর্ত মেনে তৈরি হল, কোনো কোনো পয়ার প্রথম শর্ত পুরোপুরি মানল না। এমনি করে গড়ে উঠল পয়ারের ৩টি রূপ—অপ্রবহমান, **প্রবহমান** আর **মুক্তক**।

পুরোনো সব শর্ত মেনে ২-চরণের সীমানায় বক্তব্যকে ধরে রেখে যেসব পয়ার লেখা হল সেখানে নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়ে ঐ বক্তব্য বা ভাব পরের চরণগুলিতে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল না। এ-ধরনের পয়ারকে বলা হল **অপ্রবহমান পয়ার**। এ পর্যন্ত পয়ারের যে-কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তার সবই অপ্রবহমান পয়ার-এর।

যে-পয়ারে চরণের মাপ ৮ + ৬ বা ৮ + ১০ মাত্রায় স্থির রেখে, চরণের অন্ত্যমিল রেখে বা না-রেখে কোনো বক্তব্য বা ভাব ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে পরের চরণগুলিতে প্রবাহিত হতে পারে, ২-চরণের সীমানার মধ্যেও অবাধে চলতে পারে, তার নাম হল **প্রবহমান পয়ার**। নীচের দৃষ্টান্তটিতে ভাবের এই প্রবাহ লক্ষ করুন—

১ ১ ২ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
কবিবর্, কবে কোন্ | বিস্মৃত বরষে || = ৮ + ৬

২ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
কোন্ পুণ্‌ণ আষাঢ়ের | প্রথম্ দিবসে || = ৮ + ৬

লিখেছিলে মেঘ্‌দূত। .....।

ব্যাকরণের নিয়মে একটি বক্তব্যকে পুরোপুরি ধরে রাখার জন্য চাই কমপক্ষে একটি বাক্য। অথচ, ওপরের ২টি চরণ মিলেও পূর্ণ বাক্য তৈরি হল না। 'কোন্' শব্দটিতে একটা প্রশ্নের সংকেত আছে, কিন্তু কী নিয়ে এ-প্রশ্ন তার উল্লেখ চরণ-দুটিতে নেই। তার পরে ভাব অসম্পূর্ণই থাকল। মেঘদূত-লেখার উল্লেখ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাক্য পূর্ণ হল, বক্তব্যও পুরোপুরি ধরা পড়ল। ভাব ততক্ষণে ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে প্রবাহিত হল তৃতীয় চরণের দিকে। অতএব, স্তবকটি হয়ে উঠল প্রবহমান পয়ারের দৃষ্টান্ত। দেখাই যাচ্ছে, দৃষ্টান্তটি ৮ ঃ ৬ মাত্রার—ছোটো পয়ারের। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার প্রবহমান মহাপয়ারের—

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ||
সংসারে সবাই যাবে | সারাক্ষণ্ শত কর্মে রত || = ৮ + ১০

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ||
তুই শুধু ছিন্নবাধা | পলাতক্ বালকের্ মতো || = ৮ + ১০

১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
মদ্ধ্যান্নে মাঠের মাঝে | একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে || = ৮ + ১০

১১১১১১১১ || ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
দুরবনগধবহ || মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে || = ৮ + ১০

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।.....

একটি বক্তব্য বা ভাব পরপর ৪টি চরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে অবশেষে পঞ্চম চরণের মাঝামাঝি গিয়ে থামল।

এতক্ষণ ধরে আপনারা লক্ষ করেছেন—'অপ্রবহমান পয়ার' পয়ারের সব শর্ত মেনে চলে, 'প্রবহমান পয়ার' কেবল ২-চরণের সীমানায় ভাবকে ধরে রাখার শাসনটুকু মানে না, আর সব শর্ত মেনে নিতে বাধা নেই। তবে, পয়ারের এই ২টি রূপেই প্রতিটি চরণের মাপ নির্দিষ্ট— ৮+৬ মাত্রা বা ৮ + ১০ মাত্রা। ক্রমশ পদ্যের স্তবক-রচনায় কবিরা চরণের এই নির্দিষ্ট আয়তন অস্বীকার করতে চাইলেন। ভাবকে ২-চরণের সীমানার বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে আনা ত হল-ই, সেইসঙ্গে চরণের মাপও নানারকম হতে লাগল, কখনো কখনো একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে স্তব তৈরি করা হল। প্রতি চরণে ২টি পর্ব রাখার শর্তও ভেঙে গেল, ১টি পর্বেই তৈরি হল চরণ। তবে স্তবকটি যে মূলত পয়ারের, এটা বোঝা যাবে সবচেয়ে বড়ো চরণটির মাপ দেখে (৮ + ৬ বা ৮ + ১০)। কোনো-না-কোনো চরণের এই মাপ থাকবেই। অন্য সব চরণের মাপ এর সমান হতে পারে, এর চেয়ে ছোটোও হতে পারে (৬, ৮ বা ১০-মাত্রা—যা পয়ারের ১টি পর্ব বা পদের মাপ)। এ-ধরনের পয়ারের নাম হল **মুক্তক পয়ার**। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—

১ ২ ১ ২ ||
তোমার্ চিকন্ || = ০ + ৬

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
চিকুরের্ ছায়াখানি | বিশ্‌শ হতে যদি মিলাইত || = ৮ + ১০

১ ১
তবে

২ ২ ১ ১ |
এক্‌দিন্ কবে |

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
চন্‌চল্ পবনে লীলায়িত || = ০ + ৬

১ ২ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
মর্‌মর্ মুখর্ ছায়া | মাধবী-বনের্ || = ৮ + ৬

১ ১ ১ ১ ২
হত স্বপনের্ = ০ + ৬

সতর্কতার সঙ্গে ছত্রের পর ছত্র উচ্চারণ করে চলুন। অর্ধযতি (।) আর পূর্ণযতির (॥) চিহ্ন দিয়ে যে জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা হল, তা নিজের ছন্দোবোধের সাহায্যে মিলিয়ে নিন। এবারে লক্ষ করুন ঃ

(১) স্তবকটিতে ছত্র ৭টি, কিন্তু চরণ ৫টি। এর মধ্যে দ্বিতীয় আর তৃতীয় চরণ মহাপয়ারের (৮+১০ মাত্রা), চতুর্থ চরণ সাধারণ পয়ারের (৮+৬ মাত্রা)। অর্থাৎ পয়ারের নির্দিষ্ট মাপ এই চরণগুলিতে মানা হয়েছে।

(২) প্রথম আর শেষ চরণ ৬-মাত্রার। ছোটো পয়ারের (৮+৬) দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) ৬-মাত্রা দিয়েই এক-একটি চরণ তৈরি হয়েছে, ২টি পর্ব (বা পদের) নির্দিষ্ট বরাদ্দ এখানে মানা হয়নি।
এ-দুটি চরণ উচ্চারণ করতে গেলেই প্রথম পর্বটির অভাব কানে লাগে। O-মাত্রা সেই অভাবের চিহ্ন।

(৩) একটি বক্তব্যই প্রথম চরণ থেকে প্রবাহিত হতে হতে পঞ্চম চরণে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে। ২-চরণের সীমানার বাঁধ ভেঙে গেল এখানেও।

(৪) তৃতীয় ছত্রের যতি নেই, চতুর্থ ছত্রের শেষে অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (॥) পড়েছে পঞ্চম চরণের শেষে। এর অর্থ, ৮ + ১০ মাত্রার তৃতীয় চরণটিকে ২-মাত্রা, ৬-মাত্রা, আর ১০-মাত্রার, ৩-টি পৃথক্ মাপের ছত্রে ভেঙে সাজানো হয়েছে।

(৫) চরণ-শেষের মিল এ-স্তবকে অনেকটাই রাখা হয়েছে। তবে কবির চোখে যে ছত্রশেষের দিকে, তা বোঝা যায় তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রের মিলের দিকে তাকালেই (তবে-কবে), চরণ যেখানে ৩টি ছত্রে ভাগ হয়ে গেছে।

পয়ারের প্রতিটি শর্তই স্তবকটিতে শিথিল। তবু এটি যে পয়ারেরই স্তবক, তার কারণ, এর প্রতিটি চরণই হয় পয়ারের চরণ (৮+৬ বা ৮+১০) না হয় পয়ারের পর্ব (বা পদ) দিয়ে তৈরি (৬-মাত্রার) ?

আমরা দেখলাম, 'পয়ার' নামের একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ ৮+৬ মাত্রার মাপের ২টি মিত্রাক্ষর (অন্ত্যমিল-থাকা) চরণের শরীর নিয়ে মধ্যযুগের রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ পথ ধরে ক্রমশ পৌঁছল বাংলা কাব্য-কবিতার আধুনিক ঠিকানায়। পৌঁছল বটে, কিন্তু ততদিনে পুরনো শর্তের শাসন একটি করে অমান্য করা চলল, প্রাচীন চেহারার একটু একটু করে বদল শুরু হল, মধূসূদন-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের মতো কবির হাতে পড়ে নানা রূপের পয়ার তৈরি হতে লাগল। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট মাপের ছোটো পয়ারের পাশাপাশি এল ৮+১০ মাত্রার বড়ো মাপের মহাপয়ার, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতির একঘেয়েমি কাটিয়ে গড়ে উঠল দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত রীতির পয়ার, ২-চরণের বাঁধন ছিড়ে ভাব মুক্তি খুঁজে পেল প্রবহমান আর মুক্তক পয়ারে। এমনি করে প্রাচীন পরিচয়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল 'পয়ার' নামের একটি আধুনিক ছন্দোবন্ধ।

৩৬.৪ সারাংশ-১

ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, ভেতরকার পরিচয় **ছন্দোবন্ধ** ছন্দের আকৃতি—বাইরের পরিচয়। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, 'ছন্দোবন্ধ' নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্বনিব্যাসের ওপর।

পয়ার একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। কিন্তু, রূপের বৈচিত্র্য নিয়ে 'পয়ার' ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠেছে। তবে বহাল রেখেছে তার ৮+৬ মাত্রার প্রাচীন শরীরটি। প্রাচীন পয়ারে ৪টি শর্ত—স্তবকে ২টি চরণ, চরণশেষে মিল, প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব, ৮+৬ মাত্রার/এ পয়ারের একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

আধুনিক পয়ার বৈচিত্র্য পেল আয়তন ছন্দরীতি আর গতিভঙ্গির দিক থেকে। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট আয়তনের পাশে এল ৮+১০ মাত্রার 'বড়ো পয়ার' বা 'মহাপয়ার'। মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতির পাশাপাশি তৈরি হতে লাগল দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) আর কলাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান) রীতির পয়ার। যে পয়ারে ভাবের গতি ছিল একটি-দুটি চরণে বন্ধ—'অপ্রবহমান', তা ক্রমশ 'প্রবহমান' হল ঐ সীমানা পেরিয়ে। চরণে ৮ + ৬ বা ৮+১০ মাত্রার নির্দিষ্ট ছকও এরপর ভেঙে যেতে লাগল। একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে তৈরি করা স্তবকে পয়ারকে চিনতে হল সবচেয়ে বড়ো চরণের মাপ দেখে। সে মাপ ৮ + ৬ বা ৮ + ১০, স্তবকের অন্য সব চরণ ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে, (যা পয়ার চরণের একটি পর্ব)। এমনি করে তৈরি হল **'মুক্তক' পয়ার**।

৩৬.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৮ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ মহাপয়ার, অপ্রবহমান পয়ার।

(খ) প্রবহমান পয়ার আর মুক্তক — এদের মধ্যে কোথায় মিল কোথায় পার্থক্য, বুঝিয়ে দিন।

২. (ক) কমপক্ষে ২টি ছত্রের ২টি করে দৃষ্টান্ত লিখুন ঃ

কলাবৃত্ত পয়ার, প্রবহমান পয়ার, মহাপয়ার।

(খ) আধুনিক পয়ারের কী কী রূপ, লিখুন।

৩. (ক) নীচের দৃষ্টান্তে প্রবহমানতা আছে কিনা, বুঝিয়ে লিখুন ঃ

(i) কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশ,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,

(ii) তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়।
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

(খ) নীচের দৃষ্টান্তে পয়ারের কোন রূপ রয়েছে, লিখুন ঃ

(i) সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে

(ii) চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে শুনি ;

(iii) বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।

(iv) তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা

৩৬.৬ মূলপাঠ-২ ঃ অমিত্রাক্ষর

'প্রবহমান পয়ার'-এর কথায় ফিরে চলু। এখানে চরণের মাপ সাধারণত ৮+৬ (মহাপয়ার হলে ৮+১০) মাত্রা, ভাব বা বক্তব্য ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যায়, চরণশেষের মিল সাধারণত থাকে, না-থাকলেও চলে। এই চরশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান প্রবোধচন্দ্র বলতেন অমিল প্রবহমান পয়ার। এই পয়ারেরই সবচেয়ে পরিচিতি নাম **অমিত্রাক্ষর**। আর, বাংলা কবিতায় শরীরে 'অমিত্রাক্ষর'-এর পোষাকটি প্রথম পরিয়ে দিলেন মধুসূদন দত্ত, তাঁর তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে মেঘনাদবধকাব্যে বীরাঙ্গানাকাব্যে। মেঘনাদবধকাব্যের শুরু কীভাবে লক্ষ করুন ঃ

সম্মুখ সমরে পড়ি, । বীরচূড়ামণি ॥ = ৮ + ৬
বীরবাহু চলি যবে । গেলা যমপুরে ॥ = ৮+ ৬
অকালে, কহ, হে দেবি । অমৃতভাষিণি, ॥ = ৮ + ৬
কোন্ বীরবরে বরি । সেনাপতি-পদে ॥ = ৮ + ৬
পাঠাইলা রণে পুনঃ । রক্ষঃ কুলনিধি ॥ = ৮ + ৬
রাঘবারি ? . . . . . (দৃষ্টান্ত - ১)

পদ্য উচ্চারণের অভ্যাস থেকে আপনারা সহজেই আন্দাজ করছেন—ওপরের স্তবকটির প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ১টি অর্ধযতি, ছত্রশেষে পূর্ণযতি। যতিস্থাপনের পর যে ৫টি চরণ পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটির মাপ

৮ + ৬ মাত্রা। স্তবকটিতে, ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে তো বটেই, এমনকী ৫টি চরণে প্রবাহিত হতে হতে ষষ্ঠ চরণ ছুঁয়ে একটি ভাব সম্পূর্ণ হয়েছে। উদ্ধৃত স্তবকটির ছন্দোবন্ধ নিঃসন্দেহে প্রবহমান পয়ার। এবারে দেখুন, চরণশেষে মিল নেই কোনো জোড়া-চরণে (মনি-পুরে, যিণি-পদে, নিধি)। অতএব, স্তবকটি প্রবোধচন্দ্রে অমিল প্রবহমান পয়ার, আমাদের 'অমিত্রাক্ষর'।

প্রতি জোড়া-চরণের শেষে মিল থাকলেই যদি পদ্যকে বলি 'মিত্রাক্ষর', তাহলে মিল না-থাকা যেকোনো পদ্যকেই তো বলতে পারি 'অমিত্রাক্ষর', তা সে পয়ার হোক বা না-হোক প্রবহমান হোক বা না-হোক। কিন্তু, 'অমিত্রাক্ষর'-এর পরিচয় এ-রকম সংকীর্ণ নয়। 'অমিত্রাক্ষর' হবার জন্য কোনো পদ্যের অন্ততপক্ষে এই ৪টি গুণ থাকা জরুরি ঃ

(১) প্রতিটি ছত্রই একটি করে চরণ।

(২) প্রতিটি চরণের মাপ ৮+৬ (বা ৮+১০) মাত্রার।

(৩) একটি ভাব বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া।

(৪) চরণশেষে কোনো মিল না-থাকা।

প্রথম ২টি গুণ থাকলেই পদ্য হয় পয়ার, তৃতীয় গুণটির জোরে তা হয়ে ওঠে প্রবহমান পয়ার, চতুর্থ গুণটি তাকে করে দেয় অমিল প্রবহমান পয়ার বা 'অমিত্রাক্ষর'।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন —

ইন্দ্রানী নামেতে দেশে। পূর্বাপর স্থিতি।॥ = ৮ + ৬

দ্বাদশ তীর্থেতে যথা। বৈসে ভাগীরথী॥ = ৮ + ৬ (দৃষ্টান্ত-২)

এখানে ২টি ছত্র। প্রতি ছত্রের শেষে পূর্ণযতি, অতএব প্রতিটি ছত্রই একটি করে চরণ। প্রতিটি চরণ ৮ + ৬ মাত্রার। সন্দেহ নেই, দৃষ্টান্তটি পয়ারের। এর অন্তর্গত বক্তব্যটি ২টি চরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ, ২-চরণের সীমানা তাকে পেরোতে হয়নি। তাই পয়ারটি প্রবহমান হল না, এই কারণে 'অমিত্রাক্ষর' হবার সম্ভাবনাও তার তৈরি হল না। ধরা যাক, চরশেষের মিলটুকু মুছে দিয়ে পয়ারটিকে 'অমিল' করে দেওয়া হল এইভাবে—

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।

দ্বাদশ তীর্থেতে যথা ভাগীরথী বৈসে॥

পয়ারটি এখন 'মিত্রাক্ষর' রইল না, 'অমিত্রাক্ষর'ও হল না, হয়ে রইল শুধু 'অমিল' পয়ার। কেননা, 'অমিত্রাক্ষর' হবার জন্য আবশ্যক তৃতীয় গুণটি (বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরনোর সাহস) এখনো সে অর্জন করে নি। এবার দেখুন নীচের দৃষ্টান্তটি—

ধবল নামেতে গিরি। হিমাদ্রির শিরে—॥ = ৮ + ৬

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা,। ভীষণ দর্শন ;॥ = ৮ + ৬ (দৃষ্টান্ত-৩)

এটি 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম ২চি চরণ। 'অমিত্রাক্ষর'-এর স্রষ্টা মধুসূদনের হাতে শুরুটা এ-রকমই হল। কিন্তু একটি বক্তব্য বা ভাব স্থির হয়ে রইল ২টি চরণেরই সীমানায়। অতএব, এ দৃষ্টান্তটি একান্তই 'অমিল' পয়ারের, 'অমিত্রাক্ষরে' নয়।

একই কাব্যের কয়েকটি ছত্র পেরিয়ে দেখুন—

যেন মরকতময় । কনককিরীট ॥	= ৮ + ৬
না পরে এ গিরি, সবে । করি অবহেলা, ॥	= ৮ + ৬
বিমুখ পৃথিবীপতি । পৃথ্বীসুখ যেন ॥	= ৮ + ৬
জিতেন্দ্রিয় !.....	(দৃষ্টান্ত - ৪)

এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত 'অমিল' পয়ারের নয়। এর সঙ্গে লেগেছে তৃতীয় গুণটির ছোঁয়া। লক্ষ করুন, এর নিহিত বক্তব্য পর পর ৩টি চরণ অতিক্রম করে চতুর্থ চরণে প্রবেশ করার সাহস দেখাল। এই সাহসের জোরেই এ পয়ার 'অমিত্রাক্ষর' হয়ে উঠল। তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যের শুরু থেকে উদ্ধার-করা এই অংশটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন একটু আগে মেঘনাদবধকাব্যের শুরু থেকে নেওয়া অংশটুকু (সম্মুখ সমরে পড়ি...)। আন্দাজ করা যাবে, 'অমিত্রাক্ষরে'র তৃতীয় গুণটির (একটি বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া) জোর কতটা বাড়ল, কীভাবে বাড়ল।

ভাবের বা বক্তব্যের সীমানা পেরিয়ে যাবার এই গুণটিকে সংক্ষেপে বলুন প্রবহমানতা। এর সঙ্গে ভাবুন ছেদ আর যতির পার্থক্যটি। ছেদেরে সঙ্গে অর্থের যোগ, যতির সঙ্গে ছন্দের—এটা গোড়া থেকেই আপনারা জানেন। এ-ও আপনাদের জানা, একটি ভাব বা বক্তব্য অর্থকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। সেই কারণে, ভাব বা বক্তব্যকে যেখানে অপূর্ণ রেখে একটুখানি থামতে হয় সেখানে পড়ে অর্ধচ্ছেদ, যেখানে তাকে সম্পূর্ণ করে পুরোপুরি থামতে হয় সেখানে পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। অর্ধচ্ছেদের একমাত্র চিহ্ন কমা, (,), পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন দাঁড়ি (।) জোড়া-দাঁড়ি (॥) বিস্ময়চিহ্ন (!) প্রশ্নচিহ্ন (?) ড্যাস্ (—), কোলন (ঃ) সেমিকোলন (;)। অন্যদিকে, সমান সমান মাত্রার পরে নিয়মিত থামার জায়গায় পড়ে যদি—পর্বের পরে অর্ধযতি (।) চরণের পূর্ণযতি (॥)। যে ৪টি পয়ার-স্তবকের দৃষ্টান্ত এর আগে দেওয়া হল, তাদের প্রত্যেকটিতে যতির স্থান নির্দিষ্ট—৮-মাত্রায় অর্ধযতি, ১৪-মাত্রায় পূর্ণযতি। পয়ারে এ-রকমই হয়। কিন্তু, ছেদের স্থান কোথাও নির্দিষ্ট, কোথাও অনির্দিষ্ট।

লক্ষ করুন ঃ (১) দৃষ্টান্ত-২ আর দৃষ্টান্ত-৩ স্তবকে ভাব বা বক্তব্য ২-চরণেই বাঁধা, প্রবহমান নয়। ২টি স্তবকের প্রতিটি ছত্রেই পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি ছত্রশেষে এক জায়গায় মিলেছে। এমনকী, অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতিও মিলেছে দৃষ্টান্ত-৩ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রে। অর্থাৎ, পূর্ণযতির সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদেরও স্থান এসব ক্ষেত্রে ছত্রশেষে নির্দিষ্ট (১৪-মাত্রায়)।

(২) এবার তাকান দৃষ্টান্ত-৪ আর দৃষ্টান্ত-১ স্তবকের দিকে। স্তবকদুটিতে ভাব ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে প্রবহমান ২টি স্তবকের মধ্যে কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত-৪ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রে আর দৃষ্টান্ত-১ এর তৃতীয় ছত্রে অর্ধচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন, আর সব জায়গাতেই ছেদ আর যতির বিচ্ছেদ। অর্থাৎ, ছেদ-যতি আর কোথাও এক জায়গায় মেলেনি।

তাহলে, ওপরের (১)-অনুচ্ছেদ থেকে বুঝতে পারি, ভাব যেখানে ২-চরণের সীমানায় বাঁধা, ছেদ-যতির সেখানে মিলন। অন্ততপক্ষে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি ছত্রশেষে মিলবেই। আর, (২)-অনুচ্ছেদ থেকে জানা গেল, ভাব যেখানে প্রবহমান, ছেদ আর যতির সেখানে বিচ্ছেদ। অন্ততপক্ষে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি কখনো মিলবে না। অর্থাৎ, পয়ার প্রবহমান হলে পয়ার-স্তবকে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ থাকবেই। 'অমিত্রাক্ষর' মূলত প্রবহমান পয়ার, অতএব,

এখানেও ছেদ-যতির বিচ্ছেদ অনিবার্য। তবে এটা কোনো পদ্যের 'অমিত্রাক্ষর' হবার পক্ষে বাড়তি কোনো গুণ নয়, এটা প্রবহমানতরাই একটা লক্ষণ। এ লক্ষণ চোখ দিয়েও চেনা যায় ছেদ-যতির চিহ্নি দেখে।

আপনারা জানেন, পয়ারের দু-রকম আয়তন—৮+৬ মাত্রা আর ৮+১০ মাত্রা। ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার কীভাবে অমিত্রাক্ষর হয়ে ওঠে, দেখলেন। এবারে দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের অমিত্রাক্ষর-রূপ। একটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্য থেকে নেওয়া হল—

পুরস্কার প্রত্যাশায়। পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত ॥ = ৮ + ১০
যেতে যেতে ; জীবনে যা। কিছু তব সত্য ছিল দান ॥ = ৮ + ১০
মূল্য চেয়ে অপমান। করিয়ো না তারে ; এ জনমে ॥ = ৮ + ১০
শেষ ত্যাগ হোক তব। ভিক্ষাঝুলি, নববসন্তের ॥ = ৮ + ১০
আগমনে . . . . . .

৮+১০ মাত্রার মাপের এক-একটি বড়ো পয়ার বা মহাপয়ারের চরণ ২টি করে যতিচিহ্ন নিয়ে এক-একটি ছত্র জুড়ে রয়েছে। লক্ষ করুন ঃ প্রথম চরণে কোনো ছেদচিহ্ন নেই, দ্বিতীয় চরণে পর্ণচ্ছেদ (;) ৪-মাত্রায়, তৃতীয় চরণে পূর্ণচ্ছেদ। (;) ১৪-মাত্রায়, চতুর্থ চরণে অর্ধচ্ছেদ (,) ১২-মাত্রায়। অথচ, যতিচিহ্ন প্রতি চরণে ৮ আর ১৪-মাত্রায় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, প্রতিটি ছেদই যতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ছেদ-যতির এই বিচ্ছেদ থেকে ধরা পড়ে স্তবকটিরে অন্তর্গত ভাবের প্রবহমানতা। ভাব প্রবাহিত হয়ে চলেছে আগের চরণ থেকে পরের চরণে, থেমে যাচ্ছে চরণের যেখানে-সেখানে। এবার প্রতিটি চরণের শেষপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখুন—মিল নেই (হাত্-দান্ নমে-তের্)। অতএব, ৮ + ১০ মাত্রার ৪টি চরণ নিয়ে তৈরি পয়ার-স্তবকটি ছেদ-যতির বিচ্ছেদ আর চরণশেষে মিলের অভাব নিয়ে অমিত্রাক্ষর হয়ে উঠেছে।

আয়তনের দিক থেকে ছোটো পয়ার আর বড়ো পয়ার—দু-রকম অমিত্রাক্ষরই আপনারা দেখলেন। কিন্তু রীতির দিক থেকে প্রতিটি পয়ারই ছিল মিশ্রবৃত্ত (বা তানপ্রধান)। একমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতির হাত ধরেই বাংলা কবিতার অমিত্রাক্ষর পয়ার শতায়ু হয়েছে। কলাবৃত্ত (বা ধ্বনিপ্রধান) অমিত্রাক্ষর কোনোকালে চালু হয়নি। তবে দলবৃত্ত রীতির অমিত্রাক্ষর চালু না হলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র নমুনা তৈরি করে খানিকটা চমক উপহার দিলেন ছন্দ-ভাবুক বাঙালিকে। নমুনাটি পড়ুন—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল। বীরবাহু বীর যবে ॥ = ৮ + ৬
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ। গেলেন মৃত্যুপুরে ॥ = ৮ + ৬
যৌবনকাল পার না হতেই। কত মা সরস্বতী, ॥ = ৮ + ৬
অমৃতময় বাক্য তোমার,। সেনাধ্যক্ষপদে ॥ = ৮ + ৬
কোন্ বীরকে বরণ করে। পাঠিয়ে দিলেন রণে ॥ = ৮ + ৬
রঘুকুলের পরম শত্রু,। রক্ষঃকুলের নিধি ॥ = ৮ + ৬

একটু আগে অমিত্রাক্ষরের প্রথম দৃষ্টান্তে মেঘনাদবধকাব্যের যে ৬টি ছত্র ব্যবহার করা হয়েছে, (সম্মুখ

সমরে পড়ি.....) তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন ওপরের ৬টি ছত্র। লক্ষ করুন—২টি স্তবকের অন্তর্গত বক্তব্য হুবহু এক, ভাষা দু-রকম। দৃষ্টান্ত-১ এর ভাষা সাধু, দৃষ্টান্ত-৫ এর চলতি। ২টি স্তবকের ছন্দরীতি মিলিয়ে দেখুন—দৃষ্টান্ত-১ এ মিশ্রবৃত্ত, দৃষ্টান্ত-৫ এ দলবৃত্ত। এবারে ২টি স্তবকেই দলের মাথায় মাত্রা বসিয়ে দেখুন, প্রতিটি ছত্রে আছে ১৪ মাত্রা। দৃষ্টান্ত-১ এ যতি স্থাপন করে আগেই দেখা গেছে, স্তবকটি ৮ + ৬ মাত্রার ৫টি ছোটো পয়ারের চরণে তৈরি। দৃষ্টান্ত-৫ দলবৃত্ত। অতএব এর প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রার হবার কথা, প্রতিটি চরণে ১৪-মাত্রার বিভাজন হবার কথা ৪ + ৪ + ২। প্রবোধচন্দ্র এর বদলে ১৪-মাত্রাকে ৮ + ৬ মাথায় ভাগ করে বলেছেন, দৃষ্টান্ত-৫ এর স্তবকটিও পয়ারের। তাহলে মেনে নিন, এটি দলবৃত্ত রীতির পয়ার। এখন দেখুন, স্তবকটির শরীরে ছেদ-যতি কোথায় এক বিন্দুতে মিলেছে, আর কোথায় বিচ্ছিন্ন। ছেদ-যতির মিলন-স্থল এই কটি—৩য় চরণে পূর্ণচ্ছেদ-অর্ধচ্ছেদ-পূর্ণযতি, চতুর্থ চরণে অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতি, ষষ্ঠ চরণে অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতি আর পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি। দেখা গেল, প্রথম ৫টি চরণে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন-বিন্দু একটিও নেই। এর অর্থ, স্তবকটির শরীরে রয়েছে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ, ভেতরে চলছে ভাবের প্রবাহ। এর সঙ্গে মিলেছে চরণশেষে মিলের অভাব (যবে-পুরে স্বতী-পদে রণে-নিধি)। অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর হয়ে ওঠার সব-কটি গুণই এ-স্তবকে দেখতে পেলেন। অথচ, স্তবকটি কিন্তু দলবৃত্ত রীতিতেই লেখা। এখনো পর্যন্ত এটিই দলবৃত্ত রীতিতে লেখা অমিত্রাক্ষরের একমাত্র পরিচিত দৃষ্টান্ত।

জেনে রাখুন, বাংলা কবিতায় কলাবৃত্তে অমিত্রাক্ষর হয়নি, দলবৃত্তে অমিত্রাক্ষর চলেনি, আর মিশ্রবৃত্তে অমিত্রাক্ষরের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ৪০ বছর আগে।

৩৬.৭ সারাংশ-২

চরণশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান পয়ারকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'অমিল প্রবহমান পয়ার'। এই পয়ারেরই অন্য নাম 'অমিত্রাক্ষর'। অমিক্ষাররে প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত, 'প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। একটি পদ্যের পক্ষে 'অমিত্রাক্ষর' হবার মূল শর্ত প্রতিটি ছত্রকে ৮+৬ (বা ৮+১০) মাত্রার মাপের চরণ হিসেবে পাওয়া এবং চরণশেষে মিল না-রাখা। কিন্তু, সবচেয়ে জরুরি শর্ত—একটি ভাব বা বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া। এই শর্তের জোরেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে'র তুলনায় 'মেঘনাদবধকাব্যে'র অমিত্রাক্ষর অনেক বেশি সমার্থক। ভারের এই সীমানা-পেরোনা বা প্রবহমানতার লক্ষণ চরণ-শেষে ছেদ না-থাকা, চরণের মাঝখানেও ৮-মাত্রার শেষে অর্ধযতির সঙ্গে অর্ধচ্ছেদ না-থাকা। ছেদ-যতির বিচ্ছেদে প্রবহমানতা, মিলনে প্রবহমানতার অভাব।

মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষরে' কেবল ৮+৬ মাত্রার পয়ার, ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের কাঠামোয় তৈরি 'অমিত্রাক্ষর' রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্যে। 'অমিত্রাক্ষর'-এর ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান। একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথের তৈরি ৬-চরণের একটি দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) রীতির স্তবক, যা 'মেঘনাদবধকাব্যে'র প্রথম ৬টি চরণের রূপান্তর—দলবৃত্ত রীতিতে 'অমিত্রাক্ষর' তৈরির পরীক্ষানিরীক্ষা।

৩৬.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৮ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. একটি অমিত্রাক্ষর স্তবক বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিন যে ঐ স্তবকে অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধের সবকটি গুণই আছে।

২. নীচের দৃষ্টান্ত অমিত্রাক্ষরের কিনা, কারণ জানিয়ে লিখুন ঃ

(ক) ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন ;

(খ) যেন মরকতময় কনককিরীট
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি, পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় !

(গ) বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততরাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন।

(ঘ) যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই।

৩. নীচের দৃষ্টান্তে কোন ছত্রে কত মাত্রার পরে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ আর মিলন, লিখুন ঃ

শুনেছি সরযুতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ?
স্তবকটি অমিত্রাক্ষর কিনা জানান।

৩৬.৯ মূলপাঠ—৩

আপনারা দেখলেন, 'অমিত্রাক্ষর' পয়ারেরই একটি বিশেষ রূপ। এবারে দেখবেন, চতুর্দশপদীর জন্মও মূলত পয়ার-বন্ধেরই আর-একটি বিশেষ রকমের প্রয়োগ থেকে। আবার, অমিত্রাক্ষরে'র মতো 'চতুর্দশপদী'ও বাংলা সাহিত্যে এসেছে য়ুরোপীয় ছন্দোবন্ধের আদলে। দুটি ছন্দোবন্ধই অনেকটা দেশি টবে ফুটে-ওঠা বিদেশি ফুলের মতো, এদেশে ফুটিয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত। ইতালীয়—ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম সনেট, বাংলায় তারই নাম হল **চতুর্দশপদী**। তবে, বিকল্প নাম হিসেবে 'সনেট' শব্দটিও বাংলায় চালু।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা সনেটের প্রথম কবি। ষোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারোর প্রবর্তনায় শুরু হল ফরাসি সনেটের চর্চা। প্রায় একই সময়ে ইংরেজি সনেট-চর্চা শুরু হলেও সতেরো শতকের কবি সেক্স্পিয়ারের হাতেই গড়ে উঠল স্বতন্ত্র রীতির সেক্সপিরীয় সনেট। এমনি করে তৈরি হল য়ুরোপীয় সনেটের ৩টি আদর্শ—পেত্রার্কীয় ফরাসি আর সেক্সপিরীয়। এই ৩টি আদর্শই মধুসূদনের মাধ্যমে ক্রমশ বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী'র আশ্রয় হয়ে উঠল।

'চতুর্দশপদী' কথাটির সরল অর্থ '১৪টি পদ দিয়ে তৈরি' কবিতা। কিন্তু, বাংলায় যে ধরনের কবিতা 'চতুর্দশপদী' নামে চিহ্নিত, তার শরীর ১৪টি চরণ দিয়ে গড়া, ১৪টি পদ দিয়ে নয়। 'পদ' কথাটির বিশেষ অর্থ এখানে 'চরণ'। এক সময়ে কোনো কোনো ছন্দশাস্ত্রে অবশ্য 'পদ' আর 'চরণ' একই অর্থে প্রয়োগ করা হত। এই ১৪টি চরণের সমষ্টি হওয়া 'চতুর্দশপদী' কবিতার প্রথম শর্ত, তবে একমাত্র নয়। একটি কবিতাকে 'চতুর্দশপদী' হবার জন্য কমপক্ষে আরো ৪টি শর্ত মানতেই হয় ঃ

(১) প্রতিটি চরণ হবে পয়ারের—৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার বা ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ার। বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী'র প্রথম কবি মধুসূদনের মোট ১০৮টি কবিতার প্রতিটি চরণ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আর মোহিতলাল মজুমদার ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারও প্রয়োগ করেছিলেন 'চতুর্দশপদী'তে।

(২) গোটা কবিতাই লেখা হবে কেবল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে।

(৩) স্তবক-বিভাগ হবে নির্দিষ্ট ছকে। সে ছক তৈরি হবে এই ৩টি আদর্শের যেকোনো ১টিতে—পেত্রার্কীয় ফরাসি সেক্সপিরীয়।

পেত্রার্কীয় আদর্শে একটি কবিতায় স্তবক থাকবে ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষট্ক)। **ফরাসি** আদর্শে ৩টি স্তবক—প্রথম স্তবক ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ২-চরণের (যুগ্মক), তৃতীয়টি ৪-চরণের (চতুষ্ক)। **সেক্স্পিরীয়** আদর্শে স্তবকের সংখ্যা ৪ — প্রথম ৩টি ৪-চরণের (চতুষ্ক), শেষেরটি ২-চরণের (যুগ্মক)।

এ সব বিভাগ রূপের দিক থেকেও, ভাবের দিক থেকেও।

(৪) চরণশেষে মিল (অন্ত্যমিল) থাকবে। তবে সে মিল প্রতি ২-চরণের একঘেয়ে অন্ত্যমিল নয়। মিল তৈরি হবে নির্দিষ্ট ছকে, সে ছক উঠে আসবে নীচের ৩টি য়ুরোপীয় আদর্শের যেকোনো ১টি থেকে।

পেত্রার্কীয় মিল—কখখখ-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক + ষট্ক

ফরাসি মিল—কখখখ-কখখক গগ চছচছ = অষ্টক + যুগ্মক + চতুষ্ক

সেক্স্পিরীয় মিল—কখকখ-গঘগঘ পফপফ চচ = চতুষ্ক + চতুষ্ক + চতুষ্ক + যুগ্মক

চরণের শেষ দলের (বা অক্ষরের) উচ্চারণ থেকেই সাধারণ অন্ত্যমিল তৈরি হয়। ক খ গ ঘ চ ছ জ প ফ—এক-একটি বর্ণ 'চতুর্দশপদী' এক-একটি চরণের শেষ দলের উচ্চারণের চিহ্ন। পরের দৃষ্টান্তগুলিতে চরণশেষে এসব চিহ্ন পরপর সাজিয়ে মিলের ছক নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন। তখন দেখবেন, প্রতিটি 'চতুর্দশপদী'র মিলের ছক কোনো-না-কোনো আদর্শের আদলে তৈরি। তবে দুটি-একটি এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়বে, যেখানে নির্দিষ্ট আদর্শ পুরোপুরি মানা হয় নি। বাঙালি কবিরা 'চতুর্দশপদী' লিখতে গিয়ে একটু স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতাই কেবল ৭টি যুগ্মকের সমষ্টি—অর্থাৎ, ২-চরণের ৭টি অন্ত্যমিল সাজানো এক-একটি 'চতুর্দশপদী'।

অতএব, একটি ১৪-চরণের কবিতা ওপরের ৪-টি শর্ত মানলে তবেই হয়ে ওঠে 'চতুর্দশপদী'। এর অন্তর্গত ভাব প্রবহমান হতে পারে, না-ও হতে পারে। অর্থাৎ, ছেদ-যতির মিলন থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে।

এবারে পর পর ৩টি দৃষ্টান্ত সতর্কতার সঙ্গে পড়ুন। লক্ষ করুন, কীভাবে এক-একটি কবিতা 'চতুর্দশপদী' হয়ে উঠেছে।

দৃষ্টান্ত-১.

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে	ক	অষ্টক
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে	খ	
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে	খ	
মনোহরা !) বাম করে সাপটি হেলনে	ক	
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।	ক	
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,	খ	
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।	খ	
কার না ভোলে রে মন ঃ, এ হেন ছলনে !	ক	
কবিতা-পঙ্কজে রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,	চ	ষট্‌ক
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে	ছ	
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী	জ	
বাগ্‌দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,	চ	
এব কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?	ছ	
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥	জ	[কমলে কামিনী ঃ মধুসূদন দত্ত]

১৪-চরণের এই কবিতার প্রতিটি চরণ উচ্চারণ করে করে মনে মনে অর্ধযতি-পূর্ণযতির জায়গা খুঁজে বের করুন, দলের মাত্রা আন্দাজ করুন, তা থেকে এক-একটি পর্বের মাপ স্থির করুন। দেখবেন, মুক্তদল যেখানেই থাকুক ১-মাত্রার, রুদ্ধদল শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার হচ্ছে। বোঝা গেল কবিতাটি মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে লেখা। যতির অবস্থান দেখে এও বোঝা যাবে, প্রতিটি চরণ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ারে বাঁধা।

এবারে লক্ষ করুন, কবিতাটির স্তবক-বিভাগ আর অন্ত্যমিলের ছক ওপরে-নীচে লেখা চরণশেষের বর্ণ-চিহ্নগুলি পাশাপাশি সাজালে অন্ত্যমিলের এইরকম একটা ছক পাওয়া যাবে—

কখখক-কখখক চছজ-চছজ

একটু আগেই আপনারা দেখলেন, এটা পেত্রার্কীয় মিলের ছক। তাহলে ধরে নিতে পারেন, কবিতাটির স্তবক-বিভাগও হবে পেত্রার্কীয় আদর্শে। অর্থাৎ, এর স্তবক ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষট্‌ক)। রূপের দিক থেকে কবিতাটি যে এ-রম ২টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে, তা বোঝা যায় অন্ত্যমিলের ছক থেকেই—

কখখক-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক্ + ষট্‌ক 'কখ' মিলদুটি ৪-বার ঘুরে ঘুরে এসে ৮-চরণের (অষ্টক) প্রথম স্তবকটি গড়ে তুলেছে। দ্বিতীয় স্তবক তৈরি হয়েছে 'চছজ' মিল-তিনটির ২-বারের আবর্তনে, ৬টি চরণ নিয়ে (ষট্‌ক)।

এবারে কবিতাটির অন্তর্গত বক্তব্য বা ভাবের দিকটা দেখুন। ৮-চরণের প্রথম স্তবকে 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের মূলচরিত্র ধনপতি সদাগত-প্রসঙ্গ, ৬-চরণের দ্বিতীয় স্তবকে চণ্ডীমঙ্গালের কবি প্রসঙ্গ। অতএব, ভাবের দিক থেকেও ২টি স্তবকে কবিতাটি ভাগ হয়ে গেছে সহজেই।

ছেদ-যতির সম্পর্ক লক্ষ করুন। ছেদের যত্রতত্র প্রয়োগ (চরণের ৩, ৪, ৮, ১১, ১৪ মাত্রার পরে) ভাবের প্রবহমানতার লক্ষণ হয়ে আছে। পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন ৫টি চরণের শেষে ঘটলেও বাকি ৯টি চরণেই তো বিচ্ছেদ। অতএব, কবিতাটি প্রবহমান পয়ারেই লেখা।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই—সব শর্ত মেনে নিয়ে কবিতাটি পেত্রার্কীয় লেখা একটি 'চতুর্দশপদী'।

দৃষ্টান্ত-২.

নয়ন-গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল ক
বুল্‌বুলের সুরে আজি বেঁধেছি সেতার। খ
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার খ
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল। ক
যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল, ক
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার। খ
মম গীতে নত তব চোখের পাতার খ
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল। ক

বাজিয়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব, গ
পাইনি সে সুরে তব প্রাণের জবাব। গ

আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার চ
টুট্‌কিতে রাখি সব আশা ভালোবাসা ছ
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার— চ
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা-ভাসা। ছ

[গজল ঃ প্রমথ চৌধুরী]

এইমাত্র দৃষ্টান্ত-১ বিশ্লেষণ করলেন। একই পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত-২ বিশ্লেষণ করুন। দেখা যাবে, এ কবিতার ১৪টি চরণও আগের মতোই ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ারে নিবদ্ধ, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। অবশ্য, স্তবক-বিভাগ আর অন্ত্যমিলের ছকে একটুখানি ফারাক রয়েছে। এই ফারাকটি লক্ষ করুন—

কবিতা	মিলের ছক	স্তবক-বিভাগের ছক	য়ুরোপীয় আদর্শ
দৃষ্টান্ত-১	কখখক-কখখক চছজ-চছজ	অষ্টক + ষট্‌ক	পেত্রার্কীয়
দৃষ্টান্ত-২	কখখক-কখখক গগ-চছচছ	অষ্টক + যুগ্মক + চতুষ্ক	ফরাসি

২টি দৃষ্টান্তেই অষ্টক পুরোপুরি এক। কেবল, দৃষ্টান্ত-১ এর ষট্‌ক (৬টি চরণের দ্বিতীয় স্তবক) দু'-টুকরোয় ভেঙে দৃষ্টান্ত-২-এর যুগ্মক (২-চরণের দ্বিতীয় স্তবক) আর চতুষ্ক (৪-চরণের তৃতীয় স্তবক) তৈরি করেছে। এর ফলে দৃষ্টান্ত-২-এর কবিতায় স্তবক পেলাম ৩টি, দৃষ্টান্ত-১-এ ছিল ২টি স্তবক। ফারাক এইটুকুই। কিন্তু, এইটুকুতেই আদর্শের ফারাক ঘটে গেল অনেকখানি। দৃষ্টান্ত-২-এর আদর্শ ছিল পেত্রার্কীয়, দৃষ্টান্ত-৩-এর আদর্শ হয়ে গেল ফরাসি। স্তবক-বিভাগ আর মিলের ছক—দুদিক থেকেই এ কবিতায় পুরোপুরি ফরাসি আদর্শের ছাপ।

ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে লঘু গজলের সুর রচনার উদ্যোগ গোটা কবিতার বক্তব্য বা ভাব। এই ভাবটিকে ৩টি ভাগে ভাগ করে ৩টি স্তবকে কবি সাজালেন, সহায়ক হিসেবে পেলেন ফরাসি মিলের ছকটি। প্রথম স্তবকের অষ্টক লঘু গজলের সুরে সেতার বাঁধার কথা, দ্বিতীয় স্তবকের ২টি চরণে বীণা-রবারের ব্যর্থতার কথা, আর তৃতীয় স্তবকের চতুষ্কে অনিচ্ছার সঙ্গেই ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তের কথা—স্তবক-বিন্যাসের এই পদ্ধতি পুরোপুরি ফরাসি সনেটের পদ্ধতি।

অতএব, দৃষ্টান্ত-২ এর কবিতাটি নিঃসন্দেহে ফরাসি আদর্শে লেখা একটি নিটোল 'চতুর্দশপদী'। ছেদ-যতির অবস্থানে প্রবহমানতার কোনো লক্ষণ কবিতায় নেই।

দৃষ্টান্ত-৩.

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি, ক
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে খ
হয়ে আসে দুরস্মৃত কাহিনী কেবলি— ক
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে। খ

তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি, গ
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন খ
দেখো না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি- গ
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন। ঘ

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে প
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা ফ
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে প
অথবা বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা ফ

তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর চ
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধারা চ

[তবু/ মানসী ঃ রবীন্দ্রনাথ]

দৃষ্টান্ত-১-এর পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করুন। ১৪-চরণের এ কবিতাতেও পাবেন ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার, মিশ্রবৃত্ত রীতি। তবে, পুরোপুরি অন্যরকম এর মিলের ছক আর স্তবক-বিভাগ। মিলের ছক **কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ ;** ৩টি চতুষ্ক আর ১টি যুগ্মক—এই ৪টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে কবিতাটি। রূপের পাশাপাশি ভাবের দিকটাও দেখুন। 'তবু মনে রেখো' কথাটি দিয়ে শুরু-হওয়া প্রতিটি স্তবকে একটি করে আবেদনের করুণ সুর বাজছে। এমনি করি কবিতাটির ভাগ হল সেক্স্পিরীয় মিলের ছকে ৪টি স্তবকে। অতএব, এটি নিখুঁত সেক্সপিরীয় আদর্শে তৈরি 'চতুর্দশপদী'।

'চতুর্দশপদী'-র ৩টি নিখুঁত দৃষ্টান্ত পরপর দেখলেন। এবার দেখুন শর্ত-না-মানা এমন ৩টি দৃষ্টান্ত, যার কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মিশ্রবৃত্ত পয়ারে বাঁধা ১৪টি চরণের কাঠামো ছাড়া 'চতুর্দশপদী' হবার মতো আর কোনো গুণ কবিতা তিনটির নেই।

দৃষ্টান্ত-১.

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় — ক
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় — ক
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার — খ
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার — খ
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত — গ
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো — গ
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায় — ঘ
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় — ঘ
তোমার মন্দির-মাঝে
ইন্দ্রিয়ের দ্বার — চ
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার। — চ
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে — ছ
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে — ছ

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া, — জ
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। — জ

[মুক্তি ঃ নৈবেদ্য]

দৃষ্টান্ত-২.

কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছে কার লাগি, — ক
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন, — খ
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ, — খ
চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি। — ক
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস, — গ
আকাশপ্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস, — গ
জগতের ঊর্নাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি। — ক
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিস দোসর, — ঘ

পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ, গ
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর। ঘ
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস, গ
সহস্র শরদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর— ঘ
হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া— চ
আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া॥ চ

দৃষ্টান্ত-৩. এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতামাঝে
মেলিনু নয়ন ; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মিলন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

[প্রান্তিক-৩]

দৃষ্টান্ত-১-এর কবিতাটিতে ১৪টি চরণ আছে, প্রতিটি চরণে ৮+৬ মাত্রা আছে, ছন্দরীতিও মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, মিলের ছক **কক খখ গগ ঘঘ চচ ছছ জজ**। অর্থাৎ, ৭-রকমের অন্ত্যমিলে তৈরি ৭-জোড়া চরণ বা ৭টি যুগ্মকে কবিতাটি ভাগ হয়ে আছে। অথচ, ভাবের দিক থেকে কবি নিজেই কবিতাটিকে ভাগ করেছেন ৩টি স্তবকে—প্রথম স্তবকে ৮.৫টি, দ্বিতীয় স্তবকে ৩.৫ টি আর শেষ স্তবকে ২টি চরণ। এ-রকম অদ্ভুত স্তবক-বিভাগ 'চতুর্দশপদী'র ইতিহাসে কেবল রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। অন্যমিল আর স্তবক-বিভাগে কোনো আদর্শ বা প্রথাকে এ কবিতায় গ্রাহ্যই করা হয়নি।

দৃষ্টান্ত-২-এ ১৪ চরণের এমন একটি কবিতা এই প্রথম পেলেন, যার প্রতিটি চরণ ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারে বাঁধা। ছন্দরীতি অবশ্য আগের মতোই মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, মিলের ছক **কখখক গগকঘ গঘগঘ চচ** যা এতকাল ধরে চালু ৩টি আদর্শের ১টিকেও মানছে না। ছকটি দেখে মনে হবে, পরপর ৩টি চতুষ্ক আর ১টি যুগ্মক নিয়ে সেক্স্‌পিরীয় আদর্শের স্তবক-বিভাগ। অথচ, ভাবের দিক থেকে স্তবক-চারটি এইরকম—প্রথমে ১টি চতুষ্ক, মাঝখানে পরপর ২টি ত্রিতক (৩-চরণ), শেষে ১টি চতুষ্ক। এর অর্থ, স্তবক-বিভাগও কোনো আদর্শের তোয়াক্কা করে না।

দৃষ্টান্ত-৩-এর কবিতাটি ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের আর-একটি নমুনা। ১৪-চরণের আয়তনে মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ারের বাঁধন ছাড়া আর কোনো গুণ এর নেই, যার ওপর ভর করে কবিতাটি চতুর্দশপদী' হবার দাবি তুলতে পারে। প্রথমে ২টি দৃষ্টান্তে মিল আর স্তবক-বিভাগে কোনো-না-কোনো ছক ছিল-ই। আলোচ্য দৃষ্টান্তে লক্ষ করুন—চরণশেষে মিল নেই, স্তবক-সাজানোর দায় নেই।

৩৬.১০ সারাংশ-৩

ইতালি-ইংরেজ-ফরাসি সনেটের আদলে তৈরি বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম **চতুর্দশপদী**।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা, ষোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারো, আর সতেরো ইংরেজ কবি সেক্স্পিয়ার—এঁদের হাতে তৈরি হল সনেটের ৩টি আদর্শ। এই ৩টি আদর্শেই লেখা হতে লাগল বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী', প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত।

'চতুর্দশপদী' কবিতাকে ১৪-চরণের কাঠামো নিয়ে আরো ৪টি শর্ত মেনে চলতে হয়—প্রতিটি চরণ পয়ারের, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, পেত্রার্কীয় ফরাসি বা সেক্স্পিরীয় ছকে স্তবক-বিভাগ, একই ছকে চরণ-শেষের মিল। ছক-তিনটি এইরকম—

ছক	স্তবক-বিভাগ	চরণশেষের মিল
পেত্রার্কীয়	৮-চরণ (অষ্টক) + ৬-চরণ (ষট্ক)	কখখক-কখখক চছজ-চছজ
ফরাসি	৮-চরণ (অষ্টক) + ২-চরণ (যুগ্মক) + ৪-চরণ (চতুষ্ক)	কখখক-কখখক গগ চছচছ
সেক্স্পিরীয়	৪-চরণ (চতুষ্ক) + ৪-চরণ + ৪-চরণ + ২-চরণ (যুগ্মক)	কখখক-গঘগঘ পফপফ চচ

ক খ গ ঘ প ফ চ ছ জ — এগুলি চরণশেষের মিলের চিহ্ন।

তবে য়ুরোপীয় আদর্শের ছক বাঙালি সনেট-কারেরা সবসময় মেনে চলেন নি। এমনকী, রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু কবিতা কেবল ১৪-চরণের মিশ্রবৃত্ত পয়ার, অথচ 'চতুর্দশপদী' নামেই চালু।

৩৬.১১ অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৯ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. চতুর্দশপদী-ছন্দোবন্ধের 'চতুর্দশপদী' নাম সংগত কিনা, কথাটির অর্থ এবং এ ছন্দোবন্ধের পক্ষে আবশ্যক শর্তগুলি উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

২. (ক) চতুর্দশপদীর আশ্রয় কী কী আদর্শ, লিখুন।
   (খ) চতুর্দশপদীর স্তবক-গঠনের ছক কী কী রকমের, লিখুন।
   (গ) চতুর্দশপদীর মিলের ছক কী কী রকমের, লিখুন।

৩. (ক) নীচের স্তবকগুলির প্রতিটি ছত্রের শেষে মিল-চিহ্ন (ক খ গ ঘ ইত্যাদি) বসান, তারপর দৃষ্টান্তটি চতুর্দশপদীর কী ধরনের স্তবক আর মিলের ছক হতে পারে, লিখুন ঃ

(i) স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।'

(ii) হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর-সনেট
কি সরল ! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে।

(iii) মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

(খ) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(i) য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম _____, বাংলায় তারই নাম চতুর্দশপদী।

(ii) _____ শতকের ইতালীয় কবি _____, _____ শতকের ফরাসি কবি _____ আর _____ শতকের ইংরেজ কবি _____ এর হাতেই গড়ে উঠল চতুর্দশপদীর মূল য়ুরোপীয় আদর্শ।

৩৬.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২২০ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ পয়ার, অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ

ছন্দরীতি আর ছন্দোবন্ধ, সাধারণ (অপ্রবহমান) পয়ার আর অমিত্রাক্ষর।

(গ) নীচের ছন্দোবন্ধে কী কী গুণ থাকা জরুরি, লিখুন ঃ পয়ার, অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী।

২. নীচের দৃষ্টান্ত কোন শ্রেণির ছন্দোবন্ধের, কারণ জানিয়ে লিখুন ঃ

(ক) তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

(খ) জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !

(গ) প্রিয়তমা সখী মম ? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে ?

(ঘ) যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দ্বীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরণা—স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার ধারা

৩৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

ছন্দরীতি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দোবন্ধ	পৃ-২৪১	পৃ-১৮	পৃ-৫৪
পয়ার	পৃ-২৪৯, ৫০,১৭০-৮৯	পৃ-১৮, ৭৬	×
প্রবহমানতা	পৃ-২৫৭	×	পৃ-১০৭, ১১২
মুক্তক	পৃ-১৮০-৮৯, ২৬৮	×	পৃ-১২, ১৩, ১০৭, ১১৭-২০, ১৪৭
অমিত্রাক্ষর	পৃ-২৩২, ২৩৩, ১৭৬-৮০	পৃ-১৯, ৭০-৭২	পৃ-১১১-১৫
চতুর্দশপদী	×	পৃ-৮৫, ৮৬	পৃ-১৪৫, ১৪৬

একক ৩৭ ❐ বাংলা কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ

গঠন

৩৭.১ উদ্দেশ্য

৩৭.২ প্রস্তাবনা

৩৭.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ, বিশ্লেষণের কৌশল

৩৭.৩.১ ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি

৩৭.৩.২ ছন্দলিপি-নির্মাণের ক্রম ঃ সরল পদ্ধতি

৩৭.৩.৩ তথ্য-তালিকার ছক ঃ সরল পদ্ধতি

৩৭.৪ সারাংশ

৩৭.৫ অনুশীলনী-১

৩৭.৬ মূলপাঠ-২ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

৩৭.৭ মূলপাঠ-৩ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

৩৭.৭.১ আধুনিক কলাবৃত্ত

৩৭.৭.২ প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ ব্রজবুলি কবিতায়

৩৭.৭.৩ প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ আধুনিক বাংলা কবিতায়

৩৭.৮ মূলপাঠ-৩ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

৩৭.৯ অনুশীলনী-২

৩৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩৭.১১ উত্তরমালা

৩৭.১ উদ্দেশ্য

এই একটিতে ছন্দ-বিশ্লেষণ করার যে পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে, তা অনুসরণ করার অভ্যাস করলে—

- ছন্দবিচারের তত্ত্বকে যেকোনো বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করার বিজ্ঞানসম্মত কৌশল ক্রমশ আয়ত্ত হবে।
- ছন্দ-ব্যবহারে একজন কবি কতটা সফল বা ব্যর্থ, তা বিচার করার সামর্থ্য তৈরি হবে।
- ছন্দ-রচনায় একজন কবি চলতি প্রথার শাসন কতটা মান্য করলেন অথবা নতুন পথের কতটুকু সন্ধান দিলেন—তা পরিমাপ করা সম্ভব হবে।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাব্য-কবিতা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা গড়ে উঠবে।

৩৭.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ক্রমশ কোন পথে কীভাবে এগিয়ে চলেছে, এর আগে পর ৩টি এককের পাঠ থেকে তার খানিকটা হদিস পেলেন। প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের দেখানো পথে চলতে চলতে বাংলা ছন্দের পরিভাষা রীতি আর ছন্দোবন্ধের পাঠ নেবার পর এতদিনে নিজের তৈরি পথে চলার সাহসও খানিকটা অর্জন করতে পেরেছে নিঃসন্দেহে। এ পর্যন্ত যা জানলেন, তার সবটাই তত্ত্ব। এবার সেই তত্ত্ব হাতে-কলমে প্রয়োগ করার পালা, যেকোনো একটি বাংলা কবিতার একটি স্তবক তুলে নিয়ে তার ছন্দ বিশ্লেষণ করতে বসার পালা। কবিতার নিহিত ভাবে বা বক্তব্যে আবেগ থাকতে পারে, কিন্তু ছন্দ-বিশ্লেষণে আবেগের স্থান নেই। এর পদ্ধতি নির্দিষ্ট, বিজ্ঞানসম্মত। একটি নির্দিষ্ট ছক সামনে রেখেই তা করতে হয়। আসুন, আমরা ছন্দতত্ত্বকে প্রয়োগ করার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাই এই এককে। এককের মূলপাঠকে ৪টি অংশে ভাগ করে নিয়ে ছন্দ-বিশ্লেষণের কাজটি সম্পূর্ণ করা হচ্ছে—প্রথম অংশে ছন্দ-বিশ্লেষণের কৌশল, পরের ৩টি অংশে পরপর ৩-রীতির ছন্দ-বিশ্লেষণের কয়েকটি নমুনা। একই ছন্দরীতিতে লেখা কিছু স্তবকের এক-একটি গুচ্ছ এক-একটি অংশে রাখা হচ্ছে ছন্দ-বিশ্লেষণের জন্য। এর ফলে এক-একটি ছন্দরীতির বিশেষ চরিত্রটি পরপর আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকবে।

৩৭.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণের কৌশল

ছন্দ-বিশ্লেষণ করার অর্থ আগেকার ৩টি একক থেকে অর্জন-করা তত্ত্বজ্ঞানকে কবিতার স্তবকে প্রয়োগ করা। এ কাজটি করার কৌশল ক্রমশ আয়ত্ত করে নেবেন অভ্যাস আর মনোযোগের সাহায্য। ছন্দ-বিশ্লেষণের মূলত ২টি ভাগ — প্রথমভাগে তৈরি করুন একটি ছন্দ-লিপি (অনেকটা গানের স্বরলিপির মতো), কবিতার স্তবকটিতে আবশ্যকমতো কয়েকটি সংকেত-চিহ্ন জুড়ে দিয়ে ; দ্বিতীয়ভাগে তৈরি করুন তথ্য-তালিকার একটি ছক, ছকটি পূরণ করুন ছন্দলিপি থেকে পাওয়া তথ্য পরপর ওপর থেকে নীচে সাজিয়ে। অর্থাৎ, ছন্দলিপির কাজ জরুরি তথ্যের যোগান দেওয়া, তথ্য-তালিকার ছকের কাজ সেই তথ্যগুলি থাকে থাকে সাজিয়ে রাখা।

প্রথমে দেখুন, প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কী পদ্ধতিতে ছন্দলিপি তৈরি করতেন। এরপর ভেবে নিন, আপনি নিজে কোন পদ্ধতিতে ছন্দ-লিপি তৈরি করবেন। পদ্ধতি স্থির হয়ে যাবার পর জেনে নিন, ছন্দলিপি তৈরির কাজটা করতে গিয়ে পরপর কীভাবে এগোবেন। ছন্দলিপি তৈরির কৌশল জানা হয়ে গেলে তথ্য-তালিকার ছক তৈরি এবং তা পূরণ করার পদ্ধতিটি বুঝে নিন।

৩৭.৩.১. ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি

ছন্দলিপি-নির্মাণের অর্থ কবিতার স্তবকের গায়ে সংকেত চিহ্নের আঁচড় কেটে দেওয়া। সংকেত-চিহ্নের প্রধানত ৩ রকমের কাজ—যতিচিহ্নের কাজ যতি কোথায় পড়ছে তা দেখিয়ে দেওয়া, মাত্রাচিহ্নের কাজ প্রতিটি দল বা অক্ষরের মাত্রা কটি তা জানিয়ে দেওয়া, আর প্রস্বর-চিহ্ন বা শ্বাসাঘাত-চিহ্নের কাজ কোন দলের ওপর

প্রস্বর পড়ছে বা কোন অক্ষরের ওপর শ্বাসাঘাত পড়ছে তা নির্দেশ করা। এবারে নীচের ছকটিতে পরপর দেখুন, প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কী ধরনের সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করতেন—

ছান্দসিক	যতিচিহ্ন	মাত্রাচিহ্ন	প্রস্বর/শ্বাসাঘাত-চিহ্ন
প্রবোধচন্দ্র	পর্বযতি (।) পদযতি (।।)	১-মাত্রা (•), ২-মাত্রা (-)	প্রস্বর (/)
অমূল্যধন	অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (।।)	১-মাত্রা (০, ‿, /)	
		২-মাত্রা (।। , —, ঃ)	শ্বাসাঘাত (/)

নীচে পরপর ৪টি স্তবকের দৃষ্টান্ত মন দিয়ে লক্ষ করতে থাকুন। সহজেই বুঝে নিতে পারবেন, প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের ছন্দ-লিপি নির্মাণের পদ্ধতি—বুঝে নেবেন কোথায় তাঁদের মিল, কোথায় গরমিল।

দৃষ্টান্ত-১. নানা ছাপের জমল্ শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো ;
বছর-দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জর জর।

সংকেত-চিহ্ন জুড়ে দিয়ে প্রবোধচন্দ্র তৈরি করবেন এইরকম একটি ছন্দ-লিপি ঃ

র্না•না ছা• **পের্**। **র্জম্•ল•** শি•শি ।। র্না•না•মা•পের্ । র্কউ•টৌ•হ•ল । র্জ• ড়ো ; = ৪+৪।।৪+৪+২

র্ব•**ছর্**•দে•**ড়েক্**। র্চি•**কিৎ**•সা•তে ।। **র্কর্**•লে•য•খন্ । র্অস্•থি•জ•র । র্জ• র = ৪+৪।।৪+৪+২

সংকেত-চিহ্ন ঃ পর্যযতি (।), পদযতি (।।) ; ১-মাত্রা (•) ; প্রস্বর (/)।

অমূল্যধনের সংকেত-চিহ্ন অন্যরকম, তাঁর হাতে ছন্দ-লিপিটি হবে এইরকম ঃ

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

নানা ছার্পের। জর্ম্ল শিশি। নানা মার্পের্। **র্কউ** টো হল। জড়ো = ৪ + ৪ ।। ৪ + ৪ + ২

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ব**র্ছর্** দের্ড়েক্। চির্কিৎসাতে। **র্কর্**লে য**র্খন্**। **র্অস্**থি জর। জর ।। = ৪ + ৪ ।। ৪ + ৪ + ২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; ১-মাত্রা (০, /) ; শ্বাসাঘাত (/)।

দৃষ্টান্ত-২. বনপথে প্রান্তরে লুণ্ঠিত করি
গৈরিক গোধূলির ম্লান উত্তরী।

সংকেত-চিহ্ন প্রয়োগের পর প্রবোধচন্দ্রের তৈরি ছন্দ-লিপিটি হবে অনেকটা

এইরকম র্ব• ন• প• থে। প্রা-নর্ত• রে॥ লু্-ন্ঠি• ত। র্ক• রি = ৪ + ৪ ॥ ৪ + ২

র্গ-ইরি-ক্। র্গো• ধূ• লি-র্॥ **ম্লা•** ন• উ-ৎ ত• রী = ৪ + ৪ ॥ ৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ পর্যযতি (।), পদযতি (।।) ; ১-মাত্রা (•) ; ২-মাত্র (—), প্রস্বর (/)।

এর পাশে লক্ষ করুন অমূল্যধনের তৈরি ছন্দ-লিপিটি ঃ

oooo	— oo	— oo	o o	
বনপথে	প্রানতরে	লুণ্ঠিত	করি	= ৮ + ৬
— o o	o o o o	o o	— oo	
গাইরিক	গোধূলির্	ম্লান	উৎতরী	= ৮ + ৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; ১-মাত্রা (o) ; ২ মাত্রা (—)।

দৃষ্টান্ত-৩. "রে সতি রে মতি" কাঁদিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন ততদিন না ছিল ক্লেশ।

প্রবোধচন্দ্রের ছন্দলিপি ঃ

রে্-স• তি। রে্-স• তি ॥ কাঁ-দি• ল। র্প• শু• প• তি ॥ র্পা-গ• ল। র্শি-ব• প্র• ম• থে-শ্।
= ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৬

র্যো-গ• ম• গ• ন• হ• র ॥ র্তা-প• স। য• ত• দি-ন্ ॥ র্ত• ত• দি-ন্। র্না-ছি• ল। ক্লে-শ্ ॥
= ৮ ॥ ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৪ + ২

সংকেত-চিহ্ন ঃ পর্যযতি (।), পদযতি (।।) ; ১-মাত্রা (•) ; ২-মাত্রা (-) ; প্রস্বর (/)।

অমূল্যধনের ছন্দলিপি ঃ

‖	oo	‖	oo	‖ oo	oooo	‖ oo	oo	oo o o	
রে	সতি	রে	**সতি**	কাঁদিল	পশুপতি	পাগল	শিব	প্রমথেশ্	= ৮+৮+১০
‖ o	ooo oo	‖ oo	o oo o	o oo o	‖	oo	o o		
যোগ	মগন হর	**তাপস**	যতদিন	ততদিন	না	ছিল	ক্লেশ্		= ৮+৮+১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; ১-মাত্রা (o) ; ২-মাত্রা (।।, ঃ)।

দৃষ্টান্ত-৪. নক্ষত্র-আলোক হতে সমুদ্রের তরঙ্গা অবধি,
বহে চলে একখানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী।

প্রবোধচন্দ্রের ছন্দলিপি ঃ

নর্ক্• **খৎ•** র । আ• **লো-ক্** **হ•** তে ।। **র্স•** **মুদ্•** রে-র । **র্ত•** **রঙ্•** গ• অ• ব• ধি, = ৮।।৪+৬

র্ব• হে• চ• **লে** । **এ্র-ক্** **খা•** নি ।। **র্প•** রি• **পূর্•** ণ্ । যউ• ব• নে-র্ । র্ন-দী । = ৪+৪।।৪+৪+২

সংকেত-চিহ্ন ঃ পর্বযতি (।), পদযতি (।।) ; ১-মাত্রা (•) ; ২-মাত্রা (-) ; প্রস্বর (/)।

অমূল্যধনের ছন্দলিপি ঃ

		o		o			
‿	‿o	o o	o o	o‿o	o‿ o	ooo	
নক্	খৎর	আলোক্	হতে	সমুদ্রের্	তরঙ্গ্	**অবধি**	= ৮ + ১০

		o			o		
o o	o o	o	o o	oo‿o	‿o o	oo	
বহে	চলে	এক	খানি	পরিপূরণ্	যউবনের	**নদী**	= ৮ + ১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (॥) ; ১-মাত্রা (০, ‿) ; ২-মাত্রা (ঃ)।

ওপরের ৪টি দৃষ্টান্ত থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের ছন্দ-লিপি নির্মাণের পদ্ধতির মিল-গরমিল। দৃষ্টান্তগুলিতে লক্ষ করুন,

প্রবোধচন্দ্র ছন্দ-লিপি তৈরি করতে গিয়ে—

১. ছত্রের শেষে যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন না। পঙ্ক্তির মাঝখানে পর্ববিভাগ করেন পর্বযতি-চিহ্ন (।) দিয়ে, আর পদবিভাগ করেন পদযতি (।।) দিয়ে।

২. পর্বের শেষ দল ১-মাত্রার হলে মাত্রাচিহ্ন ব্যবহার করেন না। অর্থাৎ, শেষ দলে মাত্রাচিহ্ন না থাকলে ধরে নিতে হবে, দলটি ১-মাত্রার।

৩. পর্বের প্রথম দলে প্রস্বর-চিহ্ন (/) ব্যবহার করেন।

৪. যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন পাশাপাশি ২টি পর্বের মাঝখানে, মাত্রাচিহ্ন দেন দলের পাশে, (কেবল রুদ্ধদলের ২-মাত্রার চিহ্ন (-) দেন দলের মাঝখানে), প্রস্বর-চিহ্ন তোলেন দলের মাথায়।

আমূল্যধন ছন্দ-লিপি তৈরি করতে গিয়ে—

১. চরণের শেষে আঁকেন পূর্ণযতি-চিহ্ন (।।), চরণের মাঝখানে পর্ববিভাগ করেন অর্ধযতি-চিহ্ন (।) দিয়ে।

২. ১-মাত্রা বোঝাতে ৩-রকমের চিহ্ন প্রয়োগ করেন (০, ‿, /)। মাত্রাচিহ্ন (০) দেন স্বরান্ত অক্ষরে (হ্রস্ব উচ্চারণ হলে), মাত্রাচিহ্ন (‿) দেন শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে-থাকা হলন্ত অক্ষরে (হ্রস্ব উচ্চারণ হলে, তানপ্রধান রীতিতে), মাত্রাচিহ্ন (/) দেন শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষরে (শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতিতে)।

৩. ২-মাত্রার বোঝাতেও ৩-রকমের চিহ্ন প্রয়োগ করেন (।।, —, ঃ)। (।।)-চিহ্ন দেন স্বরান্ত অক্ষরে (দীর্ঘ উচ্চারণ হলে), (—)-চিহ্ন দেন শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকা হলন্ত অক্ষরে (দীর্ঘ উচ্চারণ হলে, ধ্বনিপ্রধান রীতিতে), (ঃ)-চিহ্ন দেন শব্দের শেষে-থাকা হলন্ত অক্ষরে (ধ্বনিপ্রধান আর তানপ্রধান রীতিতে)।

৪. শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতিতে প্রতি পর্বের হলন্ত অক্ষরে রুদ্ধদলে হলন্ত অক্ষর না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে) শ্বাসঘাত-চিহ্ন (/) প্রয়োগ করেন।

৫. অর্ধযতি-চিহ্ন (।) প্রয়োগ করেন পাশাপাশি ২টি পর্বের মাঝখানে, মাত্রাচিহ্ন আর শ্বাসাঘাত-চিহ্ন দেন অক্ষরের মাথায়।

একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো। ছন্দ-লিপির যে-কটি নমুনা দেখানো হল, সেগুলি প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন হুবহু যা করতেন তার প্রতিরূপ নয়, যা করতে পারতেন, তার সম্ভাব্য রূপ। ছন্দ-লিপিকে খানিকটা সরল চেহারা দেবার জন্য প্রবোধচন্দ্রের উপপর্বযতি আর যতিলোপের চিহ্ন আর অমূল্যধনের পর্বাক্ষ-চিহ্ন সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে। পর্বের প্রথম স্বরান্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাতের চিহ্ন অমূল্যধন সব ক্ষেত্রে দেন নি।

আর-একটি কথা। আগ্রহী শিক্ষার্থী যাঁরা, তাঁদের কথা ভেবে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে দেবার চেষ্টা এখানে করা হল। পছন্দমতো যেকোনো ১টি পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা ছন্দলিপি তৈরি করতে পারবেন। তবে এই ২টি পদ্ধতির বাইরে আরও সহজ কোনো পদ্ধতি ভাবা যায় কিনা দেখা যায় ঃ

১. **যতিচিহ্ন** ঃ পর্বের শেষে কম থামা (অর্ধযতি) আর চরণের শেষে পুরো থামা (পূর্ণযতি)—অমূল্যধনের এই ২-রকমের থামার মাঝামাঝি আর-এক রকমের থামার (পদযতি) যে-তত্ত্ব প্রবোধচন্দ্র দিলেন, তা খুঁজে পাওয়া সব সময় সহজ নয়। অন্যদিকে, প্রবোধচন্দ্রের ছত্রশেষে যতিচিহ্ন নিষিদ্ধ থাকার কারণে পঙ্‌ক্তিযতির (১-পদের ছত্রশেষে পদযতির জায়গা বুঝে ওঠাও কখনো কখনো শক্ত হয়ে পড়ে। এসব কারণে অমূল্যধনের তত্ত্ব মেনে নিয়ে পর্বশেষে অর্ধযতি (।) আর চরণশেষে পূর্ণযতির (।।) চিহ্ন প্রয়োগ করাই নিরাপদ।

২. **মাত্রাচিহ্ন** ঃ ১-মাত্রার জন্য ৩-রকমের চিহ্ন আর ২-মাত্রার জন্যও ৩-রকমের চিহ্ন—অমূল্যধনের এই প্রয়োগ প্রবোধচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি জটিল। মাত্রাচিহ্ন আরও নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট হতে পারে, যদি ১-মাত্রা বোঝাতে ১, আর ২-মাত্রা বোঝাতে ২ ব্যবহার করি। ছন্দলিপি তৈরির ক্ষেত্রে কাল্পনিক সংকেত-চিহ্নের বদলে এই অঙ্কদুটির ব্যবহার কোনো কোনো ছন্দভাবুক এর আগেও করেছেন, সম্প্রতি অধ্যাপক পবিত্র সরকারও করলেন।

৩. **প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত-চিহ্ন** ঃ যে কোনো রীতির ছন্দেই প্রতি পর্বের প্রথম দলে প্রবোধচন্দ্রের প্রস্বর-প্রয়োগ, আর কেবলমাত্র শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দেই প্রতি পর্বে অমূল্যধনের শ্বাসাঘাত-প্রয়োগ—এই ২টি ক্ষেত্রেই ভাবুক-মহলে বিতর্ক রয়েছে। অতএব, বিতর্ক এড়িয়ে প্রস্বর-চিহ্ন বা শ্বাসাঘাত-চিহ্ন ছন্দলিপি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই সংগত বলে আমরা মনে করি।

এই ৩-দফা ভাবনার ওপর নির্ভর করে আগের ৪টি দৃষ্টান্তের ছন্দলিপি বদলে দেওয়া যাক ঃ

দৃষ্টান্ত-১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ‖
নানা ছাপের্ | জম্‌ল শিশি | নানা মাপের্ | কৌটো হল | জড়ো ‖ = ৪+৪+৪+৪+২

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ‖
বছর্ দেড়েক্ | চিকিৎসাতে | কর্‌লে যখন্ | অস্‌থি জর | জর ‖ = ৪+৪+৪+৪+২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

দৃষ্টান্ত-২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ‖ = ৮+৬
বনপথে প্রান্‌তরে | লুণ্‌ঠিত করি

২ ২ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ১ ১ ‖ = ৮+৬
গৈরিক্ গোধূলির | ম্লান উৎতরী

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

দৃষ্টান্ত-৩ ২ ১ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ‖ = ৮+৮+১০
রে সতি রে **সতি** | কাঁদিল পশুপতি | পাগল শিব প্রমথেশ্

২ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ‖ = ৮+৮+১০
যোগ মগন হর | **তাপস** যতদিন্ | ততদিন্ না ছিল ক্লেশ্

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

দৃষ্টান্ত-৪ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ‖ = ৮ + ১০
নক্‌খৎর আলোক্ হতে | সমুদ্‌রের্ তরঙ্‌গ **অবধি**

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ‖ = ৮ + ১০
বহে চলে এক্ খানি | পরিপূরণ্ যৌবনের্ **নদী**

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

নিশ্চয় লক্ষ করছেন, প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের দেখানো পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি অনেকখানি সহজ সরল।

৩৭.৩.২ ছন্দলিপি-নির্মাণের ক্রম ঃ সরল পদ্ধতি

ধরা যাক্, ছন্দলিপি তৈরি করতে হবে নীচের স্তবকটির—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম র- নবর-ের মালে।

প্রথম কাজ, উচ্চারণ অনুসারে বানান তৈরি করে দল বা অক্ষরগুলি পর পর সাজানো, সেইসঙ্গে ছেদ-চিহ্ন তুলে দেওয়া। স্তবকটির চেহারা তখন এইরকম হবে—

আমি যদি জন্ম নিতেম্ কালিদাসের্ কালে
দইবে হতেম্ দশম্ রত্ন নবরত্নের্ মালে

দ্বিতীয় কাজ, ঠিক ঠিক জায়গায় যতিচিহ্ন বসানো—অর্ধযতি (।) আর পূর্ণযতি (।।)। প্রথম ছত্রটি আমরা কীভাবে পড়ব ? আমি, যদি, জন্ম, নিতেম, কালিদাসের্, কালে—এইভাবে প্রতিটি শব্দের পর থেমে থেমে পড়ব না। আমি যদি জন্ম, নিতেম্ কালিদাসের্, কালে—এভাবেও না। সঠিক পড়া হবে এইভাবে—আমি যদি, জন্ম নিতেম্, কালিদাসের, কালে—এই ৪টি ভাগে ছত্রটিকে ভাগ করে। প্রথমে থামব 'আমি যদি'-র পর, এটা ঠিক করতে পারলেই পরে কোথায় থামব, সে জায়গাগুলি পর পর খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ, কবিতার একটি ছত্র পড়তে গিয়ে সমান সমান দূরত্বে থামাটাই ছন্দের শৃঙ্খলা। 'আমি যদি'-র পর সমান মাপের টুকরো 'জন্ম নিতেম্' 'কালিদাসের' পর পর জিহ্বাকে একটুখানি করে থামায়। এই একটুখানি থামার জায়গাতেই অর্ধযতি পড়ে। আর, 'কালে'-শব্দটি উচ্চারণের পর জিহ্বা পুরোপুরি থামে। এই পুরোপুরি থামার জায়গাতে পড়ে পূর্ণযতি। একই নিয়মে অর্ধযতি আর পূর্ণযতি পড়বে দ্বিতীয় ছত্রেও। যতিচিহ্ন দেবার পর ছত্রদুটি এইরকম দেখাবে—

আমি যদি। জন্ম নিতেম্। কালিদাসের্। কালে ।।
দইবে হতেম্। দশম্ রত্ন। নবরত্নের্। মালে ।।

পূর্ণযতির চিহ্ন (।।) দেখিয়ে দিচ্ছে, এক-একটি ছত্র আসলে এক-একটি চরণ। আর, প্রতিটি চরণ ৪টি করে টুকরোয় ভাগ হয়ে গেছে ৪টি করে যতিচিহ্নের আঘাতে। এক-একটি টুকরো এখানে এক-একটি পর্ব—অর্থাৎ, প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব। উচ্চারণেই বোঝা যায়, প্রথম ৩টি পর্ব সমান মাপের, শেষপর্ব ছোটো। এই মাপটা সঠিক বুঝবেন মাত্রাচিহ্ন দেবার পর।

তৃতীয় কাজ, ঠিক ঠিক চিনে নেওয়া—কোনটা মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর, আর কোনটা রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর। ২-রকমের দল বা অক্ষরকে আলাদা করার জন্য রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষরের নীচে দাগ দিয়ে রাখুন। ছাপায় অবশ্য রুদ্ধদলকে মোটা হরফে দেখানো হচ্ছে—

আমি যদি। **জন্ম নিতেম্**। কালিদা**সের্** । কালে ।।
দইবে **হতেম্**। **দশম্** রত্**ন** । নব**রত্নের্**। মালে ।।

লক্ষ করুন প্রথম চরণে আ মি য দি ম নি কা লি দা কা লে — **মুক্ত**দল বা স্বরান্ত অক্ষর, জন্ তেম্ সের্ — রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর ; দ্বিতীয় চরণে বে হ দ ন ন ব মা লে — **মুক্ত**দল বা স্বরান্ত অক্ষর, দই তেম্ শম্, রত্ রত্নের্ — রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর।

চতুর্থ কাজ, দলের (বা অক্ষরের) মাপ বা মাত্রা ঠিক করা। মনে রাখবেন, ছন্দ বুঝতে সাহায্য করে কান, বিভ্রান্ত করে চোখ। চোখ বর্ণ-হরফ-বানান দেখে, কান দল বা অক্ষরের উচ্চারণ শোনে। আমরা মানব কানের সাক্ষ্য, কান শুনবে দল বা অক্ষরের ঠিক ঠিক উচ্চারণ। উচ্চারণ শুনে কান-ই জানিয়ে দেবে, কোন দলে (বা অক্ষরে) কত মাত্রা। একথা জানেন—মুক্তদল (বা স্বরান্ত অক্ষর) সাধারণত ১-মাত্রার, রুদ্ধদল (বা হলন্ত অক্ষর) ১ বা ২-মাত্রার। অর্থাৎ মুক্তদল নিয়ে সমস্যা নেই, ভাবনা কেবল রুদ্ধদল নিয়ে। বুঝতে হবে এইক্ষেত্রে রুদ্ধদলের মাত্রা ১ বা ২। এবার দেখুন, প্রথম চরণের প্রথম পর্বে (আমি যদি) ৪টি দলই (বা অক্ষর) মুক্ত (বা স্বরান্ত),—তাহলে, প্রতিটি দলের ১-মাত্রা হিসেবে পর্বের মাপ ৪-মাত্রা। উচ্চারণ থেকে আগেই জেনেছেন, চরণের প্রথম ৩টি পর্ব সমান মাপের। অথচ, প্রথম পর্বের ৪-মাত্রা নির্দিষ্ট। অতএব, পরের ২টি পর্ব 'জন্‌ম নিতেম্' ৪-মাত্রার 'কালিদাসের্'- ও ৪-মাত্রার। 'জন্‌ম নিতেম্' ৪-মাত্রার মধ্যে ২টি মুক্তদলে (জ, নি) নির্দিষ্ট ২-মাত্রা, তাহলে বাকি ২টি রুদ্ধদলেও (জন্‌, তেম্) ২-মাত্রাই বরাদ্দ হবে। এর অর্থ, প্রতিটি রুদ্ধদলেও ১-মাত্রা। এই হিসেবে 'কালিদাসের্'-পর্বেও ৩টি মুক্তদলের (কা, লি, দা) ৩-মাত্রা আর ১-টি রুদ্ধদলে (সের্) ১-মাত্রা—এই নিয়ে ৪-মাত্রা। দ্বিতীয় চরণেও দলের মাত্রা একই নিয়মে হবে। অতএব, এ স্তবকের প্রতিটি দলের (মুক্ত হোক, রুদ্ধ হোক) ১-মাত্রা। মাত্রা-বসানোর পর স্তবকটি হবে এইরকম—

১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	
আমি যদি	জন্‌ম নি**তেম্**	কালিদা**সের্**	কালে	= ৪+৪+৪+২

১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	
দইবে হতেম্	**দশম্ রত্‌ন**	নব**রত্‌নের্**	মালে	= ৪+৪+৪+২

পঞ্চম কাজ, প্রতি পর্বে কটি মাত্রা, প্রতি চরণে কটি পর্ব—এগুলি ঠিক ঠিক বুঝে নিয়ে প্রতি চরণের ডানদিকে পরপর অঙ্কগুলি লিখে ফেলা। ওপরে তাকিয়ে দেখুন, স্তবকটির প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব, প্রথম ৩টি পর্বে ৪টি করে মাত্রা, শেষপর্বে ২টি মাত্রা। অতএব, প্রতি চরণের ডানদিকের অঙ্কপাত ৪+৪+৪+২। লক্ষ করুন, ২টি চরণের পর্বগুলি পরপর ওপরে-নীচে সমান সমান। বেশির ভাগ স্তবকে সমান সমান পর্ব এভাবেই সাজানো থাকে (পাশাপাশি অনেকটা, ওপরের নীচে পুরোটাই)।

ষষ্ঠ বা সবশেষের কাজ, সংকেত-চিহ্নের পরিচয় জানিয়ে দেওয়া। এ পরিচয় প্রায় নির্দিষ্ট—অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।), মাত্রা (১), অথবা মাত্রা (১, ২)। যে স্তবকে প্রতিটি দল ১-মাত্রার, (যেমন, আলোচ্য স্তবকে), সেখানে মাত্রা (১) ; যে স্তবকে কোনো দল ১-মাত্রার কোনো দল ২-মাত্রার, সেখানে মাত্রা (১, ২)।

এই ৬-দফা কাজ পরপর করে গেলেই তৈরি হবে একটি স্তবকের ছন্দ-লিপি।

৩৭.৩.৩. ঃ তথ্যতালিকার ছক ঃ সরল পদ্ধতি

ছন্দলিপি তৈরির কৌশলটা জানালেন। এটা অবশ্য অভ্যাসে মনোযোগে তা আয়ত্ত করার বিষয়। এখন জেনে নিন ছন্দলিপি থেকে জরুরি তথ্য বের করে নিয়ে সেগুলি পর সাজিয়ে রাখার কৌশল। এর জন্য তৈরি করুন এমন একটি ছক, যা পূরণ এ করা যাবে মাত্রারীতি, ছন্দরীতি, পর্ব চরণ স্তবক ছন্দোবন্ধের পরিচয় দিয়ে। সব তথ্যই খুঁজে নিতে হবে ছন্দলিপি থেকে। এই ৬টি তথ্যের তালিকা তৈরির শেষে ছন্দের দিক থেকে স্তবকের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকলে তারও উল্লেখ করতে হবে।

বাংলা কবিতার ছন্দরীতি ৩-রকমের, এক-এক ছন্দরীতিতে মাত্রারীতি বা মাত্রাগোনার রীতিও এক-এক রকমের। অতএব, মাত্রারীতি থেকেই বেরিয়ে আসবে ছন্দরীতি। ৩-রীতিতেই মুক্তদলের ১-মাত্রা কিন্তু, রুদ্ধদলের ১-মাত্রা হয় দলবৃত্ত (বা শ্বাস-ঘাতপ্রধান) রীতিতে, ২-মাত্রা হয় কলাবৃত্তে (বা ধ্বনিপ্রধানে), শব্দের প্রথমে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রা আর শেষে থাকলে ২-মাত্রা হয় মিশ্রবৃত্তে (বা তানপ্রধানে)। অতএব, রুদ্ধদলের মাত্রা দেখেই বুঝে নেওয়া যাবে ছন্দরীতি। অর্থাৎ, ছন্দলিপির দিকে তাকিয়ে যদি দেখি, প্রতিটি রুদ্ধদলেই ১-মাত্রা, তবে অবশ্যই বুঝব স্তবকটির ছন্দরীতি দলবৃত্ত। যখন প্রতিটি রুদ্ধদলই ২-মাত্রার, তখন ছন্দরীতি নিঃসন্দেহে কলাবৃত্ত। আর, রুদ্ধদল শব্দের প্রথমে-মাঝখানে ১-মাত্রার শব্দশেষে ২-মাত্রার হলে ছন্দরীতি হবে মিশ্রবৃত্ত। কোন দলের কত মাত্রা, ছন্দলিপিতে দলের মাথার মাত্রাচিহ্নই তো তা জানিয়ে দিচ্ছে। বাকি সব তথ্যই জানা যাবে ছন্দলিপির দিকে তাকিয়ে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আমি যদি জন্ম নিতেম .....' স্তবকটির ছন্দলিপি আর-একবার সামনে রাখুন, লক্ষ করুন—কীভাবে তৈরি হয় তথ্য-তালিকার ছক, এরপর ছন্দলিপি থেকে পাওয়া তথ্য দিয়ে কীভাবে পূরণ করা হয় ওই ছকটি।

১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	= ৪+৪+৪+২ = ১৪
আমি	যদি	জন্ম	নিতেম্	কালিদাসের্	কালে	
১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	= ৪+৪+৪+২ = ১৪
দইবে	হতেম্	দশম্	রত্ন	নবরত্নের্	মালে	

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৪+৪+৪+২) চরণশেষে মিল (কালে-মালে)।

ছন্দোবন্ধ ঃ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার (প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে)।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. মুক্ত দল (স্বরান্ত) ৩ বটেই, এমনকী প্রতিটি রুদ্ধদলেরও (হলন্ত), এখানে হ্রস্ব উচ্চারণ।

২. অমূল্যধনের বিচারে শ্বাসাঘাত থাকবে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে, আর কোনো কোনো স্বরান্ত অক্ষরে (আ কা মা)—যে পর্বে হলন্ত অক্ষর নেই।

'আমি যদি জন্ম নিতেম. . . . . .' স্তবকটির ছন্দ-বিশ্লেষণের পুরো চেহারা এইটুকুই। এর প্রথম ভাগে ছন্দ-লিপি, দ্বিতীয় ভাগে পূরণ-করা তথ্য-তালিকা ছক। ছন্দ-বিশ্লেষণের এ পদ্ধতি প্রবোধচন্দ্র-অমূল্যধনের পদ্ধতি থেকে আলাদা, অথবা এঁদের দেখানো পথ ধরেই তৈরি-করা সবার পক্ষে ব্যবহারযোগ্য সরল একটি পদ্ধতি। তবে, প্রবোধচন্দ্রের দল-দলবৃত্ত-কলাবৃত্তি-মিশ্রবৃত্তের পাশাপাশি থাকবে অমূল্যধনের অক্ষর-শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান-তানপ্রধান। কারণ, অর্থের দিক থেকে এগুলি এক। কিন্তু, 'পঙ্‌ক্তি' থাকবে না 'চরণে'র পাশে, অর্থে একটি পরিভাষা ভিন্ন বলে। থাকলে বিভ্রান্তি তৈরি হত।

৩৭.৪ সারাংশ

ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি ঃ

ছন্দ-বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ ছন্দলিপি-নির্মাণ—কবিতার স্তবকে সংকেত-চিহ্ন জুড়ে দেওয়া। প্রবোধচন্দ্র-অমূল্যধন দুজনেই ৩-রকমের সংকেত-চিহ্ন প্রয়োগ করতেন—যতিচিহ্ন, মাত্রাচিহ্ন আর প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত-চিহ্ন। প্রবোধচন্দ্রের পঙ্‌ক্তি-শেষে যতিচিহ্ন থাকে না, পঙ্‌ক্তির মাঝখানে পর্বযতি (।) আর পদযতি (।।)। অমূল্যধনের অবশ্য চরণ-শেষে পূর্ণযতি (।।), চরণের মাঝখানে পর্ববিভাগ দেখানোর জন্য অর্ধযতি (।)। প্রবোধচন্দ্রের পর্বশেষের দল ছাড়া অন্য দলের পাশে ১-মাত্রাচিহ্ন (.), মুক্তদলের পাশে আর রুদ্ধদলের মাঝখানে ২-মাত্রাচিহ্ন (–)। অমূল্যধনের মাত্রাচিহ্ন অক্ষরের (দল) মাথায়—১-মাত্রাচিহ্ন ৩-রকমের (০,/,‿), ২-মাত্রাচিহ্নও ৩-রকমের (॥, —, ঃ)। প্রবোধচন্দ্রের প্রস্বর-চিহ্ন (/) প্রতি পর্বের প্রথম দলের মাথায়। অমূল্যধনের শ্বাসাঘাত-চিহ্ন (/) প্রতি পর্বের হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদল), না থাকলে স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদল)।

দুজনের পদ্ধতিই কমবেশি জটিল। সরল পদ্ধতি এ রকম হতে পাবে—যতিচিহ্ন কেবল পর্বশেষে (।) আর চরণ-শেষে (।।), মাত্রাচিহ্ন কেবল ১ আর ২ (দল বা অক্ষরের মাথায়), প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত-চিহ্ন থাকবে না।

ছন্দলিপি-নির্মাণের ক্রম ঃ

প্রথম কাজ, স্তবক থেকে ছেদচিহ্ন তুলে দেওয়া আর উচ্চারণ অনুসারে বানান তৈরি করে দল বা অক্ষর পর পর সাজানো। দ্বিতীয় কাজ, এক-একটি ছত্র পড়ে পড়ে থামার জায়গা খুঁজে কম-থামার জায়গায়

অর্ধযতিচিহ্ন (।) আর পুরো-থামার জায়গায় পূর্ণযতিচিহ্ন (।।) বসানো। তৃতীয় কাজ, কোনটা মুক্তদল (স্বরান্ত অক্ষর) আর কোনটা রুদ্ধদল (হলন্ত অক্ষর)—তা চিনে নেওয়া। চতুর্থ কাজ, কোন দলে (অক্ষর), কত মাত্রা তা দলের উচ্চারণ শুনে ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া এবং দলের মাথায় ১ বা ২ বসিয়ে দেওয়া। পঞ্চম কাজ, প্রতি পর্বে কত মাত্রা আর প্রতি চরণে কটি পর্ব তা প্রতি চরণের ডানদিকে (।।-চিহ্নের পাশে) লিখে ফেলা। ষষ্ঠ বা সবশেষের কাজ, সংকেত-চিহ্নের পরিচয় স্তবকের নীচে জানিয়ে দেওয়া। তৈরি হবে ছন্দলিপি।

তথ্য-তালিকার ঃ

ছন্দ-বিশ্লেষণের দ্বিতীয় ধাপ তথ্য-তালিকা তৈরি—ছক তৈরি করে ছন্দলিপি থেকে পাওয়া তথ্য দিয়ে তা পূরণ করা। এতে থাকবে মাত্রারীতি, ছন্দরীতি, পর্ব, চরণ, ছন্দোবন্ধ আর উল্লেখ করার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য—এসব নিয়ে স্তবকটির ছন্দ-পরিচয়। দলের মাথায় বসানো অঙ্ক থেকে বোঝা যাবে মাত্রারীতি। মাত্রারীতি থেকে, বিশেষ করে রুদ্ধদলের মাত্রা থেকে ধরা পড়বে ছন্দরীতি। আর, অন্য সব তথ্য জানা যাবে সরাসরি ছন্দলিপির দিকে তাকিয়ে।

ছন্দ-বিশ্লেষণের এই সরল পদ্ধতিতে থাকবে প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষা দল-দলবৃত্ত-কলাবৃত্ত-মিশ্রবৃত্তের পাশাপাশি অমূল্যধনের অক্ষর-শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান-তানপ্রধান। থাকবে না প্রবোধচন্দ্রের পদ-পঙ্‌ক্তি-পদযতি-প্রস্বর, অমূল্যধনের শ্বাসাঘাত, অথবা এমন কোনো পরিভাষার উল্লেখ—যা পদ্ধতিকে বিতর্কিত বা জটিল করে তুলতে পারে।

৩৭.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২২০ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) 'ছন্দ-বিশ্লেষণ' বলতে কী বোঝায়, লিখুন।

(খ) প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কী ধরনের সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করতেন, লিখুন এবং একই স্তবকে তা ব্যবহার করে যতটুকু সম্ভব দেখিয়ে দিন।

(গ) প্রবোধচন্দ্র তার অমূল্যধনের পদ্ধতিতে ছন্দ-বিশ্লেষণ করার অসুবিধা কী কী, বুঝিয়ে দাও।

(ঘ) সরল পদ্ধতিতে প্রবোধচন্দ্র তার অমূল্যধনের পদ্ধতি থেকে ছন্দলিপি নির্মাণের কী কী সূত্র নেওয়া হল, কী কী ছেড়ে দেওয়া হল, লিখুন।

(ঙ) সরল পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে কীভাবে এগিয়ে ছন্দ-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করা যায়, সংক্ষেপে জানান।

২. (ক) কোনটি কী চিহ্ন লিখুন (।), (-), (/), (ঃ)।

(খ) উচ্চারণ অনুসারে বানান লিখুন—

(i) দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত

(ii) জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে

(iii) অনাথ পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-নিনাদ

(গ) ছন্দরীতি কী হবে লিখুন—

(i) যখন প্রতিটি দলই ১-মাত্রার।

(ii) যখন প্রতিটি দীর্ঘ মুক্তদলই ২-মাত্রার।

(iii) যখন কেবল শব্দের শেষে থাকা রুদ্ধদল ১-মাত্রার।

(iv) যখন প্রতিটি রুদ্ধদলই ২-মাত্রার।

৩৭.৬ মূলপাঠ-২ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

স্তবক-১

১	১ ১ ১	|	১ ১	১ ১ ||	
মেঘ্	মুলুকে	|	ঝাপ্‌সা	রাতে ||	= ৪ + ৪ = ৮
১	১ ১ ১	|	১ ১ ১ ১	||	
রাম	ধনুকের্	|	আব্‌ছায়াতে	||	= ৪ + ৪ = ৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (|), পূর্ণযতি (||) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি পর্ব (৪+৪),
চরণশেষে মিল (রাতে-য়াতে)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ৮-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদলে শ্বাসাঘাত) পড়ছে।

স্তবক-২

১ ১	১ ১	|	১ ১	১ ১	|	১ ১	১ ১	|	১	||	
আতা	গাছে	|	তোতা	পাখি	|	ডালিম	গাছে	|	মউ	||	= ৪ + ৪ + ১ = ৯

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
এত ডাকি | তবু কথা | কওনা কেন | বউ || = ৪ + ৪ + ১ = ৯

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৩টি পর্ব (৪+৪+১), চরণশেষে মিল (মউ-বউ)।

স্তবক ঃ ৩-পর্বের ৯-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে), রুদ্ধদল (হলন্ত) নেই এমন পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ে।

স্তবক-৩

১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
বিষ্‌টি পড়ে | টাপুর্‌ টুপুর্‌ | নদেয়্‌ এল | **বান্‌** || = ৪ + ৪ + ৪ + ১ = ১৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ | ২ ১ ১ | ১ ||
শিব্‌ ঠাকু**রের্‌** বিয়ে | হল | **তিন্‌ কন্‌নে** | **দান্‌** || = ৪ + ৪ + ৪ + ১ = ১৩

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৪+৪+৪+১), চরণশেষে মিল (বান্‌-দান্‌)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৩-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) আর হলন্ত নেই বলে 'বিয়ে হল' পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ছে।

২. রুদ্ধদল 'তিন্‌'-এর দীর্ঘ উচ্চারণ বলে ২-মাত্রা।

স্তবক-৪

১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
যাবই আমি | যাবই ওগো | বাণিজজেতে | যাবই || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
লক্‌খীরে হা | রাবই যদি | অলক্‌খীরে | পাবই || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৪+৪+৪+২), চরণশেষে মিল (যাবই-পাবই)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার (প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে)।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ছে।

২. অর্ধযতির আঘাতে 'হারাবই' শব্দটি ভেঙেছে।

স্তবক-৫

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
ঘরেতে দু | **রন্**ত ছেলে | করে দাপা | দাপি || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
বাইরেতে **মেঘ্** | ডেকে ওঠে | **সৃষ্টি** ওঠে | কাঁপি || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪-টি পর্ব (৪+৪+৪+২), চরণশেষে মিল (দাপি-কাঁপি)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার (প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে)।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) আর হলন্ত-হীন পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ঘ, রে, দা, কে কাঁ শ্বাসাঘাত পড়ছে।

২. অর্ধযতির আঘাতে 'দুরন্ত' শব্দটি ভেঙেছে।

স্তবক-৬

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
চার্দিকে **নীল্** | সাগর্ ডাকে | **অন্ধ**কারে | শুনি || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
ওইখানেতে | আলোক্স্তম্ভ | **দাঁড়িয়ে** আছে | **ঢের্** || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
একটি দুটি | তারার্ সাথে | **তার্পরেতে** | **অনেকগুলো** | **তারা** || = ৪+৪+৪+২=১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণে ৪টি করে পর্ব (৪ + ৪ + ৪ + ২), তৃতীয় চরণে ৫টি করে পর্ব (৪ + ৪ + ৪ + ২) চরণশেষে মিল নেই।

স্তবক ঃ ২টি ৪-পর্বের ১৪-মাত্রার ১টি ৫-পর্বের ১৮ মাত্রার।

ছন্দোবন্ধ ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণে ৮ + ৬ মাত্রার অমিল ছোটো পয়ারের, তৃতীয় চরণ ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের (প্রবোধচন্দ্রের বিচারে)।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. 'ঢের' রুদ্ধদল দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রার হয়েছে।

২. অমূল্যধনের বিচারে রুদ্ধদলে শ্বাসাঘাত পড়ে। তবে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে এ রকম 'সৃজিত ভাবধর্মী দলবৃত্তে' শ্বাসাঘাত দেওয়া অনুচিত।

স্তবক-৭ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬
ভবের্ গাছে | বেঁধে দিয়ে (মা) | পাক্ দিতেছ | অবিরত ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬
(তুমি) কি দোষে ক | রিলে আমায়্ | ছটা কলুর্ | অনুগত ||

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪-টি কবে পর্ব (৪+৪+৪+৪), চরণশেষে মিল (রত-গত)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৬-মাত্রার ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে প্রতি পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে), হলন্তহীন পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ছে।

২. প্রথম চরণের দ্বিতীয় পর্বের শেষে 'মা', আর দ্বিতীয় চরণের শুরুতে 'তুমি'—এই ২টি অতিপর্ব রয়েছে।

৩. অর্ধযতির আঘাতে 'করিলে' শব্দটি ভেঙেছে।

স্তবক-৮ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ || = ৪+৪+৪+৪+২= ১৮
বন্‌ধু সবুর্ | কাঠ্‌গড়াটার | ঝাড়্‌ছ কেন | ধুলো মনের্ | ভুলে ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ || = ৪+৪+৪+৪+২ = ১৮
কাঠ্‌গড়াতে | যারা দাঁড়ায় | অশুচি তো | নয়্‌কো তারা | মূলে ||

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৫-টি করে পর্ব (৪+৪+৪+৪+২), চরণশেষে মিল (ভুলে-মূলে)।

স্তবক ঃ ৫-পর্বের ১৮-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. প্রতি পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে), রুদ্ধদল না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) অমূল্যধনের বিচারে শ্বাসাঘাত পড়ছে।

স্তবক-৯ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ || = ৪+৪+৪+৩ = ১৫
দিনের্ শেষে ঘুমের্ দেশে | ঘোম্‌টা পরা | ওই ছায়া ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ || = ৪+৪+১ = ৯
ভুলাল রে | ভুলাল মোর্ | প্রাণ ||

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ || = ৪+৪+৪+৩ = ১৫
ওপারেতে সোনার্ কূলে | আঁধার্ মূলে | কোন্ মায়া ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ || = ৪+৪+১ = ৯
গেলে গেল | কাজ্ ভাঙানো | গান্ ||

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি-তৃতীয় চরণে ৪টি করে পর্ব (৪+৪+৪+৩), চরণশেষে মিল (ছায়া-মায়া), দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে ৩টি করে পর্ব (৪+৪+১), চরণশেষে মিল (প্রাণ্-গান্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৫-মাত্রার সমিল প্রথম-তৃতীয় চরণ, আর ৩-পর্বের ৯-মাত্রার সমিল দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণ ঃ এই ৪টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে), রুদ্ধদল না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ে।

স্তবক-১০

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
আমার্ চিত্ত | আকাশ্ জুড়ে ||
= ৪ + ৪ = ৮

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
বলাকাদল্ | যাচেচ্ উড়ে ||
= ৪ + ৪ = ৮

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ||
জানি নে কোন্ | দূর্ সমুদ্র | পারে ||
= ৪+৪+২ = ১০

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
সজল্ বায়ু | উদাস ছুটে ||
= ৪ + ৪ = ৮

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
কোথায্ গিয়ে | কেঁদে উঠে ||
= ৪ + ৪ = ৮

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
পথবিহীন্ | গহন্ অন্ধ | কারে ||
= ৪+৪+২ = ৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণে ২টি করে পর্ব (৪+৪), চরণশেষে মিল (জুড়ে-উড়ে), চতুর্থ-পঞ্চম চরণে ২টি করে পর্ব (৪+৪), চরণশেষে মিল (ছুটে-উঠে), তৃতীয়-ষষ্ঠ চরণে ৩টি করে পর্ব (৪+৪+২), চরণশেষে মিল (পারে-কারে)।

স্তবক ঃ ৪টি ২-পর্বের ৮-মাত্রার, ২টি ৩-পর্বের ১০-মাত্রার—এরকম ৬টি সমিল চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে পর্বের হলন্ত অক্ষরে, হলন্ত না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে—পা, দে, কা) শ্বাসাঘাত।

৩৭.৭ মূলপাঠ-৩ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

মূলপাঠের তৃতীয় অংশে ছন্দ-বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট স্তবকগুলিকে ৩টি গুচ্ছে সাজানো হবে। এ অংশের সব স্তবকেরই ছন্দরীতি কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান। কিন্তু, মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষরের মাত্রা কলাবৃত্ত রীতির বাংলা কবিতায় সাধারণভাবে ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট থাকলেও ব্রজবুলি কবিতায় এবং এর অনুসরণের কিছু কিছু বাংলা কবিতায় তা দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রার বলে গণ্য হয়েছে। তার ফলে কলাবৃত্তের মধ্যে ২টি ভাগ তৈরি হল—আধুনিক কলাবৃত্ত আর প্রাচীন কলাবৃত্ত। এ-কারণে কলাবৃত্ত রীতির স্তবকগুলির ছন্দ-বিশ্লেষণ থাকবে ৩টি ভাগে—আধুনিক কলাবৃত্ত, প্রাচীন কলাবৃত্তঃ ব্রজবুলি কবিতায় আর প্রাচীন কলাবৃত্তঃ বাংলা কবিতায়।

৩৭.৭.১ আধুনিক কলাবৃত্ত

স্তবক-১

১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ||
নূতন্ জাগা | কুন্‌জবনে ||

১ ১ ১ ১ ১ | ২ ||
কুহরি উঠে | পিক্ || = ৫+৫+৫+২ = ১৭

১ ২ ২ | ২ ১ ১ ১ |
বসন্‌তের্ | চুম্‌বনেতে |

১ ২ ২ | ২ |
বিবশ্ দশ্ | দিক্ | = ৫+৫+৫+২ = ১৭

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৫ + ৫ + ৫ + ২), চরণশেষে মিল (পিক্-দিক্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৭-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. এক-একটি চরণের বিস্তার ঘটেছে ২টি ছত্রে।

স্তবক-২

১ ২ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ ১ ২ ||
(আমি) বিধির্ বিধান্ | ভাঙিয়াছি আমি | এমনি শক্‌তি মান্ || = ৬+৬+৬+২ = ১৫

১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ২ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ||
(মম) চরণের তলে | মরণের মার্ | খেয়ে মরে ভগ | বান্ || = ৬+৬+৬+২ = ২০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৬+৬+৬+২), চরণশেষে মিল (মান্-বান্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২০-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. প্রতি চরণের শুরুতে ১টি করে অতিপর্ব রয়েছে (আমি, মম)।

২. অর্ধযতির আঘাতে 'শক্তিমান' আর 'ভগবান' শব্দদুটি ভেঙেছে।

স্তবক-৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ২ ||
বেলা যে পড়ে এল | জল্‌কে চল্ || = ৭ + ৫ = ১২

১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ |
পুরানো সেই সুরে | কে যেন ডাকে দূরে |

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ ||
কোথা সে ছায়া সখী | কোথা সে জল || = ৭ + ৭ + ৭ + ৫ = ২৬

১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ২ ||
কোথা সে বাঁধা ঘাট্ | অশথতল্ || = ৭ + ৫ = ১২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৭-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-তৃতীয় চরণে ২টি করে পর্ব (৭+৫), দ্বিতীয় চরণে ৪টি পর্ব (৭+৭+৭+৫), চরণশেষে মিল (চল্-জল্-তল্)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১২-মাত্রার প্রথম-তৃতীয় চরণ, ৪-পর্বের ২৬-মাত্রার দ্বিতীয় চরণ—এই রকম ৩টি সমিল চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. দ্বিতীয় চরণের বিস্তার ঘটেছে ২টি ছত্রে।

স্তবক-৪

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ ||
নিম্‌নে যমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল্ || = ৮+৬ = ১৪

২ ১ ১ ২ ২ | ২ ১ ১ ২ ||
ঊর্ধ্বে পাষাণতট্ | শ্যাম্ শিলাতল্ || = ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৬), চরণশেষে (তল্-তল্)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল ২ চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ ছোটো পয়ার (৮+৬ মাত্রার) বা লঘু পয়ার।

স্তবক-৫

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ||
সমুখে অজানা পথ্ | ইঙ্গিত্ মেলে দেয় দূরে || = ৮ + ১০ = ১৮

১ ১ ২ ২ ১ ১ || ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ||
সেথা যাতরার্ কালে || যাত্রীয় পাত্রটি পুরে || = ৮ + ১০ = ১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১০-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি পর্ব (৮+১০), চরণশেষে মিল (দূরে-পূরে)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৮-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ বড়ো পয়ার (৮+১০ মাত্রার) বা মহাপয়ার।

স্তবক-৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ |
আমি পরী অপ্সরী | = ৮ + ৭ = ১৫

২ ২ ২ ১ ||
বিদ্দ্যুৎ-পর্ণা || = ৮ + ৭ = ১৫

১ ২ ১ ১ ১ ১ |
মন্দার কেশে পরি |

১ ১ ২ ২ ১ ||
পারিজাত্-করণা || = ৮ + ৭ = ১৫

১ ১ ১ ১ ১
নেমে এনু ধরণীতে

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ধূলিময় সরণীতে

১ ১ ২ ২ ১ ১
ক্ষণিকের্ ফুল্ নিতে

২ ১ ১ ২ ১
কাঞ্চ্চন বরণা = ৮ + ৮ + ৮ + ৭ = ৩১

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৭-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি-দ্বিতীয় চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৭),
তৃতীয় চরণে ৪টি পর্ব (৮+৮+৮+৭),
চরণশেষে মিল (পর্ণা-কর্ণা-বরণা)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৫-মাত্রার প্রথম-দ্বিতীয় চরণ,
৪-পর্বের ৩১-মাত্রার তৃতীয় চরণ — এই ৩টি সামিল চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণের বিস্তার ২টি করে ছত্রে, তৃতীয় চরণ রয়েছে ৪টি ছত্র জুড়ে।

৩৭.৭.২. ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ ব্রজবুলি কবিতায়

স্তবক-১

২ ১ ১ ১ | ২ ১ ২ | ১ ১ | ১ ১ ১ | ২ ১ ২ ||
তুঙ্গমণি | মন্দিরে | ঘন | বিজুরি | সঞ্চরে || = ৫+৫+৫+৫ = ২০

২ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ | ২ ২ ||
মেঘরুচি | বসন | পরি | ধানা || = ৫+৫+৪ = ১৯

১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ২ | ২ ১ | ১ ১ | ২ ১ ২ ||
যত যুবতী | মন্ডলী | পন্থ | মাঝে | পেখলি || = ৫+৫+৫+৫ = ২০

২ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ | ১ | ২ ২ ||
কোইনহ | রাইক | স | মানা || = ৫+৫+৫+৪ = ১৯

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে বা হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-তৃতীয় চরণে ৪টি করে পর্ব (৫+৫+৫+৫), চরণ শেষে মিল নেই ; দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে ৩টি করে পর্ব (৫+৫+৪), চরণ শেষে মিল (ধান-মানা)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২০-মাত্রার অমিল প্রথম-তৃতীয় চরণ, আর ৩-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণ—এই ৪টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. তৃতীয় চরণে 'তী' 'মা' 'ঝে'—এই ৩টি মুক্তদল বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, 'লি' মুক্তদল বানানে হ্রস্ব হয়েও উচ্চারণে দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার।

২. চতুর্থ চরণে 'সমানা' শব্দটি অর্ধযতির আঘাতে ভেঙেছে।

স্তবক-২

১ ১ ২ ১ ১	১ ১ ২ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ২ ‖	
স্ফুট চম্পক	দলনিন্দিত	উজ্জ্বল তনু	শোভা ‖	= ৬+৬+৬+৪ = ২২
১ ১ ২ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ২ ‖	
পদ পঙ্কজে	নূপুর বাজে	শেখর মনো	লোভা ‖	= ৬+৬+৬+৪ = ২২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে বা হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে বা দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৬+৬+৬+৪), চরণশেষে মিল (শোভা-লোভা)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২২-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. দ্বিতীয় চরণে 'জে' 'বা' 'জে' 'নো'—এই ৪টি মুক্তদল বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার।

২. 'মনোলোভা'-শব্দটি অর্ধযতির আঘাতে ভেঙেছে।

স্তবক-৩

১ ১ ১ ১ ১১১	২১ ২১১	১ ১ ১	২ ১ ১	১১১১	‖	
গগনে অবঘন	মেহ দারুন	সঘনে	দামিনী	চমকই	‖	= ৭+৭+৭+৪ = ২৫
১১১ ২১১	১১১ ১১১১	১১১	১১১১	১১১১	‖	
কুলিশ পাতন	শবদ ঝনঝন	পবন	খরতর	বলগই	‖	= ৭+৭+৭+৪ = ২৫

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে বা দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৭-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৭+৭+৭+৪), চরণশেষে মিল (কই-গই)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২৫-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. প্রথম চরণে 'গগনে'-র 'নে' আর 'সঘনে'-র 'নে'—এই ২টি মুক্তদল বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার।

২. রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর নেই।

স্তবক-৪

২ ১ ১ ২ ১ ১	১ ১ ১ ১ ২ ১	‖	
মন্‌দির বাহির	কঠিন কপাট	‖	= ৮ + ৭ = ১৫
১ ১ ১ ১ ২ ১ ১	২ ১ ১ ২ ১	‖	
চলইতে শঙ্‌কিল	পঙ্‌কিল বাট	‖	= ৮ + ৭ = ১৫

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে বা দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরে ২-মাত্রা। রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৭-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২ পর্ব (৮+৭), চরণশেষে মিল (পাট-বাট)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৫-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

৩৭.৭.৩. প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ আধুনিক বাংলা কবিতায়

স্তবক-১

২ ১ ২ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ১ ‖	
দেশ দেশ	নন্‌দিত করি	মন্‌দ্রিত তব	ভেরী ‖	= ৬+৬+৬+৩ = ২১

২ ১ ১ ১ ১	২ ১ ২ ১	২ ১ ১	১ ১	২ ১ ‖	
আসিল যত	বীরবৃন্‌দ	আসন	তব	ঘেরি ‖	= ৬+৬+৬+৩ = ২১

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৩-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৬+৬+৬+৩), চরণশেষে মিল (ভেরী-ঘেরি)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২১-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ
১. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দরীতির প্রয়োগ ঘটেছে।
২. প্রথম চরণের ‘ভেরী’ শব্দের ‘রী’ বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব, তাই ১-মাত্রার।

স্তবক-২

১ ১ ১ ২ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১ ১ ১	২ ‖	
রে সতি রে সতি	কাঁদিল পশুপতি	পাগল শিব প্রম	থেশ্‌ ‖	= ৮+৮+৮+২ = ২৬

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১ ২	১ ১ ২ ১ ১ ১ ১	২ ‖	
যোগ মগন হর	তাপস যতদিন্‌	ততদিন্‌ নাহি ছিল	ক্লেশ্‌ ‖	= ৮+৮+৮+২ = ২৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৮+৮+৮+২), চরণশেষে মিল (থেশ্‌-ক্লেশ্‌)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২৬-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দরীতির প্রয়োগ ঘটেছে।

স্তবক-৩	২ ১	২ ১ ১ ১	|	২ ১	১ ১ ১	১ ১ ‖	
	নীল	সিন্‌ধুজল	|	ধৌত	চরণ	তল ‖	= ৮+৮ = ১৬
	১ ১ ১	১ ২ ১ ১	|	২ ১ ১	২ ১ ১ ‖		
	অনিল	বিকম্‌পিত	|	শ্যামল	অন্‌চল ‖		= ৮+৮ = ১৬
	২ ১ ১	২ ১ ১	‖	২ ১	১ ২ ১ ১ ‖		
	অম্‌বর	চুম্‌বিত	‖	ভাল	হিমাচল ‖		= ৮+৮ = ১৬
	২ ১	১ ১ ১	১ ১	|	১ ১ ‖		
	শুভ্‌র	তুষার	কিরী	|	টিনী ‖		= ৮+৮ = ১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (|), পূর্ণযতি (||) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পর্বে ২টি করে (৮+৮), চরণশেষে মিল (তল-চল-চল) চতুর্থ পর্বে ২-পর্ব (৮+২)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৬-মাত্রার সমিল ৩টি চরণ, আর ২-পর্বের ১০-মাত্রার ১টি চরণ—এইরকম ৪টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. চতুর্থ চরণে 'ষা' 'রী' 'নী' বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার।

২. চতুর্থ চরণে 'কিরীটিনী' শব্দটি অর্ধযতির আঘাতে ভেঙেছে।

৩. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্তের প্রয়োগ ঘটেছে।

স্তবক-৪	২ ২	২ ২	|	২ ১ ১	২ ২	‖	
	ঝর্‌না	ঝর্‌ণা	|	সুন্‌দরী	ঝর্‌ণা	‖	= ৮ + ৮ = ১৬
	১ ১ ১ ১	২ ১ ১	|	২ ১ ১	২ ২	‖	
	তরলিত	চন্‌দ্রিকা	|	চন্‌দন	বর্‌ণা	‖	= ৮ + ৮ = ১৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে (হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, প্রতিটি পর্বই পূর্ণপর্ব।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৮), চরণ শেষে মিল (ঝর্ণা-বর্ণা)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৬-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের প্রয়োগ।

২. প্রথম চরণে 'রী' আর দ্বিতীয় চরণে 'কা'—এই ২টি মুক্তদলের হ্রস্ব উচ্চারণ।

৩৭.৮ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

স্তবক-৯

১ ২ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ |
ঘরের্ বাহিরে | দণ্ডে শতবার্ |

১ ১ ১ ১ ১ ২ ||
তিলে তিলে আইসে যায়্ || = ৬+৬+৮ = ২০

২ ১ ১১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
মন্ উচাটন | নিশ্শাস্ সঘন ||

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ||
কদম্ব কাননে চায়্ || = ৬+৬+৮= ২০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অতিপূর্ণ পর্বে ৮-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৩টি করে পর্ব (৬+৬+৮), চরণ শেষে মিল (যায়্-চায়্)।

স্তবক ঃ ৩-পর্বে ২০-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

স্তবক-২

১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ||
চিরসুখী জন্ | ভ্রমে কি কখন্ | ব্যথিত বেদন্ | বুঝিতে পারে || = ৬+৬+৬+৫ = ২৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ||
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে | কভু আশীবিষে | দংশেনি যারে || =৬+৬+৬+৫= ২৩

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ('দং') ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ('জন্' 'খন্' 'দন্') ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৬+৬+৬+৫), চরণশেষে মিল (যারে-পারে্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২৩-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ শব্দের শুরুতে-থাকা একমাত্র রুদ্ধদল 'দং'-এর হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, সেই কারণেই স্তবকটির ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান হয়েছে। 'দং'-এর দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা হলে, ছন্দরীতি হত কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান, তখন 'দংশেনি যারে' পর্বটি হত ৬-মাত্রার। কিন্তু, 'বুঝিতে পারে ৫-মাত্রায় নির্দিষ্ট, অতএব সেক্ষেত্রে ছন্দ-পতন হত।

স্তবক-৩

১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১	১ ১ ১	‖	
পুণ্ণ	পাপে	সুখে	দুক্খে	পতনে	উত্থানে	‖	= ৮ + ৬ = ১৪
১ ২	১ ১ ১		২	১ ২	১ ১ ১	‖	
মানুষ্	হইতে		দাও	তোমার্	সন্তানে	‖	= ৮ + ৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দ শেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৬), চরণশেষে মিল (থানে-তানে)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৪-মাত্রার ছোটো পয়ার বা লঘু পয়ার

বৈশিষ্ট্য ঃ দ্বিতীয় চরণে 'হইতে' ৩-টি মুক্তদলে (হ-ই-তে) ভাগ করে হচ্ছে।

স্তবক-৪

১ ১ ১ ১	১ ১ ২	১ ১ ১	১ ১ ১	‖
'এতক্খনে'—	অরিন্দম্	কহিলা	বিষাদে—	‖ = ৮+৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
'জানিনু কেমনে আসি | লক্‌খণ্‌ পশিল || = ৮+৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ||
রক্‌খঃপুরে ! হায়্‌, তাত, | উচিত্‌ কি তব || = ৮+৬ = ১৫

১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
এ কাজ্‌, নিকষা সতী | তোমার্‌ জননী, || = ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (॥) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্ব ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৬), চরণশেষে মিল নেই।

স্তবক ঃ ২-পর্বে ১৪-মাত্রার অমিল ৪টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ অমিল প্রবহমান ছোটো পয়ার বা অমিত্রাক্ষর।

বৈশিষ্ট্য ঃ প্রথম-চতুর্থ চরণে অর্ধযতির সঙ্গে আর দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণে পূর্ণযতির সঙ্গে ছেদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। অর্থাৎ, ভাব এ স্তবকে প্রবহমান।

স্তবক-৫

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
স্বপনে ভ্রমিনু আমি | গহন্‌ কাননে || = ৮ + ৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ২ ২ ||
একাকী দেখিনু দূরে | যুব এক্‌ জন্‌ || = ৮ + ৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ২ ১ ২ ||
দাঁড়ায়ে তাহার্‌ কাছে | প্রাচীন্‌ ব্রাম্‌মন্‌ || = ৮ + ৬ = ১৪

২ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ||
দ্রোণ যেন ভয়্‌ শূন্‌ন | কুরুক্‌খেত্‌র রনে || = ৮ + ৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (॥) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৬), প্রথম-চতুর্থ চরণে মিল (ননে-রণে), দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণে মিল (জন্-মন্)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল ৪টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ মূলত ৮+৬ মাত্রার ছোট পয়ার। তবে, চরণশেষে মিলের ছক কখখক (নে-অন্-অন্-নে) এটি পেত্রার্কীয় বা ফরাসি চতুর্দশপদীর অষ্টকের প্রথম বা দ্বিতীয় অংশের মিলের ছক। অতএব, স্তবকটি চতুর্দশপদী-বন্ধের একটি কবিতার অংশ হতে পারে।

স্তবক-৬

১ ১১ ১১১ ২ | ১১১১ ১১ ১১১১ ||
যে নদী হারায়ে যায় | অন্ধকারে রাতে নিরুদ্দেশে || = ৮ + ১০ = ১৮

১২ ১২ ২ | ১১ ১১ ১২ ১২ ||
তাহার্ চন্চল্ জল্ | স্তব্ধ হয়ে কাঁপায় হৃদয় || = ৮ + ১০ = ১৮

১ ২ ১১১ ২ | ১২ ১১১ ১১ ২ ||
যে মুখ মিলায়ে যায় | আবার্ ফিরিতে তারে হয় || = ৮ + ১০ = ১৮

১১১ ১২১১ | ১১২ ১২ ১২ ||
গোপনে চোখের্পরে | ব্যথিতের্ স্বপনের্ মতন্ || = ৮ + ১০ = ১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১০-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+১০), দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণশেষে মিল (দয়্-হয়)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৮-মাত্রার অমিল প্রথম-চতুর্থ চরণ আর সমিল দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণ—এই ৪টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার।

স্তবক-৭

১ ১ ২ ২ ২ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ||
পৃথিবীর সব্ রঙ্ | নিভে গেলে | পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন্ || = ৮+৮+৬ = ২২

১ ২ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ||
তখন্ গল্পের তরে | জোনাকির্ রঙে ঝিল্‌মিল্ || = ৮+১০ = ১৮

২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ | ১ ১ ২ ২ ২ ২ ||
সব্ পাখি ঘরে আসে সব্ নদী ফুরায় এ | জীবনের সব্ লেন্ দেন্ || = ৮+৮+১০ = ২৬

১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
থাকে শুধু অন্‌ধকার | মুখোমুখি বসিবার্ | বনলতা সেন্ || = ৮+৮+৬ = ২২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদল (হলন্ত অক্ষর) শব্দের প্রথমে ১-মাত্রা, শব্দের শেষে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রার, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রার, অতিপূর্ণপূর্ব ১০-মাত্রার।

চরণ ঃ প্রথম-চতুর্থ চরণে ৩টি করে পর্ব (৮+৮+৬), দ্বিতীয় চরণে ২টি পর্ব (৮+১০), তৃতীয় চরণে ৩টি পর্ব (৮+৮+১০) ; প্রথম-দ্বিতীয় চরণে মিল নেই, তৃতীয়-চতুর্থ চরণ শেষে মিল (দেন্-সেন্)।

স্তবক ঃ ৩-পর্বে ২২-মাত্রার প্রথম-চতুর্থ চরণ, ২-পর্বে ১৮-মাত্রার দ্বিতীয় চরণ, ৩-পর্বে ২৬-মাত্রার তৃতীয় চরণ, অমিল প্রথম-দ্বিতীয় চরণ, সমিল তৃতীয়-চতুর্থ চরণ—এরকম ৪টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ দ্বিতীয় চরণ ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার।

বৈশিষ্ট্য ঃ দ্বিতীয় চরণে 'ঝল্‌মিল' শব্দটিকে ভেঙে দু-ভাগ উচ্চারণ করা হচ্ছে (ঝিল্ মিল্)। তারফলে 'ঝিল্' রুদ্ধদলটি শব্দের শুরুতে থেকেও ২-মাত্রা পাচ্ছে।

স্তবক-৮

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ |
আকাশে অসংখ্য তারা |

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ |
চিন্‌তাহারা ক্লান্‌তিহারা |

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ |
হৃদয় বিস্‌সয়ে সারা |

১ ১ ২ ১ ১ ||
হেরি এক্ দিধি || = ৮+৮+৮+৬ = ৩০

২ ১ ১১ ১ ১১ |
আর্ যে আসে না আসে |

১১ ২ ১১১১ |
মুক্ত এই মহাকাশে |

১১ ১১ ১১১১ |
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে |

১১ ২ ১১ ||
অসীমের্ চিঠি || = ৮ + ৮ + ৮ + ৬ = ৩০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, শব্দের শেষে রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৮+৮+৮+৬), চরণশেষে মিল (দিঠি-চিঠি)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ৩০-মাত্রার ২টি সমিল চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ একটিমাত্র পর্ব নিয়ে এক-একটি ছত্র, ৪-পর্বের এক-একটি চরণের বিস্তার ঘটেছে ৪টি ছত্রে।

৩৭.৯ অনুশীলনী—২

(প্রতিটি স্তবকের ছন্দ-বিশ্লেষণ করার পর ২২২ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে ছন্দরীতির নাম মিলিয়ে দেখুন। ছন্দরীতি মিলে গেলে মূলপাঠ-৪ এর একই ছন্দরীতির স্তবকের ছন্দ-বিশ্লেষণ পাশে রেখে ছন্দলিপি আর প্রতিটি তথ্য পরপর মিলিয়ে নিন।)

ছন্দ-বিশ্লেষণ করুন—

১. ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

২. "এ গোঁফ যদি আমার বলিস্ করবো তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।"

৩. আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে।

৪. কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীবর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

৫. সকলের ছোটো বন চলে যায় ছোটো ছোটো হাতে
কমলালেবুর গুচ্ছ নিয়ে। আমি আধখানা বই
কোলের উপর রেখে ঈক্ষণ করেছি জানালাতে।
এখন আমার জ্বর কমে গিয়ে সাতানব্বই।

৬. নীরবে দেখাও আঙ্গুলি তুমি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে,
কী আছে হোথায় চলেছি কিসের অন্বেষণে।

৭. তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি,
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।
দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তোমার তৃষাকাতর আপন আঁখি।

৮. মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁয় অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

৯. ঠাকুরমার দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে।
ভাবখানা মনে আছে—বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আমকাঁঠালের ছায়ে ;
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণ-চক্র পায়ে।

১০. ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥

১১. পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে !
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

১২. দুয়ার জুড়ে কাঙাল-বেশে
ছায়ার মতো চরণ-দেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

১৩. আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

১৪. তাই আজ শুনতেছি তরুর মর্মরে
এক ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
শুষ্ক পত্র লয়ে। বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশত্থের তলে।

১৫. ছিঁচ্‌কাঁদুনে মিচ্‌কে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে,
ঘ্যাঁঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানে আর প্যানপ্যানে—
কুঁকিয়ে কাঁদে ক্ষিদের সময়, ফুঁপিয়ে কাঁদে ধম্‌কালে,
কিম্বা হঠাৎ লাগলে ব্যথা, কিম্বা ভয়ে চম্‌কালে ;

১৬. ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সম সুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে ভাবি ভুলিবার নয়,
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু ওঠে দুঃখেরি জয়।

১৭. দিনান্তের চিতাবহ্নি নিবিল আকাশপটে ; উন্মুক্ত চিকুরে
মূর্ছিয়াছে সন্ধ্যাসতী। ধীরে ধীরে শব্দহীন ওষ্ঠ দুটি স্ফুরে।

১৮. খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার ;
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুঝে খায় সে।

১৯. আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।
আমি নাই-বা গেলাম বিলাত,
নাই-বা পেলাম রাজার খিলাত—
যদি পরজন্মে পাইরে হতে ব্রজের রাখাল-বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক॥

২০. অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইকো রুচি।
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।

২১. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা,
সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা।
দিনের কল্লোল 'পর
টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

২২. তোমার মাপে হয় নি সবাই, তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মরো কারও ঠেলায়, কেউ বা মরে তোমার চাপে।
তবু ভেবে দেখতে গেলে এমনি কিসের টানাটানি।
তেমন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।

২৩. 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

২৪. কিংশুক কুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিনী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গিতে,
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

২৫. শ্যামশুকপাখি সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরিল নয়নফাঁদে।
হৃদয়পঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকলে বেঁধে॥

২৬. তাই তো বলি, এত যে গীত বাঁধলেন,
আপনাদেরই গোপন সে গান।
আমরা দেখুন বেঁচে থেকেই সুখে আছি ;
আমাদের আর কেন শোনান !

২৭. কুল মরিয়াদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঙে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা।

২৮. তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন ওরে আমার শুয়াপাখি,
আমি অন্তরে থেকে আমারে দিতেছ ফাঁকি।

২৯. ওই সিন্ধুর টিপ সিংহলদ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গোর বাস, তাম্বুল-বন কেশ!
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিঃশ্বাস!
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস!

৩০. বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু

৩৭.১০ গ্রন্থ-নির্দেশ

১. প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা—পৃ-২, ৩, ৭, ৯-২৪, ২৯, ৩০, ৩২, ৭৮-৮০, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০১, ৯০-১৬৪, ২৮৬-৮৮।

২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—পৃ- ১১৯-২৭।

৩. পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ — পৃ-১৬৪-৭৮।

৩৭.১১ উত্তর-সংকেত

[এই পর্যায়ের ৪টি এককে ছড়ানো মোট ৯টি অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নাবলির উত্তর-সংকেত পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্য রাখবেন, এর মধ্যে বেশির ভাগই (বিশেষ করে বড়ো আর মাঝারি মাপের প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে) কেবল সংকেত, পুরো প্রশ্নোত্তর অবশ্যই নয়। মূলপাঠের কোন অংশে আপনার তৈরি-করা উত্তর মিলিয়ে দেখবেন, পৃষ্ঠার উল্লেখ করে সরাসরি তার হদিস দেবে এই সংকেতগুলি। বিষয়মুখী প্রশ্নের (objective type) পুরো উত্তর অবশ্য সংকেত থেকেই পাবেন। সেই কারণে তার পাশে মূলপাঠের পৃষ্ঠার উল্লেখ থাকবে না।]

৩৪.৫ অনুশীলনী—১

১. (ক) **ছন্দ** ঃ কথার উচ্চারণ আর বিরামের বিশেষ শৃঙ্খলায় ঘুরে ঘুরে আসা (১.৩.১ ছন্দ/পৃ-)।
দল ঃ একবারের চেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনি (১.৩.৩ অক্ষর, দল/পৃ.)
মাত্রা ঃ দল-উচ্চারণের মাপ। (১.৩.৪ মাত্রা, কলা/পৃ-)

(খ) **বর্ণ আর ধ্বনি** ঃ বর্ণ লেখায় ব্যবহারের চিহ্ন, ধ্বনি ওই বর্ণের উচ্চারিত রূপ। (১.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি/পৃ)
মাত্রা আর কলা ঃ মাত্রা দল-উচ্চারণের কালপরিমাণ, কলা দলের ধ্বনিপরিমাণ। (১.৩.৪ মাত্রা, কলা/পৃ)
ছেদ আর যতি ঃ ছেদ অর্থ-বোঝা আর দম-রাখার জন্য অনিয়মিত থামা, যতি ছন্দের তালে তালে নিয়মিত থামা। (১.৩.৫ ছেদ, যতি/পৃ-)

২. (ক) বর্ণের ৪টি শ্রেণি—মুক্তস্বরবর্ণ, খণ্ডস্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ।
ধ্বনিরও ৪টি শ্রেণি—মুক্তস্বরধ্বনি, খণ্ডস্বরধ্বনি, রুদ্ধস্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি। (১.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি/পৃ)

(খ) বর্ণের ২টি শ্রেণি—স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ।
ধ্বনিরও ২টি শ্রেণি—স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ; স্বরধ্বনির ২টি ভাগ—মৌলিক, যৌগিক, (১.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি/পৃ)

(গ) প্রবোধচন্দ্র—মুক্তদল, রুদ্ধদল।
অমূল্যধন—স্বরান্ত অক্ষর, হলন্ত অক্ষর। (১.৩.৩ অক্ষর, দল/পৃ-)

৩. (ক) মুক্তদল, রুদ্ধদল, মুক্তস্বর, রুদ্ধস্বর।

(খ)
(i) ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বাদ্-লা হাও-য়ায় ম-নে প-ড়ে ছে-লে-বেলার্ গান্

(ii) ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২
সান্-ধ্য ব-সুন্-ধ-রা তন্-দ্রা হা-রায়্

(iii) ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২
ঝর্-ণা ঝর্-ণা সুন্-দ-রী ঝর্-না

(iv) ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
বৈ-রাগ্-গ্য সা-ধ-নে মুক্-তি সে আ-মার্ নয়্

(গ) (i) কন্টক গাড়ি ক । মল সম পদ তল।
মঞ্জীর চীর হি। ঝাঁপি॥

(ii) আমরা দুজনা । স্বর্গ-খেলনা । গড়িব না ধরণীতে॥
মুগ্ধ ললিত । অশ্রুগলিত ॥ গীতে

(iii) হাজার বছর ধরে । আমি পথ হাঁটিতেছি। পৃথিবীর পথে॥

(iv) যমুনাবতী। সরস্বতী। কাল যমুনার। বিয়ে॥

(ঘ) (i) বর্ণ, ধ্বনি।

(ii) অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, দলের ধ্বনিপরিমাণ।

(iii) হ্রস্ব দলের।

(iv) যতির।

(v) ছেদ।

৩৪.৮ অনুশীলনী—২

১. (ক) **পর্ব ঃ** পরপর ২টি যতির (অর্ধযতি বা পর্বযতি পূর্ণযতি) মাঝখানে-থাকা ছত্রখণ্ড (১.৬.১ পর্ব, পদ/পৃ)।

চরণ ঃ পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগ। (১.৬.৩ চরণ, পঙ্‌ক্তি/পৃ-)

স্তবক ঃ মাত্রাসংখ্যার শৃঙ্খলার বাঁধা পরপর কয়েকটি চরণের গুচ্ছ। (১.৬.৪ স্তবক, শ্লোক/পৃ-)

(খ) **পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব ঃ** পূর্বাঙ্গ অমূল্যধনের পর্বের ভাগ, উপপর্ব প্রবোধচন্দ্রের পর্বের ভাগ। দুজনের পর্ব যেখানে ছোটোবড়ো, পর্বাঙ্গ-উপপর্বও সেখানে ছোটোবড়ো (১.৬.২ পূর্বাঙ্গ, উপপর্ব/পৃ)

পর্ব আর পদ ঃ পর্ব পর্বযতি দিয়ে তৈরি ছত্রখণ্ড, পদ পদযতি দিয়ে তৈরি ছত্রখণ্ড। পদ সবসময়ই প্রবোধচন্দ্রের পর্বের চেয়ে বড়ো মাপের, অমূল্যধনের পর্ব যেখানে প্রবোধচন্দ্রের পর্বের সমান, সেখানে পদ তাঁর পর্বের চেয়েও বড়ো। (১.৬.১ পর্ব, পদ/পৃ)

চরণ আর পঙ্‌ক্তি ঃ কোনো কোনো ছত্রের শেষে অমূল্যধন পূর্ণযতি মানলেও প্রবোধচন্দ্রর মানেন না। ফলে, সেই পদ্যাংশে অমূল্যধনের চরণের তুলনায় প্রবোধচন্দ্রের পঙ্‌ক্তি মাপে বড়ো হয়ে যায়। (১.৬.৩ পর্ব, পদ/পৃ)

(গ) **অর্ধযতি ঃ** অমূল্যধনের অর্ধযতি ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে, চিহ্ন (।), প্রবোধচন্দ্রের অর্ধযতি (বা পদযতি) ছত্রকে পদে পদে ভাগ করে, চিহ্ন (।।)। এই দু-ধরনের অর্ধযতি মিলে যায় কেবল একটি জায়গায়, যেখানে অমূল্যধনের পর্ব আর প্রবোধচন্দ্রের পদ মাপে সমান। (১.৬.১ পর্ব পদ/পৃ)

পূর্ণযতি ঃ দুজনের কাছেই এর অর্থ পুরো থামা, এর কাজ পদ্যের সবচেয়ে বড়ো ছন্দ-বিভাগ দেখানো। প্রবোধচন্দ্রের সব পূর্ণযতি অমূল্যধনের কাছেও পূর্ণযতি। কিন্তু, অমূল্যধনের কোনো কোনো পূর্ণযতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে পদযতি। (১.৬.৩ চরণ, পঙ্‌ক্তি/পৃ)

পর্ব ঃ দলবৃত্তে (শ্বাসাঘাতপ্রধান), ৪-মাত্রার, কলাবৃত্তে (ধ্বনিপ্রধান) ৫, ৬, ৭-মাত্রার, মিশ্রবৃত্তে (তানপ্রধান) ৬-মাত্রার, পূর্ণপর্ব অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের কাছে এক। কিন্তু, অমূল্যধনের ৮-মাত্রার পর্ব (কলাবৃত্তে, মিশ্রবৃত্তে) প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৪+৪ মাত্রার ২টি পর্ব, অমূল্যধনের ১০ মাত্রার (মিশ্রবৃত্তে) প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৪ + ৪ + ২ মাত্রার ৩টি পর্ব। (দৃষ্টান্ত দিন)

স্তবক ঃ অমূল্যধনের মতে স্তবকের চরণ-সংখ্যা ২ থেকে ৮, বা তার বেশি। প্রবোধচন্দ্রের মতে স্তবকের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৫ বা তার বেশি। পঙ্‌ক্তি হয় চরণের সমান, না-হয় চরণের চেয়ে বড়ো। অতএব, প্রবোধচন্দ্রের যে-কোনো স্তবক অমূল্যধনের কাছেও স্তবক হিসেবে গণ্য, কিন্তু, অমূল্যধনের ছোটো আয়তনের স্তবক (২ থেকে ৪-চরণের স্তবক তো বটেই) প্রবোধচন্দ্রের কাছে স্তবক বলে গণ্য নয় (শ্লোক)। (১.৬.৪ স্তবক, শ্লোক/পৃ)

২. (ক)

(i) ২ ২ : ২ ১ ১ | ২ ১ : ১ ২ ||
আম্‌রের্ : মন্ জরী | গন্ধ : বিলায়্ || = (৪ + ৪) + (৩ + ৩)

(ii) ২ ২ | ২ ১ ১ || ২ ১ ১ ২
আম্ : রের্ | মন্ : জরী || গন্ধ : বিলায়্ = (৪ + ৪) + (৩ + ৩)

(iii) অমূল্যধনের পর্ব আর প্রবোধচন্দ্রের পদ সমান মাপের (৮, ৬) ; অমূল্যধনের প্রথম-দ্বিতীয় পর্বাঙ্গ আর প্রবোধচন্দ্রের প্রথম-দ্বিতীয় পর্ব সমান মাপের (৪-মাত্রার) ; অমূল্যধনের তৃতীয়-চতুর্থ পর্বাঙ্গ আর প্রবোধচন্দ্রের দ্বিতীয় পদের অন্তর্গত ২টি উপপর্ব সমান মাপের (৩-মাত্রার) ; পুরো ছত্রটি অমূল্যধনের চরণ এবং প্রবোধচন্দ্রের পঙ্‌ক্তি (১৪-মাত্রার)।

(খ) (i) ওপরের ছন্দ-বিভাগদুটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(ii) অমূল্যধনের পর্ব আর প্রবোধচন্দ্রের পর্ব সমান (৬-মাত্রা), পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সমান (৩-মাত্রা, ২-মাত্রা), চরণ আর পদ সমান (১১-মাত্রা), পঙ্‌ক্তি অনেক বড়ো (১১+১১+১১+৮)।

(iii) অমূল্যধনের পর্ব আর প্রবোধচন্দ্রের পদ সমান মাপের (৮, ৬) ; অমূল্যধনের প্রথম-দ্বিতীয় পর্বাঙ্গ আর প্রবোধচন্দ্রের প্রথম-দ্বিতীয় পর্ব সমান মাপের (৪-মাত্রার) ; অমূল্যধনের তৃতীয়-চতুর্থ পর্বাঙ্গ আর প্রবোধচন্দ্রে দ্বিতীয় পদের অন্তর্গত ২টি উপপর্ব সমান মাপের (৩-মাত্রার) ; পুরো ছত্রটি অমূল্যধনের চরণ এবং প্রবোধচন্দ্রে পঙ্‌ক্তি (১৪-মাত্রার)।

(গ)

(i) ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
আমি হব না ভাই | নববঙ্গে | নবযুগের্ | চালক্ || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

অতিপর্ব—আমি, অপূর্ণপর্ব—চালক্ (২-মাত্রার)।

(একই ভাবে বাকি ২টি দৃষ্টান্ত মিলিয়ে নিন।)

৩. (ক) i) যতি ; ii) পর্ব, অর্ধযতি, iii) পর্ব, পর্বযতি ; iv) চরণ পূর্ণযতি ; v) পদ, পদযতি ; vi) (ঃ) (ঃ)। vii) স্তবক, শ্লোক (চতুষ্ক) ; viii) ২ থেকে ৮টি, কমপক্ষ ৫টি ;

(খ) অমূল্যধনের পর্বে যতি পড়ে না, প্রবোধচন্দ্রের পর্বে যতি পড়ে, ছন্দ-বিভাগের নাম উপপর্ব।

৩৪.১১ অনুশীলনী—৩

১. (ক) **তান ঃ** ধ্বনির সঙ্গে মিশে-থাকা অথবা ধ্বনিকে ছাপিয়ে ওঠা টানা সুর। (১.৯.৩ তান, মিল/পৃ)।

মিল ঃ একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের ফিরে ফিরে আসা। (১.৯.৩ তান, মিল/পৃ-)

(খ) **শ্বাসাঘাত আর প্রস্বর ঃ** 'শ্বাসাঘাত' পড়ে বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকে—প্রতি পর্বের হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদলে), হলন্ত অক্ষর না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে)। কিন্তু, প্রস্বর পড়ে যেকোনো কবিতার স্তবকে—প্রতি পর্বের প্রথম দলে (অক্ষরে)। (১.৯.২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর/পৃ)

সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ঃ রুদ্ধদলের উচ্চারণে সংকোচনের নাম সংশ্লেষ, প্রসারণের নাম বিশ্লেষ।
(১.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ/পৃ)

২. ১.৯.৩ তান, মিল/পৃ-তে দেওয়া দৃষ্টান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৩. (ক)

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ||
i) এ পার্ গঙ্ গা | ওপার গঙ্গা | মধ্যিখানে চর্ ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
তারি মধ্ধ্যে | বসে আছেন্ | শিবু সদা | গর্ ||

ii), iii), iv) একই পদ্ধতিতে করা হল কিনা দেখুন প্রতি পর্বের হলন্ত অক্ষরে, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে/চিহ্ন

(খ)

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ||
i) কোথায় ফলে | সোনার্ ফসল্ | সোনার্ কমল্ | ফোটে রে ||

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ | ২ ১ ১ ২ ১ ১ ||
ii) সমুখে অজানা পথ্ | ইঙ্গিত্ মেলে দেয়্ দূরে ||

১ ২ ২ ১ | ১ ১ ১ ২ ১ | ১ ১ ২ ২ | ১ ১ ||
iii) রাজার্ হস্ত | করে সমম্ত | কাঙালের্ ধন্ | চুরি ||

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ||
হে আদিজননী সিন্ধু | বসুন্ধা সন্তান্ তোমার ||

৩৫.৫ অনুশীলনী—৩

১. (ক) **দলবৃত্ত ঃ** যে-রীতির ছন্দের প্রতি দলে ১-মাত্রা (মুক্ত রুদ্ধ যাই-ই হোক)।
(২.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান/পৃ-)

কলাবৃত্ত ঃ যে-রীতির ছন্দে কলা-ই মাত্রা (মুক্তদল ১-কলায় ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-কলায় ২-কলায় ২-মাত্রা) (২.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান/পৃ-)

মিশ্রবৃত্ত ঃ যে-রীতির ছন্দে দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত—দুই স্বভাবের মিশ্রণ ঘটে (মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ও ২-মাত্রা)। (২.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান/পৃ)

(খ) **শ্বাসাঘাতপ্রধান ঃ** প্রতিপর্বে শ্বাসাঘাত থাকে বলে। (২.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান/পৃ)

ধ্বনিপ্রধান ঃ অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান এবং ধ্বনির হিসেব নির্দিষ্ট বলে।

(২.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান/পৃ)

তানপ্রধান ঃ সুরের টান বা তান-ই বিশেষ লক্ষণ বলে। (২.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান/পৃ)

১. (ক) **দলবৃত্ত ঃ** মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

আধুনিক কলাবৃত্ত ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

মিশ্রবৃত্ত ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে-থাকা

রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

(খ) i) ছন্দরীতি—আধুনিক কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান (২.৩.২ কলাবৃত্ত বা /ধ্বনিপ্রধান—পৃষ্ঠায় দেওয়া) দৃষ্টান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিন)।

ii) ছন্দরীতি—দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধা (২.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান পৃষ্ঠায় দেওয়া দৃষ্টান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিন)।

iii) ছন্দরীতি—মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান (২.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান/পৃষ্ঠায় দেওয়া দৃষ্টান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিন)।

(গ) **পূর্ণপর্বের মাত্রাসংখ্যা (সাধারণত)**

	দলবৃত্ত/শ্বাসাঘাতপ্রধান	কলাবৃত্ত/ধ্বনিপ্রধান	মিশ্রবৃত্ত/তানপ্রধান
প্রবোধচন্দ্র	৪, ৭	৪, ৫, ৬, ৭	৪, ৬
অমূল্যধন	৪	৫, ৬, ৭, ৮	৬, ৮, ১০

৩. (ক) শ্বাসাঘাতপ্রধান, মিশ্রবৃত্ত, ধ্বনিপ্রধান।

(খ) দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধানে।

(গ) কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধানে।

(ঘ) মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধানে।

(ঙ) প্রাচীন কলাবৃত্তে।

৩৬.৫ অনুশীলনী—১

১. (ক) মহাপয়ার ঃ ৮ + ১০ মাত্রার পর্ববিন্যাসে তৈরি চরণ বা ৮ + ১০ মাত্রার পদ বিন্যাসে তৈরি পঙ্‌ক্তির ছন্দোবন্ধ। (৩.৩ পয়ার/পৃ-)

অপ্রবহমান পয়ার ঃ ৮ + ৬ মাত্রার যে সমিল পয়ারের ২টি চরণে ভাব আবদ্ধ, তার নাম। (৩.৩পৃ)

(খ) মিল—সমিল বা অমিল, প্রবহমান হবে দু-রকম পয়ারই।

পার্থক্য—প্রবহমান পয়ারের প্রতিটি চরণ একটিমাত্র ছত্রের ৮+৬ বা ৮+১০-এ নির্দিষ্ট, মুক্তক পয়ারের একটি মাত্র চরণ ৮+৬ বা ৮+১০ মাত্রার হলেও চলে, বাকি সব চরণের মাপ অনির্দিষ্ট, একটি চরণ নানাছত্রে টুকরো টুকরো হতে পারে। (৩.৩ পয়ার/পৃ)

২. (ক) আপনার দেওয়া দৃষ্টান্তগুলি মিলিয়ে নিন ৩.৩ পয়ার/পৃ তে দেওয়া দৃষ্টান্তের সঙ্গে।

(খ) আয়তনের দিক থেকে—ছোটো পয়ার, বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার ;

ছন্দরীতির দিক থেকে—দলবৃত্ত পয়ার, কলাবৃত্ত পয়ার, মিশ্রবৃত্ত পয়ার ;

গতিভঙ্গির দিক থেকে—অপ্রবহমান পয়ার, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক পয়ার।

প্রবহমান আর মুক্তক পয়ার সমিল হতে পারে, অমিল হতে পারে। (মোট ১০টি রূপ)

৩. (ক) i) আছে, ভাব দ্বিতীয় চরণে অসম্পূর্ণ। শুরুতে প্রশ্ন, শেষে প্রশ্নচিহ্ন নয়, অর্ধচ্ছেদের চিহ্ন।

ii) নেই, ভাব প্রতিটি চরণেই সম্পূর্ণ। প্রতিটি চরণের শেষেই পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন।

(খ) i) কলাবৃত্ত মহাপয়ার।

ii) দলবৃত্ত পয়ার।

iii) কলাবৃত্ত পয়ার।

iv) সমিল প্রবহমান মহাপয়ার।

৩৬.৮ অনুশীলনী—২

১. ৩.৬ অমিত্রাক্ষরে/পৃ-তে দেওয়া ৪টি গুণ দেখিয়ে দিন।

২. (ক) না, ভাব প্রবহমান নয়। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

(খ) হ্যাঁ, ৪টি গুণই রয়েছে। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

(গ) না, অন্তমিল রয়েছে। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

(ঘ) হ্যাঁ, ৪টি গুণই রয়েছে। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

৩. (প্রথমে প্রতিটি ছত্রে যতিচিহ্ন বসিয়ে নিন। তারপর দেখুন কোথায় কোথায় ছেদচিহ্ন আছে, আন্দাজ করুন ছেদচিহ্ন না থাকলেও কোথায় ছেদ থাকা সম্ভব। উদ্ধৃত পয়ার-স্তবকে ৮ আর ১৪ মাত্রার পরে যতি নির্দিষ্ট। অতএব, ৮ বা ১৪ মাত্রার পর ছেদ থাকলে হবে ছেদ-যতির মিলন, ছেদ না থাকলে বিচ্ছেদ। আবার ৮ বা ১৪ মাত্রার বাইরে ছেদ থাকলে সেখানেও হবে বিচ্ছেদ।)

১ম ছত্রে—৮ আর ১৪ মাত্রার পর মিলন।

২য় ছত্রে—৪, ৮, ১৪ মাত্রার পর বিচ্ছেদ।

৩য় ছত্রে—৮ মাত্রায় মিলন, ১৪ মাত্রায় বিচ্ছেদ।

৪র্থ ছত্রে—৮ মাত্রায় মিলন।

২য় আর ৩য় ছত্রে ১৪ মাত্রার পরে অর্থাৎ চরণশেষে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ, এর অর্থ প্রবহমানতা আছে। চরণশেষেও মিল নেই। অতএব স্তবকটি অমিল প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ)

৩৬.১১ অনুশীলনী—৩

১. সরল অর্থ ১৪টি পদ বা চরণ দিয়ে তৈরি কবিতা। কিন্তু 'চতুর্দশপদী'র আরও ৪টি শর্ত পূরণ করতে হয়। অতএব, নামটি সনেট-জাতীয় কবিতার পুরো পরিচয়ের আভাস দেয় না। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ)

স্তবক-গঠন ঃ

২. (ক) পেত্রার্কীয়—অষ্টক-ষট্‌ক ;

ফরাসি—অষ্টক—যুগ্মক—চতুষ্ক ;

সেক্‌স্‌পিরীয়—চতুষ্ক-চতুষ্ক-চতুষ্ক-যুগ্মক। (৩. ৯ চতুর্দশপদী/পৃ-)

মিল ঃ

(গ) পেত্রার্কীয়—কখখক-কখখক চছজ-চছজ ;

ফরাসি—কখখক-কখখক গগ চছচছ ;

সেক্‌সপিরীয়—কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ-)

৩. (ক) i) কখখক—পেত্রার্কীয় বা ফরাসি অষ্টকের প্রথম বা দ্বিতীয় অংশ।

ii) কখকখ—সেক্‌স্‌পিরীয় চতুষ্ক।

iii) গগ বা চচ — ফরাসি বা সেক্‌স্‌পিরীয় যুগ্মক।

(খ) i) সনেট

ii) চোদ্দ, ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কো, ষোলো, ক্লেঁসে মারো, সতেরো, সেকসপিয়ার।

৩৬.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

১. (ক) **পয়ার ঃ** মূলত ৮+৬ মাত্রার বিন্যাসে তৈরি সমিল ছন্দোবন্ধ। (৩.৩ পয়ার/পৃ-)
অমিত্রাক্ষর ঃ চরণশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)
চতুর্দশপদী ঃ মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার বা মহাপয়ারের ১৪টি চরণ দিয়ে তৈরি কবিতা যার স্তবক-গঠন আর মিলবিন্যাস হবে নির্দিষ্ট য়ুরোপীয় ছকে। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ)

(খ) **ছন্দরীতি আর ছন্দোবন্ধ ঃ** ছন্দরীতি ছন্দের প্রকৃতি—নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, ছন্দোবন্ধ ছন্দের আকৃতি—নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের ওপর। (৩.২ প্রস্তাবনা/পৃ)

অপ্রবহমান পয়ার আর অমিত্রাক্ষর ঃ

অপ্রবহমান পয়ারে ভাবের প্রবহমানতা নেই, চরণশেষে মিল রয়েছে ; অমিত্রাক্ষরে ভাবের প্রবহমানতা আছে, চরণশেষে মিল নেই। (৩.৩ পয়ার/পৃ, ৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

(গ) **পয়ার ঃ** ২টি চরণ, অন্ত্যমিল, চরণে ২টি পর্ব, পর্ব ৮ আর ৬ মাত্রার। (৩.৩ পয়ার/পৃ)
অমিত্রাক্ষর ঃ ছত্র-চরণ সমান, চরণ ৮+৬ মাত্রার, ভাবের প্রবহমানতা, অন্ত্যমিল না থাকা। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ)
চতুর্দশপদী ঃ ১৪-চরণ, পয়ারের চরণ, মিশ্রবৃত্ত রীতি, স্তবক-গঠন আর মিলের নির্দিষ্ট ছক। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ)

২. (ক) মুক্তক পয়ার ; ৩-রকম মাপের ৪টি চরণ দিয়ে তৈরি প্রবহমান পয়ারের স্তবক। (৩.৩ পয়ার/পৃ)

(খ) চতুর্দশপদীর স্তবকের অংশ ; মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ারে মিলের ছক কখখক, পেত্রার্কীয় বা ফরাসি অষ্টকের অংশ। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ-)

(গ) অমিত্রাক্ষর ; ছত্র জুড়ে থাকা ৮+৬ মাত্রার পয়ার-চরণে ভাব প্রবহমান, অন্ত্যমিল নেই (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ)

(ঘ) সমিল প্রবহমান দলবৃত্ত মহাপয়ার ; অন্ত্যমিল আর প্রবহমান ভাব নিয়ে দলবৃত্ত রীতিতে লেখা ৮+১০ মাত্রার ৪টি চরণ। (৩.৩ পয়ার/পৃ-)

৩৭.৫ অনুশীলনী-১

১. (ক) কবিতার ছন্দ, ছন্দের উপাদান রীতি ছন্দোবন্ধ, এ সব বিষয়ে প্রাথমিক তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে কবিতার স্তবকে তার প্রয়োগ করাই আসলে ছন্দ-বিশ্লেষণ। কবিতার স্তবকে সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করে এবং তা থেকে কিছু আবশ্যক তথ্য বের করে নিয়ে তালিকাবদ্ধ করেই স্তবকের ছন্দ-পরিচয় তৈরি করতে হয়। এরই নাম ছন্দ-বিশ্লেষণ।

(খ) প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতিচিহ্ন (।), পদযতিচিহ্ন (।।), ১-মাত্রা (.), ২-মাত্রা (-), প্রস্বর-চিহ্ন (/)।
অমূল্যধনের অর্ধযতিচিহ্ন (।), পূর্ণযতিচিহ্ন (।।), ১-মাত্রা (০, ‿, /), ২-মাত্রা (॥, —, ঃ), শ্বাসাঘাত-চিহ্ন (/)।

(গ) **প্রবোধচন্দ্রের পদ্ধতির অসুবিধা ঃ**

ছত্রশেষে যতিচিহ্ন থাকে না বলে পঙ্‌ক্তি চেনার সমস্যা, পর্ব আর পঙ্‌ক্তির মাঝখানে পদযতির সঠিক জায়গা চেনার সমস্যা, পর্বের শেষ দলে ১-মাত্রার চিহ্ন না-থাক, প্রতি পর্বের প্রথম দলে প্রস্বর-চিহ্নের একঘেয়েমি, মাত্রা-চিহ্ন নানাদিকে ছড়ানো—দলের মাথায়, দলের পাশে, রুদ্ধদলের মাঝখানে।

অমূল্যধনের পদ্ধতির অসুবিধা ঃ

স্বরাক্ষ অক্ষরের (মুক্তদল) শ্বাসাঘাত নির্দিষ্ট নয়, ২-রকমের মাত্রা বোঝাতে ৬-রকমের চিহ্ন ব্যবহার।

(ঘ) প্রবোধচন্দ্রের পদ্ধতি থেকে নেওয়া হল ২টি মাত্রা চিহ্নের ধারণা, ৪টি পরিভাষা—দল, দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত। অমূল্যধনের পদ্ধতি থেকে নেওয়া হল অর্ধযদি-পূর্ণযতির চিহ্ন, ৬টি পরিভাষা—অক্ষর, শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান, চরণ, স্তবক। পর্বের মাপও অমূল্যধনের পর্বের মতো।

প্রবোধচন্দ্রের পদ্ধতি থেকে ছেড়ে দেওয়া হল পদযতিচিহ্ন, মাত্রাচিহ্ন, প্রস্বর-চিহ্ন, ৪টি পরিভাষা—'পদ', পঙ্‌ক্তি, শ্লোক, প্রস্বর। অমূল্যধনের পদ্ধতি থেকে ছাড়া হল মাত্রাচিহ্ন, শ্বাসাঘাত-চিহ্ন, ১টি পরিভাষা—শ্বাসাঘাত।

(ঙ) ছন্দ-বিশ্লেষণের মূলত ২টি ধাপ,—ছন্দলিপি আর তথ্য-তালিকা তৈরি করা। ছন্দলিপি তৈরির ধাপে ৬-দফা কাজ—দল বা অক্ষর সাজানো, যতিচিহ্ন বসানো, দল বা অক্ষর চেনা। (কোনটা মুক্ত বা স্বরান্ত, কোনটা রুদ্ধ বা হলন্ত), দল বা অক্ষরের মাত্রা ঠিক করা (কোনটা ১-মাত্রার, কোনটা ২-মাত্রার), কোন পর্বে কটি মাত্রা আর কোন চরণে কটি পর্ব—চরণের ডানদিকে তা লিখে ফেলা, সংকেত-চিহ্নের পরিচয় দেওয়া। এরপর ছন্দলিপি থেকে এই কটি তথ্য বের করে নিয়ে নীচে তৈরি করা ছকে পর পর লিখতে হয়—মাত্রারীতি, ছন্দরীতি, পর্ব, চরণ, স্তবক, ছন্দোবন্ধ (স্পষ্ট বোঝা গেলে) আর বৈশিষ্ট্য (উল্লেখ করার মতো হলে)।

২. (ক) (।) অমূল্যধনের অর্ধযতিচিহ্ন বা প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতিচিহ্ন ;

(-) প্রবোধচন্দ্রের ২-মাত্রার চিহ্ন ;

(/) অমূল্যধনের শ্বাসাঘাত-চিহ্ন বা প্রবোধচন্দ্রের প্রস্বর-চিহ্ন ;

(ঃ) অমূল্যধনের ২-মাত্রার একটি চিহ্ন (ধ্বনিপ্রধান আর তানপ্রধান রীতিতে শব্দের শেষে-থাকা হলন্ত অক্ষরের মাত্রাচিহ্ন)।

(খ) i) দুর্‌দান্ত পাণ্‌ডিত্যপূর্‌ণ দুস্‌সাদ্‌ধ্য সিদ্‌ধ্যান্‌ত

ii) জলসিঞ্‌চিত ক্ষিতিসৌরভ (খিতিসউরভ) রভসে

iii) অনাথপিণ্‌ডদ কহিলা অম্‌বুদনিনাদে

(গ) i) দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান।

ii) প্রাচীন কলাবৃত্ত।

iii) মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

iv) কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

৩৭.৯ অনুশীলনী-২

(কেবল ছন্দরীতির নাম দেওয়া হল।)

দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দরীতি ঃ

স্তবক নং—২, ৭, ১২, ১৫, ১৯, ২২, ২৬, ২৮।

আধুনিক কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দরীতি ঃ

স্তবক নং—১, ৩, ৬, ১১, ১৩, ১৬, ১৮, ২০, ২৪, ২৯।

প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দরীতি ঃ

স্তবক নং—৪, ১০, ২৭।

মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতি ঃ

স্তবক নং— ৫, ৮, ৯, ১৪, ১৭, ২১, ২৩, ২৫, ৩০।

ভূমিকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ঐচ্ছিক পাঠক্রম ৪টি পত্রে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত খ-২ পর্যায়। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় বংলা কবিতার অলংকার। আলোচনার মূল বিভাগ দুটি—অলংকারের পরিচয় আর অলংকার-নির্ণয়। পরিচয় পর্বটি সম্পূর্ণ হয়েছে তিনটি এককে, নির্ণয় পর্বের জন্য বরাদ্দ হয়েছে পুরো একটি একক। এই চারটি থেকে গোটা পর্যায়টি বিভক্ত। প্রতিটি এককের আশ্রিত বিষয়বস্তু এইরকম ঃ

- **একক ৩৮ ঃ** এই এককে কবিতার অলংকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটুকু শিক্ষার্থীর মনে সহজে তৈরি করে দেবার জন্য 'অলংকার' কথাটির চেনা অর্থের সঙ্গে কবিতার অলংকারের অচেনা অর্থের সংযোগটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে অতি সংক্ষেপে জানানো হল প্রাচীন ভারতের অলংকার ভাবনার কথা, অলংকারের তাৎপর্য নিয়ে কথা, আর অলংকারের মূল বিভাগের কথা।

- **একক ৩৯ ঃ** অলংকারের দুটি মূল বিভাগের একটি শব্দালংকার। শব্দালংকার এই এককের বিষয়। 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থের (ধ্বনি, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি) মধ্যে একমাত্র ধ্বনির মাধুর্যই যে শব্দালংকার, আবশ্যকমতো উদাহরণের সাহায্য নিয়ে তার আলোচনা এখানে করা হল। এরপর সবচেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য চারটি শব্দালংকারের (অনুপ্রাস-যমক-শ্লেষ-বক্রোক্তি) বিশদ বিশ্লেষণ করা হল সংজ্ঞায়, উদাহরণে ব্যাখ্যায়।

- **একক ৪০ ঃ** অলংকারের বড়ো বিভাগটির নাম অর্থালংকার। বড়ো বলেই বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে তার বিশদ আলোচনা করে দেওয়া হল এই এককে। প্রথমভাগে অর্থালংকারের কথা সাধারণভাবে, পরের দুটি ভাগে অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হল। এই পাঁচটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল এগারোটি অলংকার—সাদৃশ্যমূলক 'উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি-অতিশয়োক্তি-ব্যতিরেক' বিরোধমূলক 'বিরোধাভাস', শৃঙ্খলামূলক 'একাবলি', ন্যায়মূলক 'অর্থান্তরন্যাস', গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক 'ব্যাজস্তুতি-স্বভাবোক্তি'।

- **একক ৪১ ঃ** প্রথম তিনটি এককে থেকে বাংলা কবিতার বাছাই-করা পনেরোটি অলংকারের পরিচয় শিক্ষার্থীরা পাবেন। এই তাত্ত্বিক পরিচয়টুকু প্রয়োগ করে তাঁরা যাতে নিজেরাই অলংকৃত কবিতার অন্তর্গত অলংকারটি খুঁজে নিতে পারেন, সেই লক্ষ্য নিয়ে অলংকার-নির্ণয়ের পদ্ধতি, কিছু কিছু সমস্যার সমাধান-সূত্র এবং অলংকার-চর্চার প্রয়োজনে ৪৫টি উদাহরণ নানা কবিতা থেকে উদ্ধার করে এই এককটিতে সাজিয়ে দেওয়া হল।

  এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে এই ৩টি বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

  ১. অলংকার চন্দ্রিকা ঃ শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

  ২. বাঙলা অলঙ্কার ঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়।

  ৩. বাংলা কবিতার অলংকার ঃ সুধীন্দ্র দেবনাথ।

একক ৩৮ ❐ অলংকার

গঠন

৩৮.১ উদ্দেশ্য

৩৮.২ প্রস্তাবনা

৩৮.৩ মূলপাঠ

৩৮.৪ সারাংশ

৩৮.৫ অনুশীলনী

৩৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়লে—

- বাংলা কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, এ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আপনার মনে তৈরি হবে।
- কাব্যের অলংকার নিয়ে ভারতীয় আলংকারিকদের ধারাবাহিক চিন্তাভাবনা বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানবার জন্য আপনি আগ্রহী হবেন।
- কবিতার অলংকারের মূল বিভাগ এবং তাদের ভেতরকার সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে আপনি একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে পারবেন।

৩৮.২ প্রস্তাবনা

কবিতার সৌন্দর্য অনুভব করার পাশাপাশি উৎসুক পাঠকের, আগ্রহী শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত দায়িত্ব সেই সৌন্দর্যের রহস্য কী, তা ধাপে ধাপে বুঝে নেবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ কবিতায় অলংকার সন্ধান। ভারতীয় অলংকার চর্চার ধারা থেকেই বাংলা কবিতার অলংকারের ভাবনা এসেছে, আবশ্যক পরিভাষা নেওয়া হয়েছে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র থেকেই। অলংকার সম্পর্কে আপনার মনে প্রাথমিক ধারণাটুকু তৈরি করে দেবার জন্য যেটুকু আবশ্যক, সংক্ষেপে তাই করা হল একক ৩৭-এ।

৩৮.৩ মূলপাঠ

সংস্কৃত 'অলম'-এর একটি অর্থ 'ভূষণ' বা সাজসজ্জা। 'অলংকার' তাহলে সাজসজ্জার কাজ। শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য শরীরকে সাজানো হয় গয়না দিয়ে, তাই গয়না শরীরের অলংকার। রচনাকে সুন্দর করার জন্য যে আয়োজন, তাও অলংকার। সেই অলংকারে সাজানো হলে তবেই কোনো রচনা হবে কাব্য।

ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' অলংকারের উল্লেখ হয়েছিল দু-হাজার এক-শ বছর আগে—উপমা, দীপক, রূপক,

যমক এই চারটি অলংকার। ভারতবর্ষে অলংকার-চর্চার এই হল সূচনা। দেড় হাজার বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল অলংকার নিয়ে নানা বিতর্ক। ছ-শতকের আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' ভরতমুনির চারটি অলংকার বেড়ে হল ছত্রিশটি। তাঁর মতে, যেসব ধর্ম কাব্যে শোভা এনে দেয় তার নাম অলংকার ('কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে')। সাত-শতকেরক আচার্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের বক্রোক্তি-তত্ত্ব পেরিয়ে যখন আট শতকে পৌঁছই, তখন দেখি, বামনাচার্য অলংকার সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করছেন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে—কোনো রচনা মানুষের কাছে উপাদেয় এবং কাব্য বলে গ্রাহ্য হয় অলংকারের জন্যই, আর সৌন্দর্যই হচ্ছে সেই অলংকার ('কাব্যং গ্রাহ্যং হ্যলঙ্কারৎ। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ')। বামনাচার্যের এই সূত্রটি আজকের বাংলা কবিতার অলংকার বুঝতেও অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃত কাব্যের অলংকার নিয়ে আলোচনা পাল্টা আলোচনা চলেছে সতেরো-শতক পর্যন্ত। বামনাচার্যের সূত্রটি ক্রমশ দুটি মাত্রা পেল—এক, অলংকার কাব্যের সাধারণ (আত্মভূত) সৌন্দর্য ; দুই অলংকার কাব্যের বিশেষ (অঙ্গাভূত) সৌন্দর্য। চৌদ্দ-শতকের বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকারের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি ধরে ছিয়াত্তরটি অলংকারের আলোচনা করলেন তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে।

সেই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান কিছুকাল ধরে চলছে। এখানে আমরাও তাই করব—বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো উদাহরণ সংগ্রহ করে অলংকার নির্ণয় করে যাব। তবে তার সীমানা পনেরোটি অলংকার।

কবিতার মতো অলংকারের আয়তনও অনির্দিষ্ট। একটি অলংকার একটিমাত্র শব্দকে আশ্রয় করতে পারে, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য জুড়ে থাকতে পারে, কবিতার একটি স্তবক বা ছোটোমাপের একটি কবিতার শরীরেও ছড়াতে পারে। কবিতা বা তার অন্তর্গত স্তবক-চরণ বাক্য শব্দের দুটি রূপ—একটি ধ্বনিরূপ, আর একটি অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, তার আবেদন শ্রুতির কাছে ; অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে, তার আবেদন বোধের কাছে। কবিতা স্তবক-চরণ বাক্য বা শব্দ উচ্চারিত হলে উচ্চারণজনিত ধ্বনির মাধুর্য সরাসরি শ্রোতার কানকে তৃপ্ত করতে পারে, অথবা অর্থের সৌন্দর্য শ্রোতার বোধকে উদ্দীপিত করতে পারে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম, শব্দালংকার আর অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

৩৮.৪ সারাংশ

শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য গয়না দিয়ে শরীরকে সাজানো হয়। তাই, গয়না শরীরের অলংকার। তেমনি, কথাকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য যে আয়োজন, তা কথার অলংকার। আর, এই অলংকার দিয়ে সাজানো কথাই কাব্য বা কবিতা।

ভারতবর্ষে অলংকারের ইতিহাস ২১০০ বছরের। প্রথমে ভরতমুনি জানালেন ৪টি অলংকারের কথা, তারপর আচার্য দণ্ডী ৩৬টি এবং ভামহ বামনাচার্যের যুগ পেরিয়ে সবশেষে বিশ্বনাথ কবিরাজ ৭৬টি অলংকারের আলোচনা করলেন। বামনাচার্যের একটি মত, অলংকার হচ্ছে কবিতার শরীরের সৌন্দর্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই অর্থ ধরেই অলংকার ব্যাখ্যা করলেন, আমরাও এই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান করব।

একটিমাত্র শব্দ অথবা একটি-দুটি চরণ বা একটি স্তবক, এমনকী একটি গোটা কবিতা জুড়েও থাকতে পারে

অলংকার। কবিতা বা স্তবক-চরণ শব্দের দুটি রূপ—ধ্বনিরূপ আর অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম শব্দালংকার, অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

৩৮.৫ অনুশীলনী

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ২৮৬-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, লিখুন।

২. (ক) পাঁচজন প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকের নাম, তাঁদের গ্রন্থের নাম আর অলংকার-চর্চার কাল (শতক) উল্লেখ করেন।

(খ) কোন আলংকারিকের কোন সূত্রের কী অর্থ ধরে বাংলা কবিতায় অলংকার সন্ধান করা হয় লিখুন।

৩. (ক) একটি কবিতার কতটুকু আয়তন জুড়ে একটি অলংকার থাকতে পারে, লিখুন।

(খ) উচ্চারিত কবিতা বা তার অংশের কী কী রূপ, কোন রূপ শ্রোতার কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে লিখুন।

৪. অলংকারের মূল বিভাগ কী কী, কবিতা বা তার অংশের উচ্চারণ থেকে অলংকার কীভাবে তৈরি হয়—লিখুন।

একক ৩৯ ❐ শব্দালংকার

গঠন

৩৯.১ উদ্দেশ্য

৩৯.২ প্রস্তাবনা

৩৯.৩ মূলপাঠ

৩৯.৩.১ অনুপ্রাস

৩৯.৩.২ যমক

৩৯.৩.৩ শ্লেষ

৩৯.৩.৪ বক্রোক্তি

৩৯.৪ সারাংশ

৩৯.৫ অনুশীলনী

৩৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়লে—

- আপনি বাংলা কবিতার উচ্চারণ থেকে ধ্বনিমাধুর্য আস্বাদন করার সমর্থ শ্রোতা হয়ে উঠতে পারবেন।
- বাংলা কবিতায় ধ্বনির প্রয়োগে বা সমাবেশে কবির দক্ষতা বিচার করার ক্ষমতা ক্রমশ আপনার মধ্যে তৈরি হবে।
- বাংলা কবিতায় ধ্বনিপ্রয়োগের নানারকম কৌশল বুঝে নেওয়া ক্রমশ আপনার পক্ষে সহজ হবে।

৩৯.২ প্রস্তাবনা

একক ৩৮ থেকে জানলেন বাংলা কবিতার অলংকারের দুটি মূল বিভাগের কথা। এর প্রথমটি শব্দালংকার। এ অলংকার তৈরি হয় শ্রোতার কানে, কবিতার উচ্চারণ থেকে মধুর ধ্বনি শুনতে শুনতে। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে অলংকারের এই বিভাগটির পরিচয় আপনার কাছে তুলে ধরা হল। কিছু কিছু সূক্ষ্ম কৌশলগত পার্থক্যের কারণে শব্দালংকারেও যে ধরনের বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাও দেখানো হল।

৩৯.৩ মূলপাঠ

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থ—একটি ধ্বনি, অন্যটি অর্থবোধক বর্ণসমষ্টি (লেখায়) বা ধ্বনিসমষ্টি (উচ্চারণে)। প্রথমটি ইংরেজি Sound অর্থে, দ্বিতীয়টি ইংরেজি Word অর্থে। 'শব্দালংকার'-এর 'শব্দ' তাহলে কোন অর্থে? চারটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে অর্থটি বুঝে নেওয়া যাক।

প্রথম উদাহরণ, 'কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়'—এই ছত্রটিতে পাঁচটি শব্দ (Word) আছে, আবার পাঁচটি ক-ধ্বনিও আছে। পাঁচটি পৃথক শব্দ, কিন্তু একই ক-ধ্বনি পাঁচবার। ছত্রটি উচ্চারণ করলে ক-ধ্বনিটিই পরপর পাঁচবার কানে মৃদু আঘাত দেয়, একই ধ্বনি বারে বারে আবৃত্ত হয়ে মাধুর্য সৃষ্টি করে, তৈরি হয় ধ্বনির অলংকার—শব্দালংকার। পৃথক পৃথক শব্দ (Word) এখানে কোনো অলংকার তৈরি করে না।

ওপরের উদাহরণটি থেকে বোঝা গেল, অলংকার তৈরি করে যে শব্দ তা Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি নয়, Sound বা ধ্বনি। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু তর্ক আছে। আরও দুটি উদাহরণ থেকে তর্কও উঠবে, সে তর্কের মীমাংসাও হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ,

আটপণে কিনিয়াছি আধসের চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।

এখানে 'চিনি' শব্দটি দুটি ছত্রে দুবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম 'চিনি' এক ধরনের মিষ্টি, দ্বিতীয় 'চিনি'-র অর্থ 'জানি' বা 'বুঝি'। একই শব্দ 'চিনি' দুবার উচ্চারিত হল দুটি পৃথক অর্থ নিয়ে। 'চিনি'-র পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ কানে মধুর লাগে, কানকে তৃপ্ত করে। এই মাধুর্যের সঙ্গে একটুখানি চমক লাগে 'চিনি' শব্দটি দুবার দুটি পৃথক অর্থ পাচ্ছে বলে। একই অর্থে দুবার উচ্চারণে ওই আস্বাদটুকু পাওয়া যাবে না, যেমন পাওয়া যায় না যদি বলি—'তোমাকে ত চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে!' অথবা 'ছেলেটা চিনি চিনি করে চেঁচায় শুধু, বেশি খেতে পারে না।' 'চিনি' শব্দের দুটি পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ থেকে যে মাধুর্য তৈরি হল তা-ও শব্দালংকার। এ অলংকার তো 'চিনি' শব্দটাকে ঘিরেই তৈরি হল এবং 'শব্দ' এখানে Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, sound বা ধ্বনি নয়।

তৃতীয় উদাহরণ,

'পূজাশেষে কুমারী বললে, 'ঠাকুর, আমাকে মনের মতো
একটি বর দাও।'

'বর' শব্দটি একবার মাত্র উচ্চারিত হল উদ্ধৃত বাক্যে। এতে চমকাবার মতো কিছুই থাকত না, যদি 'বর' সাধারণভাবে একটিমাত্র অর্থই বোঝাত। কিন্তু বিদগ্ধ শ্রোতা জানেন, 'বর'-এর দুটি অর্থ—'আশীর্বাদ' আর 'স্বামী'। কুমারী মেয়ে ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ চাইতে পারে, 'মনের মতো' স্বামীও চাইতে পারে। 'বর' শব্দটি যখন দুটি অর্থের ইঙ্গিত নিয়ে শ্রোতার কানে বেজে ওঠে, তখন সেই উচ্চারণে তৈরি হয় চমক আর মাধুর্য। চকমসহ এই মাধুর্যই শব্দালংকার। এ-অলংকারের কেন্দ্রে আছে 'বর' শব্দটি, একটিমাত্র উচ্চারণে দুটি অর্থ নিয়ে। 'শব্দ' এখানেও Word, Sound নয়।

তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি (sound) হতে পারে, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিও (Word) হতে পারে? ধরে নেওয়াই যায়, ওপরের তিনটি উদাহরণ তো সে-কথাই বলে। কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় উদাহরণ অন্য কথাও বলে এবং সেই কথাই চূড়ান্ত। ধ্বনি আর শব্দের (Sound আর Word) এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত আছে আর একটি কথা। সেটি হল 'অর্থে'র ভূমিকা। শব্দ Word যখন অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, তখন শব্দে ধ্বনিও আছে, অর্থও আছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণের 'চিনি' আর 'বর' যখন শব্দালংকার সৃষ্টি করে, তখন ওই শব্দদুটির ধ্বনি আর অর্থই অলংকার-সৃষ্টির কাজ করে যায়। 'চিনি'র দুবার উচ্চারণে দুটি অর্থ আর

'বর'-এর একবার উচ্চারণে দুটি অর্থ—এই অর্থের চমকেই তো এদের অলংকার। তবু এরা অর্থালংকার নয়, শব্দালংকারই। এর কারণ, উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি বা ধ্বনিগুচ্ছই শ্রোতার কানে মাধুর্য সঞ্চার করে, অলংকার তৈরি করে। আর, সে অলংকার-সৃষ্টিতে কেবল সহায়তা করে একই ধ্বনিগুচ্ছের দুটি অর্থ—ধ্বনির মধ্যে চমক জাগিয়ে। অতএব, 'চিনি' আর 'বর'-এর অলংকার নির্মাণে ধ্বনি দেয় মাধুর্য, অর্থ দেয় চমক। ধ্বনিমাধুর্যই তো শব্দালংকার, অর্থ তার সহায়কমাত্র। ধ্বনির এখানে মুখ্য ভূমিকা, অর্থ নিতান্ত গৌণ। অন্যদিকে, প্রথম উদাহরণের অলংকার নির্মাণে একমাত্র ধ্বনিরই ভূমিকা (ক-ধ্বনি)।

ওপরের তিনটি উদাহরণের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এই সত্যটিই বেরিয়ে এল—শব্দালংকার মূলত ধ্বনি নির্ভর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে অর্থের সহায়তা নিতে হয়। এ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, শব্দের (Word) উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' কখনো বর্ণধ্বনি (প্রথম উদাহরণে), কখনো শব্দধ্বনি (দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণে)। চতুর্থ উদাহরণের সাহায্য নিয়ে দেখব, 'শব্দ' কখনো কখনো বাক্যধ্বনি।

যেমন,

'রজনীগন্ধা বাস বিলালো,
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো ?'

—এখানে দুটি বাক্য। দুটি বাক্যেরই গোটা শরীরে ছড়ানো রয়েছে এই ধ্বনিগুলি : 'অজনী-অন্ধা-আসবি-আলো'। অতএব এটি বাক্যধ্বনি, এবং একই বাক্যধ্বনির দুবার আবর্তনে শব্দালংকার।

সুতরাং শব্দালংকারের 'শব্দ' মূলত ধ্বনিই—বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বাক্যধ্বনি, যা-ই হোক ('শব্দধ্বনি'র 'শব্দ' অবশ্যই Word)। তবে, শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার। কবিতার একটি স্তবকের উচ্চারণ থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (Word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগ বা সমাবেশের কৌশলে মধুর শোনায়, এবং সেই মাধুর্য যদি শ্রোতার কানে তৃপ্তিদায়ক ঠেকে, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার।

বাংলা কাব্য-কবিতায় প্রয়োগ-পরিমাণের দিক থেকে প্রথম চারটি শব্দালংকার—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ আর বক্রোক্তি।

৩৯.৩.১ অনুপ্রাস

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনধ্বনির বা সমব্যঞ্জনধ্বনির একাধিকবার উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের একাধিকবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে, অথবা বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অনুপ্রাস অলংকার।

(একই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার উচ্চারণে অনুপ্রাস।)

বৈশিষ্ট্য :

১। একই ব্যঞ্জনের দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

২। সমব্যঞ্জনের (জ-য, শ-ষ-স, ণ-ন) দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

৩। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত (ম্ব-ম্ব, ন্ধ-ন্ধ) বা বিযুক্ত (শিষের-শিশির, শাখার-শিখরে) উচ্চারণ।

৪। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত (বরী-রবী, বাক্-কাব্) উচ্চারণ।

৫। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণ।

৬। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার (ক-খ, চ-ছ, ট-ঠ) বা বহুবার (ত-থ-দ-ধ-ন) উচ্চারণ।

৭। স্বরধ্বনির সাম্য থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। একমাত্র প্রয়োগস্থানগত অনুপ্রাসে (আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস) স্বরধ্বনির সাম্য আবশ্যক।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

● প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—

(ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস (বৃত্তি + অনুপ্রাস) ; (খ) ছেকানুপ্রাস (ছেক + অনুপ্রাস) ;

(গ) শ্রুত্যনুপ্রাস (শ্রুতি + অনুপ্রাস)।

● প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—

(ঘ) আদ্যানুপ্রাস (আদ্য + অনুপ্রাস) ; (ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস (অন্ত্য + অনুপ্রাস) ;

(চ) সর্বানুপ্রাস (সর্ব + অনুপ্রাস)।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

● **(ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস ঃ**

সংজ্ঞা ঃ একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১. একই ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনের 'ব' দুবার (বিদায়, বিষাদ) ধ্বনিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

২. সমব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

জেগেছে যৌবন নব বসুধার দেহে। —শ্যামাপদ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন 'জ' 'য' দুবার উচ্চারিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৩. একই ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

চলচপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জন 'চ'-এর ছয়বার এবং 'র'-এর চারবার উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

৪. সমব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

শরতের শেষে সরিষা রো। —খনার বচন

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন 'শ' 'ষ' 'স' পাঁচবার ধ্বনিত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

৫. ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)—

(i) কবরী দিল করবীমালে ঢাকি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'কবরী' আর 'করবী' শব্দদুটিতে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'বর'-এর বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে দুবার—প্রথমবার 'বরী' এবং দ্বিতীয়বার 'রবী'। 'ব-র'-এর বিন্যাস বদলে যাওয়ার (বরী > রবী)-এর উচ্চারণ ক্রম অনুসারে হয়নি, হয়েছে স্বরূপ অনুসারে। অতএব, কবরী-করবী উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

(ii) বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য।

সংকেত : বাক্য > কাব্য।

৬. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী। —জগদানন্দ

সংকেত : 'ঞ্-জ'-এর যুক্ত উচ্চারণ (ঞ্জ) তিনবার।

(ii) দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : একই স্বরধ্বনিসমেত 'ন্-ত্'-এর যুক্ত উচ্চারণ (আন্তে) তিনবার।

৭. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া। —নজরুল

সংকেত : 'লক'-এর তিনবার উচ্চারণ স্বরধ্বনিসমেত ('লোক')।

(ii) কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।

সংকেত : 'কল'-এর চারবার উচ্চারণ (স্বরসাম্য নেই—'কল', 'কিল' - 'কুল' - 'কুল')।

● **(খ) ছেকানুপ্রাস ঃ**

সংজ্ঞা ঃ একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস।

('ছেক' শব্দের অর্থ বিদগ্ধ পণ্ডিত। ছেকানুপ্রাস বিদগ্ধজনের প্রিয় অনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ম্-ব্'-এর ক্রম অনুসারে যুক্ত উচ্চারণ (ম্ব) হয়েছে দুবার (কলম্ব, অম্বর)। অতএব, ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

(ii) কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'ন্-ধ্'-এর যুক্ত উচ্চারণ (ন্ধ) দুবার।

২. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)—

একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'শ-ষ-র'-এর ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে 'শিষের' ও 'শিশির' শব্দ দুটিতে। লক্ষণীয়, এখানে স্বরসাম্য নেই (ই-এ, ই-ই)। তবু ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

মন্তব্য : 'শ-ষ-র' এবং 'শ-শ-র' ধ্বনিগতভাবে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ। 'শ-ষ'-এর বর্ণগত পার্থক্য থাকলেও বাংলা উচ্চারণে এরা একই রকম ধ্বনি। ধ্বনিদুটিকে সমব্যঞ্জন বলা যায়।

৩. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত এবং বিযুক্ত উচ্চারণ—

(i) মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'প-ঞ্-জ-র' ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হয়েছে 'পঞ্জর' ও 'পিঞ্জরে' শব্দদুটিতে। এখানে 'প-র' ব্যঞ্জনদুটির উচ্চারণ বিযুক্তভাবে হলেও 'ঞ্-জ্'-এর উচ্চারণ হয়েছে যুক্তভাবে. স্বরধ্বনির সাম্যও এখানে নেই (পঞ্জর-পিঞ্জরে > অ-অ-অ > ই-অ-এ)। কিন্তু, ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থাকার কারণে এখানে ছেকানুপ্রাসই হয়েছে।

(ii) আমি কবি ভাই কর্মের ও ঘর্মের। —প্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'র্-ম-র' ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হয়েছে নিঃসন্দেহে (প্রথম উচ্চারণ 'কর্মের > 'র্মের', দ্বিতীয় উচ্চারণ 'ঘর্মের > 'র্মের')। কিন্তু লক্ষণীয়, 'র্ম'-এর উচ্চারণ যুক্ত আর 'মের'-এর উচ্চারণ 'এ' স্বরধ্বনির দ্বারা বিযুক্ত।

●(গ) শ্রুত্যনুপ্রাস :

সংজ্ঞা : বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাস।

(একই ধ্বনির অনুপ্রাস নয়, তবে একই স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি বলে তারা শ্রুতিতে বা শুনতে একইরকম। শ্রুতিতে অনুপ্রাস বলেই এর নাম শ্রুত্যনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. একই স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

(i) বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।

ব্যাখ্যা : 'গ-ঘ' ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জন হলেও তারা বাগযন্ত্রের একই স্থান কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত। ফলে, ওই দুটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনুয়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে 'বেগে' আর 'মেঘে' শব্দদুটিতে। এ অনুপ্রাস শ্রুতিগত বলে এটি শ্রুত্যনুপ্রাস।

(ii) চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'ক-খ' (কণ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস 'চিকন'-'লিখন'-'লিখন' শব্দটিতে

(iii) নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'ব-ভ' (ওষ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস 'নিরাবরণ' আর 'নিরাভরণ' শব্দদুটিতে।

২. একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের 'ছন্দোবন্ধগ্রন্থীগীত' অংশে 'দ-ন্-ধ-থ-ত' ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। এই সমাবেশ মূলত চারটি ধ্বনির—ত-থ-দ-ধ। এদের উচ্চারণস্থান দন্তমূল। ধ্বনিগতভাবে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ পৃথক হলেও শ্রুতিতে এরা একইরকম। সেই কারণে, মিলিতভাবে পাঁচবার উচ্চারিত হয়ে এরা শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

■ (ঘ) আদ্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : চরণের আদিতে 'বড়ো'-'জড়ো' শব্দে 'আড়ো' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে আদ্যানুপ্রাস।

(ii) নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণের প্রথম পর্বের আদিতে 'নিত্য' এবং দ্বিতীয় পর্বের আদিতে 'চিত্ত'—এই দুটি শব্দে 'ইত্ত' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 'ইত্ত' ধ্বনিগুচ্ছে আছে স্বরধ্বনি 'ই-অ' সমেত ব্যঞ্জনধ্বনি 'ত্ত' (ই-ত্-ত্-অ)। অতএব, এখানে আদ্যানুপ্রাস হয়েছে।

■(ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমন-কী পঙক্তির (line) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অন্ত্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) অজানু গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এ উদাহরণে প্রথম চরণটি সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় চরণ অপূর্ণ। প্রথম চরণের শেষে 'চমকি' আর দ্বিতীয় চরণের শেষে 'থমকি'—এই দুটি শব্দে 'অমকি' ধ্বনিগুচ্ছের (অ-ম্-অ-ক্-ই) অন্তর্গত তিনটি স্বরধ্বনিসমেত 'ম্-ক্' ব্যঞ্জনগুচ্ছ পুনরাবৃত্ত হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

(ii) অমি নাব মহাকাব্য সংরচনে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : প্রথম দুটি পর্বের শেষে 'আর্‌ব' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

মন্তব্য : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ব্‌-ব'-এর ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থেকে ছেকানুপ্রাসও হয়েছে।

(i) তবে

একদিন কবে —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : এ উদাহরণে আছে দুটি পঙক্তি (line)। এর কোনোটিই চরণ নয়, পদ বা পর্বও নয়। এদের শেষে 'অবে' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

('বলাকা' কাব্যে এ-ধরনের কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে পঙ্‌ক্তিশেষে অন্ত্যানুপ্রাস রচনা করে গেছেন।)

■(চ) সর্বানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এখানে প্রতিটি চরণে তিনটি করে শব্দ। প্রথম শব্দযুগল 'গগনে-চরণে', দ্বিতীয় শব্দযুগল 'ছড়ায়ে জড়ায়ে' এবং তৃতীয় শব্দযুগল 'এলোচুল-বনফুল'—এই তিনটি শব্দযুগলে যথাক্রমে 'অঅনে', 'অড়ায়ে' এবং 'উল' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এভাবে সর্বানুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

(ii) সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা। —যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : 'অন্ধ্যা', 'উকের', 'ঔরবী', 'আশা' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি।

৩৯.৩.২ যমক

সংজ্ঞা : একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার।

(ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। ধ্বনিগুচ্ছে স্বরধ্বনি থাকবে, ব্যঞ্জনধ্বনিও থাকবে।

২। বাংলায় সমধ্বনির (ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, শ-ষ-স) উচ্চারণে পার্থক্য নেই। অতএব যমকে সমধ্বনির প্রয়োগ হতে পারে। যেমন—রবি-রবী, বঁধু-বধূ, ঋণী-রিণী, জেতে-যেতে, আশা-আসা।

৩। ধ্বনির পরিবর্তন হলে যমক থাকবে না, অনুপ্রাস হয়ে যেতে পারে। যেমন—'ধানের শীষে আগুনের শীষ' যমক (শীষ-শীষ), কিন্তু 'ধানের শিষের উপরে শিশির' অনুপ্রাস (শিষের-শিশির—স্বরধ্বনির পরিবর্তন), 'পূরবীর রবি' যমক (রবী-রবি), কিন্তু 'পূরবীর ছবি' অনুপ্রাস (রবী-ছবি—ব্যঞ্জনের পরিবর্তন)।

৪। ধ্বনিগুচ্ছের একাধিক উচ্চারণ হবে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে। বিন্যাস-ক্রমের পরিবর্তন হলে যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন—'যৌবন বন' যমক, কিন্তু 'যৌবন নব' অনুপ্রাস।

৫। ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিক উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চারণেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অর্থযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছের নাম শব্দ। অতএব এটি হবে একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ, কিন্তু একই অর্থে নয়। এর নাম সার্থক যমক।

৬। ধ্বনিগুচ্ছের সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিক উচ্চারণ হতে পারে। এর অর্থ, ধ্বনিগুচ্ছের একবার সার্থক বা অর্থযুক্ত উচ্চারণ, অন্যবার নিরর্থক বা অর্থহীন উচ্চারণ। অর্থাৎ, একবার শব্দের উচ্চারণ, অন্যবার শব্দাংশের উচ্চারণ। এর নাম নিরর্থক যমক।

৭। ৫ম-৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা গেল, ধ্বনিগুচ্ছের একটি প্রয়োগ অর্থযুক্ত হবেই, অন্যপ্রয়োগ অর্থযুক্ত বা অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি প্রয়োগেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থহীন হতে পারে না, হলে তা যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন, 'সৌরভ-রভসে'। এখানে 'রভ' ধ্বনিগুচ্ছ দুবারই উচ্চারিত হয়েছে নিরর্থক শব্দাংশ হিসেবে। অতএব, এটি যমক নয়, অনুপ্রাস।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—

  (ক) সার্থক যমক ; (খ) নিরর্থক যমক।

- প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের—

  (গ) আদ্যযমক ; (ঘ) মধ্যযমক ; (ঙ) অন্ত্যযমক ; (চ) সর্বযমক।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■ **(ক) সার্থক যমক :**

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম সার্থক যমক।

উদাহরণ :

১. একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই শব্দ 'কীর্তিবাস' দুবার উচ্চারিত। প্রথম 'কীর্তিবাস' এখানে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস অর্থে ভুল বানানে লেখা, দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' অর্থ কীর্তির বসতি যেখানে। অতএব, এটি সার্থক যমক।

(ii) টেবিলেতে ভালো করে দিয়েছিস বার্নিস ?
দাম চাস্ ? আজ নয়, মঙ্গল-বার নিস্। —উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সংকেত : 'বার্নিস' (চকচমে করার জন্য প্রলেপ) আর 'বার নিস্' (ওই দিনে নিয়ে যাস্) একই শব্দ না হলেও উচ্চারণে এক, অথচ অর্থে ভিন্ন।

২. সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) যেতে নারি জেতে নারী আমি হে —ঈশ্বর গুপ্ত

ব্যাখ্যা ঃ 'যেতে নারি' 'জেতে নারী'—এই দুটি শব্দযুগল সমধ্বনিযুক্ত, একই শব্দযুগলের পুনরাবৃত্তি নয়। 'জেতে-যেতে' শব্দদুটিতে জ-য সমব্যঞ্জন, আবার 'নারি-নারী' শব্দদুটিতে ই-ঈ সমস্বর। এই সমস্বর আর সমব্যঞ্জনের সহযোগে উচ্চারিত শব্দযুগল উচ্চারণে এক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে—'যেতে নারি' অর্থ 'যেতে পারি না', 'জেতে নারী' অর্থ 'জাতিতে স্ত্রীলোক'। অতএব, এটি সার্থক যমকের উদাহরণ।

(ii) তিনখানা নোট আনে সে 'দশ টাকার'
কিছুতে বুঝিতে পারে না দোষটা কার। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত ঃ 'দশ টাকার' (অর্থমূল্য) আর 'দোষটা কার' (কার দোষ)। 'অশ্' (দশ) আর 'ওষ্' (দোষ) সমধ্বনিযুক্ত (অ-ও সমস্বর, শ-ষ সমব্যঞ্জন) দুটি শব্দযুগল। এদের উচ্চারণ এক, অর্থ আলাদা।

■ (খ) নিরর্থক যমক :

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম নিরর্থক যমক।

উদাহরণ :

(i) যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। —জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'বন' প্রথমে উচ্চারিত হয়েছে 'যৌবন' শব্দের অংশ হিসেবে। এখানে তার উচ্চারণ অর্থহীন বা নিরর্থক। ঐ 'বন' পরে উচ্চারিত হল একটি পূর্ণশব্দের মর্যাদা নিয়ে, যখন তার অর্থ হল 'অরণ্য'। এখানে তার উচ্চারণ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অতএব, এ উদাহরণ নিরর্থক যমকের।

(ii) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'রবি' ধ্বনিগুচ্ছ 'পূরবী' শব্দের অংশ, অতএব নিরর্থক। 'রবি' স্বতন্ত্র শব্দ, অতএব সার্থক। 'রবী: আর 'রবি' মূলত একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ (র-ব), সমস্বরধ্বনি 'ঈ' আর 'ই'-র সহযোগে তাদের গঠন। এই দুটি ধ্বনিগুচ্ছের একই উচ্চারণ। সুতরাং, এটি নিরর্থক যমক।

■ (গ) আদ্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে। —ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : 'ভারত' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ 'কবি ভারতচন্দ্র রায়' অর্থে, দ্বিতীয় প্রয়োগ 'ভারতবর্ষ' অর্থে। অতএব এটি সার্থক যমক। যমকটি হয়েছে উদ্ধৃত চরণের আদিতে। অতএব, এটি আদ্যযমক।

■ **(ঘ) মধ্যযমক :**

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা। —ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : প্রথম 'তরি' অর্থ নৌকা, দ্বিতীয় 'তরি' অর্থ পার হই। এটি সার্থক যমক। যমকটি চরণের মাঝখানে রয়েছে। অতএব, এটি মধ্যযমকের উদাহরণ।

■ **(ঙ) অন্ত্যযমক :**

সংজ্ঞা : পদ্যে একটি বা পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক।

উদাহরণ :

মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়। —জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : একই শব্দ 'হয়' চরণের শেষে দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থে—প্রথম অর্থ ঘোড়া, দ্বিতীয় অর্থ 'হয়ে যায়'। অতএব এটি সার্থক যমক, এবং চরণের শেষে রয়েছে বলে অন্ত্যযমক।

■ **(চ) সর্বযমক :**

সংজ্ঞা : একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ চরণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারিত হলে যে বাক্যগত শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সর্বযমক।

উদাহরণ :

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।

কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে।।

ব্যাখ্যা : প্রথম চরণে 'কান্তার' অর্থ বনভূমি, 'আমোদ' অর্থ সৌরভ, 'কান্ত' অর্থ বসন্তকাল আর 'সহকারে' অর্থ সমাগমে। দ্বিতীয় চরণে 'কান্তার' অর্থ প্রিয়তমার, 'আমোদ' অর্থ আনন্দ, 'কান্ত' অর্থ প্রিয়তম, 'সহকারে' অর্থ সঙ্গে। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারণে প্রতিটি শব্দেই একটি করে সার্থক যমক হয়েছে। আবার সামগ্রিকভাবে প্রথম চরণের অর্থ—বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ, দ্বিতীয় চরণের অর্থ—প্রিয়তমের সঙ্গলাভে প্রিয়তমার আনন্দ সম্পূর্ণ। অতএব, এটি বাক্যগত সার্থক যমক এবং সর্বযমক।

৩৯.৩.৩ সংশ্লেষ (শব্দশ্লেষ)

সংজ্ঞা : একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ (শব্দশ্লেষ) অলঙ্কার।

(একটি শব্দের একবার ব্যবহারে একাধিক অর্থ বোঝালে শ্লেষ।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

২। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

প্রকারভেদ

● বাংলায় শ্লেষ বলতে শব্দ শ্লেষকেই বোঝায়। এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের—

(ক) অভঙ্গা শ্লেষ (খ) সভঙ্গা শ্লেষ।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ **(ক) অভঙ্গা শ্লেষ :**

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম অভঙ্গা শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই চরণটিতে বিদায়-মুহূর্তে কবি মধুসূদন মাতৃভূমির কাছে বিস্মৃত না হবার যে আবেদন রাখছেন, সেই প্রসঙ্গে 'মধু' শব্দটিকে দুটি অর্থে তিনি প্রয়োগ করছেন। প্রথম অর্থ 'কবি মধুসূদন দত্ত', দ্বিতীয় অর্থ 'মউ'। একটি প্রয়োগে শব্দটিকে না ভেঙেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল। অতএব, এটি অভঙ্গা শ্লেষ।

(i) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের ষাট-বছর পেরিয়ে যাওয়া কবি তাঁর আয়ুষ্কার ফুরিয়ে আসার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূরবী' আর 'রবি' শব্দ দুটি দুটি করে অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'পূরবী'র একটি অর্থ কবির নিজের লেখা 'পূরবী' কাব্য, আর-একটি অর্থ 'সূর্য'। দুটি শব্দেরই দুটি করে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে শব্দদুটিকে না ভেঙে এবং একবার মাত্র উচ্চারণ করে। অতএব, এখানকার অলংকার অভঙ্গা শ্লেষ।

মন্তব্য : 'পূরবী আর 'রবি' শব্দের শ্লেষ গোটা বাক্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাক্যটির প্রথম অর্থ, 'পূরবী-কাব্যের ছন্দে রবীন্দ্রনাথের জীবন-শেষ হয়ে আসার করুণ ভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে।' দ্বিতীয় অর্থ, 'পূরবী রাগিণীর করুণ সুরে বীণা বাজছে সূর্যাস্তের মুহূর্তে। অন্যদিকে, 'পূরবী'র নিরর্থক অংশ 'রবী' আর সার্থক 'রবি'—এই দুটি শব্দ শব্দাংশ দিয়ে নিরর্থক যমক অলংকারও তৈরি হয়েছে।

■ **(খ) সভঙ্গা শ্লেষ :**

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভঙ্গা শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মুলতানে
গুঞ্জন তার রবে চিরনি, ভুলে যাবে তার মানে।

ব্যাখ্যা : 'রোগশয্যায়' কাব্য থেকে উদ্ধৃত অংশের প্রথম চরণে 'মূলতান' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন দুটি অর্থে। প্রথম অর্থ 'সূর্যাস্তকালীন রাগিণীবিশেষ'—এটি অখণ্ড 'মূলতান' শব্দেরই অর্থ। 'মূলতান' শব্দটিকে 'মূল' আর 'তান' এই দুটি অংশে ভাঙলে যে অর্থটি মেলে তা এই—'বিশ্ববীণার মুল বা উৎস-তন্ত্রীতে আনন্দের যে তান বা সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে।' প্রথমে না ভেঙে একটি অর্থ, পরে ভেঙে আর-একটি অর্থ 'মূলতান' শব্দটি থেকে পাওয়া গেল। অতএব, এটি সভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

(ii) অপরূপ রূপ কেশবে —দাশরথি রায়

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'কেশবে' শব্দটিকে না ভাঙলে এর অর্থ কৃষ্ণ। শব্দটিকে 'কে' - 'শবে' এই দুটি অংশে ভাঙলে এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায়—'মৃতদেহের ওপর কে ?' এর নিহিত অর্থ 'শবরূপী শিবের ওপর দাঁড়িয়ে যে নারী, তিনি কে ?' এর উত্তর 'কালী'। আর 'কেশবে' অর্থ কৃষ্ণ। 'কেশবে' শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ আর ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া গেল বলে এটি সভঙ্গ শ্লেষ।

৩৯.৩.৪ বক্রোক্তি

সংজ্ঞা : যেখানে বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে বাঁকাভাবে অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলা হয়, অথবা বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেখানে কণ্ঠভঙ্গি অথবা শ্লেষের কারণে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এর নাম বক্রোক্তি অলংকার।

(বক্তা কোনো কথা ঘুরিয়ে বললে অথবা শ্রোতা কথাটির সহজ অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য অর্থ ধরলেই বক্রোক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। 'বক্রোক্তি' (বক্র + উক্তি) অর্থ বাঁকা কথা। কথায় সৌন্দর্য ফোটানোর লক্ষ্যেই এ বক্রতা আবশ্যক। উক্তির এই বক্রতা সৃষ্টির জন্য কবিরা দুটি কৌশল প্রয়োগ করেন—একটি 'কাকু' বা কণ্ঠভঙ্গি, আর একটি 'শ্লেষ' বা দ্ব্যর্থকতা (কথাটির দুটি অর্থ)।

২। বক্রোক্তির প্রথম লক্ষণ, বক্তার তরফে বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে বলা। 'কাকু' বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যেই কথায় বক্রতা আনা যেতে পারে। ভঙ্গিটা যদি এমন হয় যে, হাঁ-প্রশ্নবাক্য দিয়ে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্য দিয়ে হাঁ-বোধক বক্তবা প্রকাশ পায়, তাহলে হবে কাকু-বক্রোক্তি।

৩। বক্রোক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ, শ্রোতার তরফে বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, বক্তা যে কথাটি প্রয়োগ করেছেন তার দুটি অর্থ—একটি বক্তার অভিপ্রেত অর্থ, অন্যটি শ্রোতার গৃহীত অর্থ। অতএব, কথাটির প্রয়োগে শ্লেষ আছে। দেখা যায়, শ্লেষের সুযোগ নিয়ে শ্রোতা প্রতিবারই কথাটিকে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের দিকে টেনে নিচ্ছেন, অভিপ্রেত অর্থটি বারে বারে উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে বক্তা এবং শ্রোতার উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্য তৈরি হতে থাকে। এরই নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

প্রকারভেদ

● বক্রোক্তি দু-রকমের—

(ক) কাকু-বক্রোক্তি ; (খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি।

■ **(ক) কাকু বক্রোক্তি :**

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে কাকু বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির হাঁ-প্রশ্নবাক্যে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তার নাম কাকু-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

(i) রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত এই চরণদুটি হাঁ-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত। এর উত্তরে শ্রোতাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, প্রমীলা ভিখারি রাঘবকে একটুও ভয় করে না। উপলব্ধিটি না-বোধক। বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত হাঁ-প্রশ্নবোধক না-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পেল বলে এখানে কাকু-বক্রোক্তি হয়েছে।

(ii) মাতা আমি নহি ? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ? —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'গান্ধারীর আবেদন' থেকে উদ্ধৃত গান্ধারীর এই উক্তি না-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত ('নহি' 'বহি নাই')। স্নেহ-দুর্বল ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর বক্তব্য—তিনিও মা, দুর্যোধনকে গর্ভে বহন করার দুঃখ তিনি বরণ করেছেন। বক্তব্যটি হাঁ-বোধক। কিন্তু এটি প্রকাশ পেল বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত না-প্রশ্নবাক্য থেকে। অতএব, অলংকার এখানে কাকু-বক্রোক্তি।

■ **(খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি :**

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অন্য অনভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করেন, তার নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

বক্তা—দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন ?
শ্রোতা—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।
বক্তা—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?
শ্রোতা—সুরে না সেবিলে বল মুক্তি কিসে হয় ?

ব্যাখ্যা : বক্তার প্রথম কথায় 'দ্বিজ' এবং 'বারুণী' শব্দের দুটি করে অর্থ। 'দ্বিজ' শব্দের একটি অর্থ ব্রাহ্মণ এবং 'বারুণী'-র একটি অর্থ মদ। অতএব বক্তার অভিপ্রেত অর্থ—ব্রাহ্মণ হয়ে মদ খাও কেন ? 'দ্বিজ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ চাঁদ, 'বারুণী'-র অর্থ পশ্চিমদিক। শ্রোতার গৃহীত অর্থটি এইরকম—চাঁদ পশ্চিমদিকে যাচ্ছে কেন ? এই অর্থ ধরেই তার উত্তর—সূর্য উঠছে, তাই চাঁদ ডুবছে। এটি বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ। এইভাবে শ্রোতা শ্লেষের সুযোগে বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অনভিপ্রেত অন্য অর্থটি গ্রহণ করায় শ্লেষ-বক্রোক্তি হয়েছে।

বক্তার দ্বিতীয় বাক্যেও একইভাবে 'সুরাসক্ত' শব্দটিকে কেন্দ্র করে বক্রোক্তি হয়েছে। 'সুরাসক্ত' থেকে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ 'সুরায় আসক্ত' বা মদখোর (সুরা + আসক্ত), কিন্তু শ্রোতার গৃহীত অর্থ 'সুরে আসক্ত' বা দেবভক্ত (সুর + আসক্ত)। বক্তার এই অনভিপ্রেত অর্থটি ধরেই শ্রোতার উত্তর—দেবসেবা ছাড়া মুক্তি নেই। অতএব, এখানেও শ্লেষ-বক্রোক্তি।

৩৯.৪ সারাংশ

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটির অর্থ—'ধ্বনি' (sound) 'অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি' (word)। শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, ধ্বনিমাধুর্যই শব্দালংকার। তবে অর্থের চমক কখনো কখনো ধ্বনিমাধুর্যকে সহায়তা করে। যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ মধুর হয়ে উঠলে ধ্বনিমাধুর্য বা শব্দালংকার তৈরি হয়, তা একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, একটি শব্দ (word) বা 'অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি'র উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, একটি বাক্যের উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। সুতরাং, শব্দালংকারের 'শব্দ' মূলত ধ্বনিই—বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বা বাক্যধ্বনি। কবিতার একটি স্তবক বা একটি চরণের উচ্চারণ থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগের কৌশলে মধুর শোনায়, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার। বাংলা কবিতায় প্রধান শব্দালংকার চারটি—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি।

অনুপ্রাস : একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের একবারের বেশি উচ্চারণ অনুপ্রাস। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনধ্বনির একবারের বেশি উচ্চারণে (বিদায় বিষাদশ্রান্ত, চলচপলার চকিত চমকে), একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম না মেনে দুবার উচ্চারণে (কবরী-করবী), একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবারের বেশি উচ্চারণে (কুঞ্জর-গঞ্জি-মঞ্জুল, কল-কিল-কুল) **বৃত্ত্যনুপ্রাস**। একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণে **ছেকানুপ্রাস** (গন্ধ-অন্ধ, শিষের-শিশির)। শুনতে একই রকম কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে **শ্রুত্যনুপ্রাস** (চিকন-লিখন, ছন্দোবন্ধগ্রন্থ)।

প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকেও অনুপ্রাস তিন রকমের—আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস। কবিতার চরণের বা পর্বের শুরুতে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে **আদ্যানুপ্রাস** (বড়ো কথা শুনি...../জড়ো করে নিয়ে ....., নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া .....)। ছত্রের, চরণের বা পর্বের শেষে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে **অন্ত্যানুপ্রাস** (তবে/একদিন কবে,..... পুলকে চমকি/দাঁড়াবে থমকি, আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে)। দুটি চরণের প্রতিটি শব্দে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে **সর্বানুপ্রাস** (গগনে ছড়ায়ে এলোচুল/চরণে জড়ায়ে বনফুল)।

যমক : একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা একবার অর্থযুক্ত আর অন্যবার অর্থহীন উচ্চারণে যমক অলংকার। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—সার্থক যমক, নিরর্থক যমক। একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উচ্চারণে **সার্থক যমক** ('কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি .....' প্রথম 'কীর্তিবাস' = কৃত্তিবাস, দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' = যশস্বী)। একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে একবার অর্থযুক্ত আর একবার অর্থহীন উচ্চারণে নিরর্থক যমক (যৌবনের বনে.....' প্রথম 'বনে' অর্থহীন শব্দাংশ, দ্বিতীয় 'বনে' অর্থযুক্ত শব্দ)।

প্রয়োগ স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের—আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমক, সর্বযমক। কবিতার চরণের শুরুতে থাকলে আদ্যযমক (ভারত ভারতখ্যাত.....), মাঝখানে থাকলে মধ্যযমক (পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা), শেষে থাকলে অন্ত্যযমক (মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়), গোটা চরণ জুড়ে থাকলে সর্বযমক (কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে / কান্তারে আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে)।

শ্লেষ : একটি শব্দের একবার উচ্চারণে একের বেশি অর্থ বোঝালে শ্লেষ। শ্লেষ দু-রকমের—অভঙ্গা শ্লেষ, সভঙ্গা শ্লেষ। শব্দ না ভেঙে একের বেশি অর্থ পাওয়া গেলে **অভঙ্গা শ্লেষ** (মধুহীন করো নাগো তব মনঃ কোকনদে। 'মধু' =কবি মধুসূদন দত্ত, মউ।) শব্দ না ভেঙে একটি অর্থ, ভেঙে আর একটি অর্থ পাওয়া গেলে **সভঙ্গা শ্লেষ** (অপরূপ রূপ কেশবে। 'কেশবে' =কৃষ্ণে, 'কে শবে' ='মৃতদেহের ওপর কে ?')।

বক্রোক্তি : কোনো কথা বাঁকাভাবে বললে অথবা কথার অর্থ বাঁকাভাবে ধরলে বক্রোক্তি। বক্রোক্তি দু-রকমের—কাকু-বক্রোক্তি, শ্লেষ-বক্রোক্তি। 'কাকু' বা কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে 'হাঁ' বোঝাতে 'না' অথবা 'না' বোঝাতে 'হাঁ', বললে কাকু-বক্রোক্তি ('মাতা আমি নহি ?' =আমিও তো মা, 'আমি কি ডরাই ?' = আমি মোটেই ডরাই না)। শ্লেষের (কথার দুটি অর্থের) সুযোগ নিয়ে সুবিধাজনক অর্থটি ধরলে শ্লেষ-বক্রোক্তি ('বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন' = 'বামুন হয়ে মদের নেশা কেন,' 'ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবভক্তি কেন।' সুবিধাজনক দ্বিতীয় অর্থটি ধরে মদখোর ব্রাহ্মণের জবাব—'দেবসেবা ছাড়া কারো মুক্তি নেই')।

৩৯.৫ অনুশীলনী

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ২৮৬-এর উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. শব্দালংকার বলতে কী বোঝায়, সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার, অর্থের অলংকার নয়।

৩. প্রধান চারটি শব্দালংকারের নাম এবং তাদের বিভাগগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—ছেকানুপ্রাস, নিরর্থক যমক, অভঙ্গা শ্লেষ, কাকু-বক্রোক্তি।

৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) পৃথিবী টাকার বশ !

(খ) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।

(গ) ধরি তার কর দুটি আদেশ পাইলে উঠি।

(ঘ) লঙ্গার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।

(ঙ) কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি।

৬. সঠিক অলংকার কোনটি, লিখুন—

(ক) কবির বুকের দুখের কাব্য—ছেকানুপ্রাস না বৃত্ত্যানুপ্রাস ?

(খ) আর কি শুধু আসার আশায় থাকি—যমক না ছেকানুপ্রাস ?

(গ) একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু—যমক না ছেকানুপ্রাস ?

একক ৪০ ❐ অর্থালংকার

গঠন

৪০.১ উদ্দেশ্য
৪০.২ প্রস্তাবনা
৪০.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়
৪০.৪ সারাংশ-১
৪০.৫ অনুশীলনী-১
৪০.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার
৪০.৬.১ উপমা
৪০.৬.২ রূপক
৪০.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা
৪০.৬.৪ সমাসোক্তি
৪০.৬.৫ অতিশয়োক্তি
৪০.৬.৬ ব্যতিরেক
৪০.৭ সারাংশ-১
৪০.৮ অনুশীলনী-২
৪০.৯ মূলপাঠ-৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি
৪০.৯.১ বিরোধমূলক : বিরোধাভাস (বিরোধ)
৪০.৯.২ শৃঙ্খলামূলক : একাবলি
৪০.৯.৩ ন্যায়মূলক : অর্থান্তরন্যাস
৪০.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক : ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি
৪০.১০ সারাংশ-৩
৪০.১১ অনুশীলনী-৩

৪০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন, তাহলে—

- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকের অর্থে নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো বোধ ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠবে।
- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকে বা বাক্যে বা শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার দক্ষতা কবি কতটা দেখাতে পারলেন, তা বিচার করা সম্ভব হবে।
- বাংলা কবিতার স্তবকে বাক্যে শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার নানারকম কৌশল কবিরা কীভাবে প্রয়োগ করে থাকেন, তা অনুসরণ করা ক্রমশ সহজ হবে।

৪০.২ প্রস্তাবনা

একক ৫ থেকে অলংকারের যে দুটি মূলবিভাগের কথা জেনেছিলেন, তার প্রথমটির (শব্দালংকার) পরিচয় পেলেন একক ৬-এ। একক ৭-এ পাবেন দ্বিতীয় বিভাগটির পরিচয়। এ বিভাগটির নাম অর্থালংকার।

এসব অলংকার তৈরি হয় কবিতার মনস্ক পাঠকের বোধে—তাঁর মনে-মস্তিষ্কে। বিভাগটি আয়তনে শব্দালংকারের তুলনায় অকেনটাই বড়ো, অনেক তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখা। সেই কারণে, মূলপাঠকে তিনটি অংশ ভাগ করে নেওয়া হল।

প্রথম অংশে অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার আর তার অন্তর্গত কয়েকটি শ্রেণির পরিচয়, তৃতীয় অংশে অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণির পরিচয় সংক্ষেপে সাজিয়ে দেওয়া হল। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাসঙ্গিক অলংকারের ব্যাখ্যা করা হল।

৪০.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়

স্তবক বা তার অন্তর্গত চরণ বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাহলে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। 'অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে' বলতে এই বোঝাতে চাই, বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। একটি উদাহরণ থেকে অর্থালংকারের এই স্বভাবটা বুঝে নেওয়া যাক :

'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে
গগনের নীলগাঙে।'

'মেঘের মউজ'-এর অর্থ 'মেঘের ঢেউ', 'গগনের নীলগাঙ'-এর অর্থ 'আকাশের নীলরঙা নদী।' এই অর্থের ওপর নির্ভর করেই দুটি শব্দগুচ্ছ মিলেমিশে একটি দৃশ্য রচনা করেছে নীল আকাশের বুকে। সে-দৃশ্য মেঘের খেলার পাশাপাশি ঢেউ-তোলা নদীর। যে নদীর দৃশ্য মাটির ওপরে দেখতেই দ্রষ্টা অভ্যস্ত, কবি কল্পনার জোরে তাঁর মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন নীল আকাশের মেঘের খেলার দিকে, সেই আকাশের বুকে পাশাপাশি দেখিয়ে দিলেন ঢেউ-তোলা নদীর দৃশ্যটি। কল্পানার চোখে দেখা এই দৃশ্যের সৌন্দর্যই অলংকার, এ অলংকারটি তৈরি দল অর্থের ওপর নির্ভর করেই। অতএব, এটি অর্থালংকার। অলংকারটি যে কেবল অর্থের ওপরই নির্ভর করছে, শব্দের ওপর নয়—তা বোঝা যাবে, যদি দেখি, বাক্যটির অর্থ ঠিকঠাক রেখে দুটো-একটা শব্দ বদলে দিলেও অলংকারটি বেঁচে গেল।

প্রথমে দেখা যাক 'মউজ' আর 'গগন' শব্দদুটির বদলে একই অর্থের 'ঢেউ' আর 'আকাশ' বসিয়ে। তাহলে কথাটি দাঁড়াবে এই :

'কোদালে মেঘের ঢেউ উঠেছে
আকাশের নীলগাঙে।'

দেখা যাচ্ছে, মেঘের খেলা থামে নি, 'গগন' 'আকাশ' হয়েও তার বুকে নীলরঙা নদীটি বইয়ে দিয়েছে আগের মতোই, 'মউজ'-এর সৌন্দর্য 'ঢেউ' উঠেছে বলে এতটুকু কমে নি। অর্থাৎ, 'মউজ-গগনে'র তৈরি অর্থসৌন্দর্য 'ঢেউ-আকাশে'ও অব্যাহত। এই অর্থসৌন্দর্যই তো অর্থালংকার। শব্দ বদলালেও অর্থ বদলায়নি, অলংকারও সরে যায়নি।

একটু দেখে নিই শব্দবদলের অন্য পরিণাম। শব্দবদলের আগে 'মেঘের মউজ' আর 'গগনের গাঙ' শব্দগুচ্ছ-দুটির মধ্যে অর্থালংকারের একটুখানি আড়াল থেকে উঁকি মারছিল একটি শব্দালংকার। 'মেঘের মউজ'-এ ম-ধ্বনির দুবার এবং 'গগনের গাঙ'-এ গ-ধ্বনির তিনবার উচ্চারণে ধ্বনিমাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি শব্দালংকার। কিন্তু, শব্দবদলের পরে 'মেঘের মউজ' যখন 'মেঘের ঢেউ' হল, তখন ম-ধ্বনিটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। তেমনি, 'গগনের গাঙ'-এর বদলে 'আকাশের গাঙ' আসার ফলে গ-ধ্বনির গাঙটিও শুকিয়ে গেল। অর্থাৎ, একই সঙ্গে ম-ধ্বনি আর গ-ধ্বনির শব্দালংকারটি হারিয়ে গেল। শব্দবদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দালংকারের এই অপমৃত্যু জানিয়ে দিল, শব্দবদল এ অলংকারের পক্ষে অসহ্য। অথচ, অর্থালংকার একটু আগেই তা সহ্য করেছে।

অর্থালংকার শব্দবদল সহ্য করে ততক্ষণ, যতক্ষণ বদলে-যাওয়া শব্দের অর্থটুকু অক্ষত থাকে। এটাই দেখা গেল 'মউজ' থেকে 'ঢেউ' আর 'গগন' থেকে 'আকাশ'-এর বদলে। এবারে 'মউজ উঠেছে'-র 'টুকরো ছড়ানো' আর 'গাঙে'-র বদলে 'রঙে' বসিয়ে দেখা যাক, সঙ্গে সঙ্গে অর্থবদল ঘটলে তার পরিণাম কী ঘটে :

'কোদালে মেঘের টুকরো ছড়ানো
গগনের নীলরঙে।'

দেখতে পাচ্ছি, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ছড়ানো থাকলেও তার খেলা নেই, অর্থবদলের আগে ঢেউ-তোলা নদীর যে দৃশ্য আকাশে রচনা করেছিল অর্থালংকার, 'মউজ' আর 'গাঙ' তাদের অর্থ নিয়ে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা অদৃশ্য। আকাশের গায়ে পড়ে রইল এদিক-ওদিকে ছড়ানো কয়েক টুকরো মেঘ—তার রং নেই, কোনো আকর্ষণ নেই, তার গায়ে কোনো অলংকারই নেই—না শব্দালংকার, না অর্থালংকার। শব্দবদলে শব্দালংকারের লোপ, অর্থবদলে অর্থালংকারের লোপ। অর্থাৎ, শব্দ না টিকলে শব্দালংকার বাঁচে না, অর্থালংকার বাঁচতে পারে। কিন্তু, শব্দের সঙ্গে অর্থও সরে গেলে শব্দালংকারের সঙ্গে অর্থালংকারের সহমরণ ঘটে।

অতএব, শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য মূল তিনটি :

১. শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, অর্থালংকার অর্থের অলংকার—প্রথমটি ধ্বনির মাধুর্য, দ্বিতীয়টি অর্থের সৌন্দর্য।

২. শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে, অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।

৩. শব্দালংকার শব্দের বদল সহ্য করে না, শব্দবদলে এর অপমৃত্যু। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে ; শব্দ-অর্থ দুই-ই বদলে গেলে অর্থালংকারেরও অপমৃত্যু।

সংস্কৃত কাব্যে যেসব অর্থালংকারে সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সংখা অনেক। বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ তুলনায় অনেকটা সীমিত। যে কটি লক্ষণ অলংকারগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করছে, সেগুলি এইরকম—সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায় আর গূঢ়ার্থপ্রতীতি। নামগুলি সংস্কৃত আলংকারিকেদের দেওয়া।

৪০.৪ সারাংশ

কবিতার স্তবক বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তবে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। অর্থালংকার অর্থের অলংকার—অর্থের সৌন্দর্য। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে। অর্থ বদলে গেলে অর্থালংকার বাঁচে না। অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণি—সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক, গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক।

৪০.৫ অনুশীলনী-১

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ২৮৭-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. অর্থালংকার বলতে কী বোঝায় ? সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—অর্থালংকার অর্থেরই অলংকার, শব্দের (ধ্বনির) অলংকার নয়।

৩. শব্দালংকার আর অর্থালংকারের মূল পার্থক্য কী কী লিখুন।

৪. অর্থালংকারের শ্রেণিগুলির নাম লিখুন।

৪০.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

দুটি বস্তুর সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা একটিকে আর একটির সঙ্গে তুলনা করে থাকি। বলি, সতীর চোখদুটি শীলার চোখের মতো 'উজ্জ্বল' অথবা দার্জিলিঙের পাহাড় সিমলার মতো 'সুন্দর নয়' ইত্যাদি। এসব কথায় কোনো সৌন্দর্য নেই, অলংকার নেই। কিন্তু যদি বলি, 'ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়', 'বাচ্চাটি ফুলের চেয়েও সুন্দর', তা হলে মনে মনে লাফিয়ে চলা ছেলেটার পাশে একটা ব্যাং-কেও লাফাতে দেখব, বাচ্চাটির মুখ তখন ফুল হয়ে ফুটে উঠবে। অর্থাৎ ছেলেটার চলন আর বাচ্চাটির চেহারা এক-একটা ছবি হয়ে উঠবে আমাদের মনের চোখে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার। সাদৃশ্য এর লক্ষণ। সতীর চোখ, দার্জিলিঙের পাহাড় ছবি হয়ে ওঠেনি, তার কারণ, একজনের চোখের তুলনা হল আর-একজনের চোখেরক সঙ্গে, ঐ পাহাড়টাকে তুলনা করা হল আর একটা পাহাড়ের সঙ্গে—অর্থাৎ, সদৃশ দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা। এমন তুলনায় সৌন্দর্য নেই, অলংকারও নেই। অন্যদিকে, ছেলেটা ব্যাং বাচ্চাটি ফুল—এরা বিসদৃশ বলেই এদের তুলনায় সৌন্দর্য বা অলংকার হয়। এমনটা কেন হয় ? দার্জিলিং-সিমলা সুন্দর হয়েও অলংকার পেল না, ছেলেটা ব্যাঙের মতো কুৎসিত লাফিয়েও অলংকার পেল কোন জাদুতে ? এর কারণ, দার্জিলিং-সিমলার মতো সদৃশ বস্তুর তুলনায়

কল্পনার প্রয়োজন নেই, যে দেখেছে সেই তুলনা করতে পারে তার অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে। কিন্তু ছেলেটা-ব্যাংটার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা একটা আবিষ্কারের মতো দুরূহ কাজ। এ কাজে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সেই কল্পপনার জোরেই কেউ আকাশের চাঁদে ধান-কাটা কাস্তের সাদৃশ্য খুঁজে পান, কেউ পূর্ণিমার চাঁদে ঝলসানো রুটি দেখতে পান। এঁারা নিতান্ত বিসদৃশ দুটি বস্তুর মধ্য থেকে এমন-এমন সূক্ষ্ম সাদৃশ্য বের করে আনেন, সেই সাদৃশ্য দিয়ে এমন-এমন কথার ছবি নির্মাণ করেন, যা পাঠকের মনকে সৌন্দর্যে বিস্ময়ে ভরে দেয়। তখনই গড়ে উঠে সাদৃশ্যমূলক অলংকার। কালিদাসের, রবীন্দ্রনাথের, মধুসূদনের কাব্য-কবিতা এই গুণেই এতো মহৎ—এক-একটি কাব্য যেন এক-একটি চিত্রশালা।

অতএব, অলংকার-নির্মাণের জন্য যে-সাদৃশ্য কবিরা খোঁজেন, তার মূল শর্তই হল দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান। বস্তুদুটি বাইরে থেকে যত বেশি বিসদৃশ বা বিজাতীয় হবে, সাদৃশ্য তত বেশি সূক্ষ্ম হবে, অলংকার তত আকর্ষক হবে। এই সাদৃশ্য কবিরা প্রধানত তিনটি উপায়ে দেখিয়ে থাকেন :

১. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়েও তাদের জন্য সমান মূল্য বরাদ্দ।

২. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা।

৩. বস্তুদুটির পার্থক্য বা ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া।

তিনটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক :

১. ননীর মত শয্যা কোমল পাতা।

২. আসল কথাটা চাপা দিতে, ভাই, কাব্যের জাল বুনি।

৩. এলো ওরা / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে।

প্রথম উদাহরণে 'ননী' আর 'শয্যা' এই দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য। 'মত' শব্দটির প্রয়োগ বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'ননী' আর 'শয্যা' পৃথক দুটি বস্তু, এদের পার্থক্য আকারে আয়তনে জাতিতে। একই বস্তু হলে 'মত' শব্দ দিয়ে ব্যবধান তৈরি করতে হত না। অতএব, পার্থক্য পুরোপুরি মানা হল। এই 'মত' শব্দটিই আবার জানিয়ে দিচ্ছে—ননী কোমল, শয্যা ও কোমল। 'কোমলতা' গুণটি দুটি বস্তুতেই সমান, তাই বস্তুদুটির মূল্যও গুণের দিক থেকে সমান। অতএব, সমান মূল্যও বরাদ্দ হল 'ননী' আর 'শয্যা'র জন্য।

দ্বিতীয় উদাহরণে 'কাব্য' আর 'জাল'-এর মধ্যে সাদৃশ্য। বস্তুদুটি অবশ্যই বিসদৃশ, পুরোপুরি পৃথক। 'কাব্য' কবির লেখা, হয়তো মুদ্রিত একখানি বই—পড়ে আছে পড়ার টেবিলে। 'জাল' সুতো দিয়ে বোনা, হয়তো ছড়ানো আছে নদী-পুকুরের বুকে, মাছের প্রতীক্ষায়। কিন্তু এই পার্থক্যটা পুরোপুরি আড়ালে রেখে কবি 'কাব্য' আর 'জান'-কে এক করে দিলেন। কাব্য আর কাব্য রইল না, জাল হয়ে গেল। কলম ছেড়ে দিয়ে কবি সুতো তুলে নিলেন হাতে, বুনতে থাকলেন,জাল-কাব্যের জাল। এইভাবে তৈরি হল 'কাব্য' আর 'জালে'র অভেদ—কল্পনা।

তৃতীয় উদাহণে 'ওরা' মানে ইংরেজ, 'তোমার নেকড়ে' মানে আফ্রিকার নেকড়ে। ইংরেজদের নখ তীক্ষ্ণ, নেকড়ের নখও তীক্ষ্ণ। কিন্তু তীক্ষ্ণতা দুদিকে সমান নয়। ইংরেজের নখ বেশি তীক্ষ্ণ—এই কথাটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে ইংরেজের সঙ্গে নেকড়ের পার্থক্য বা ভেদ। এই ভেদের ওপরই জোর দেওয়া হল 'চেয়ে' শব্দটি প্রয়োগ করে।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ বা অবয়ব :

১. যা তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু।

২. যার সঙ্গে তুলনা।

৩. যে-ধর্ম দুটি বস্তুতেই থাকে এবং বস্তুদুটিকে তুলনীয় করে।

৪. যে ভঙ্গিতে তুলনা করা হয়।

প্রথমটি উপমেয়, দ্বিতীয়টি উপমান, তৃতীয়টি সাধারণ ধর্ম, চতুর্থটি ভঙ্গি।

উদাহরণ ব্যাখ্যা করে অঙ্গ-চারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক :

'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !' —রবীন্দ্রনাথ

'রক্ত' আর 'জবাফুল'—এই দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য সন্ধান করে অলংকার তৈরি হয়েছে উদ্ধৃত উদাহরণে। অতএব, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার। বাক্যটিতে তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু 'জবাফুল।' 'এও' নির্দেশক সর্বনাম নির্দেশ করছে দুটি জবাফুল-কেই। কবির বক্তব্য জবাফুল নিয়েই, জবাফুল দুটি যে টুকটুকে লাল, এটাই কবি বলতে চান। অতএব, 'জবাফুল' প্রথম অঙ্গ—উপমেয়। জবাফুলের তুলনা হয়েছে রক্তের সঙ্গে। রক্ত যে কত লাল, তা সবার জানা আছে। সেই কারণেই রক্তের সঙ্গে তুলনা। অতএব, 'রক্ত' দ্বিতীয় অঙ্গ—উপমান।

রক্ত রাঙা, জবাফুলও রাঙা। রাঙা হওয়ার ধর্ম রক্তেও আছে জবাফুলেও আছে এবং এই ধর্মই জবাফুলকে তুলনীয় করেছে রক্তের সঙ্গে। অতএব, 'রাঙা' বিশেষণটিতে আছে এ শ্রেণির অলংকারের তৃতীয় অঙ্গ—সাধারণ ধর্ম।

'মতো' অব্যয়টি উপমান 'রক্ত'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে উপমেয় 'জবাফুল' আর উপমান 'রক্ত'কে বেঁধে রেখেছে একটি বাক্যে। এই বাঁধন-প্রক্রিয়াতেই ভিন্ন গোত্রের দুটি শব্দ জবাফুল-রক্ত একই বাক্যের মধ্যে ধরা দিল, 'মতো'-র ইঙ্গিতে বিসদৃশ বস্তুদুটি সদৃশ হিসেবে চিহ্নিত হল। অতএব, সাদৃশ্যবাচক 'মতো' অব্যয়ের সংযোজন ক্রিয়াটিই এ শ্রেণির অলংকারের চতুর্থ অঙ্গ-ভঙ্গি, সাদৃশ্য-প্রকাশের বিশেষ পদ্ধতি।

অর্থালংকারের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যমূলকে। ওই বৈচিত্র্য নির্ভর করে মূলত ভঙ্গির ওপর। কীভাবে ভঙ্গির ওপর অলংকারটি টিকে থাকছে, দেখা যাক। আগের পাতায় উদ্ধৃত উদাহরণটিতে যে অলংকার হয়েছে, তার নাম 'উপমা' (একে একে অলংকারগুলির আলোচনা এর পরেই হবে)। এর অন্তর্গত উপমেয়-উপমান-সাধারণ ধর্ম—এই তিনটি অঙ্গের পরিবর্তনেও 'উপমা' উপমাই থাকবে :

মূল উদাহরণ—'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !'

পরিবর্তিত উদাহরণ—'এও যে দুধের তো সাদা, দুটি কাশফুল !'

এ দুটি উদাহরণের অলংকার যে একই, তা আন্দাজ করা যায়। এবারে ভঙ্গির পরিবর্তন করে দেখা যাক কী ঘটে :

	ভঙ্গি	ভঙ্গির চিহ্ন	উদাহরণ	অলংকার
১.	উপমানের সঙ্গে সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ।	'মতো'	'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল!'	উপমা
২.	অভেদ-আরোপে উপমেয়-উপমান পাশাপাশি	'জবাফুলের রক্তলেখা'	'জবাফুলের রক্তলেখায় রাঙা চরণদুটি!'	রূপক
৩.	উপমানের সঙ্গে সংশয়বাচক শব্দের প্রয়োগ	'যেন'	'এও দুটি জবাফুল, যেন দুটি রাঙা রক্তাধার।'	উৎপ্রেক্ষা
৪.	উপমানের অনুল্লেখে একমাত্র উপমেয়	'জবা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা,	'জবা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা দেবীর চরণতলে।'	সমাসোক্তি
৫.	উপমেয়ের অনুল্লেখে একমাত্র উপমান	—'রক্ত'	'রাঙা রক্তের অঞ্জলিতে মায়ের পূজা হবে!'	অতিশয়োক্তি
৬.	সাদৃশ্যবাচক শব্দ + না-বোধক শব্দ = ভেদের প্রয়োগ	'মতো নয়'	'রক্ত এত রাঙা নয়, জবাফুলের মতো'	ব্যতিরেক

ওপরের আটটি উদাহরণ মূলত একই বাক্যের আটটি পরিবর্তিত রূপ। এ পরিবর্তন কেবল ভঙ্গির। উপমেয় (জবাফুল), উপমান (রক্ত), সাধারণ ধর্মের (রাঙা) কোনো পরিবর্তন নেই। আটটি ভঙ্গি থেকে পৃথক আটটি অলংকারের জন্ম, প্রতিটি অলংকারই সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের এক-একটি রূপ।

৪০.৬.১ উপমা

সংজ্ঞা : একই বাক্যে বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উপমা অলংকার।

(বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেই উপমা)

বৈশিষ্ট্য :

১। একটিমাত্র বাক্য থাকবে।

২। দুটি বিজাতীয় বা বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে তুলনা হবে (উপমেয়-উপমান)।

৩। বস্তুদুটির বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যের উল্লেখ থাকবে না।

৪। বস্তুদুটির মধ্যে সাদৃশ্য বা মিলটুকু দেখানো হবে (সাধারণ ধর্ম)।

৫। সাদৃশ্য দেখানো হবে সাধারণত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে (সাদৃশ্যবাচক শব্দ)। উপমা অলংকারে ব্যবহার্য সাদৃশ্যবাচক শব্দের তালিকাটি এইরকম : মত, মতন, ন্যায়, রূপে, নিভ, পারা, প্রায়, তুলা, সম, তুল্য, হেন যেমতি, কল্প, সদৃশ, বৎ, যথা, যেন, রীতি ইত্যাদি।

অতএব, উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

৬। উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো—বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য-প্রতিষ্ঠার এটি প্রথম স্তর।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

● বাংলায় উপমার উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছ-টি—

(ক) পূর্ণোপমা ; (খ) লুপ্তোপমা ;

(গ) মালোপমা ; (ঘ) স্মরণোপমা ;

(ঙ) বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা ; (চ) বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ **(ক) পূর্ণোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা (পূর্ণা + উপমা)।

উদাহরণ :

(i) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'ছুরি', 'উপমান 'প্রভাতরশ্মি', সাধারণ ধর্ম 'তীক্ষ্ণদীপ্ত', সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম'।

(ii) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারার- যথা ! —মধুসূদন

সংকেত : উপমেয় 'সিন্দূরবিন্দু', উপমান 'তারার-', সাধারণ ধর্ম 'শোভাসৃষ্টি', ('শোভিল'—ক্রিয়াগত), সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যথা'।

■ **(খ) লুপ্তোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের (উপমান-সাধারণ ধর্ম-সাদৃশ্যবাচক শব্দ) যেকোনো একটি দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে (অর্থাৎ, এদের উল্লেখ থাকে না), তার নাম লুপ্তোপমা (লুপ্তা + উপমা)।

উদাহরণ :

১. সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে —সঞ্জীবচন্দ্র

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যে 'বন্যেরা' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), 'শিশুরা' উপমান (অন্য বস্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), সাধারণ ধর্ম 'সৌন্দর্য (সুন্দর' হওয়ার গুণটি উপমেয়-উপমান দু-পক্ষেই আছে), কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত। উদ্ধৃত পঙক্তিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'বন্যেরা' এবং 'শিশুরা' এই দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে, কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে।

অতএব, এটি উপমা অলংকার। অলংকারটিতে উপমেয় ছাড়া উপমান, সাধারণ ধর্মেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু একটি অঙ্গ সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ নেই বলে এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

২. সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন। —জীবনানন্দ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'চোখ' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তলুনা করা হচ্ছে), 'পাখির নীড়' উপমান (অন্য বস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), 'মতো' সাদৃশ্যবাচক শব্দ, কিন্তু সাধারণ ধর্ম (প্রশান্তি) লুপ্ত। উদ্ধৃত চরণটিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'চোখ' আর 'পাখির নীড়' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, অলংকার এখানে উপমা। অলংকারটিতে উপমেয় আছে, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের অন্যতম সাধারণ ধর্ম লুপ্ত বলে এটি 'লুপ্তোপমা'।

৩. সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

চকি কলাপাতা সন্ধ্যা। —জগন্নাথ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : তিন শব্দের এই বাক্যে 'সন্ধ্যা' উপমেয়, 'কচি কলাপাতা' উপমান, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত। বাক্যটিতে 'সন্ধ্যা' আর 'কচি কলাপাতা' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি উপমা অলংকার। কিন্তু উপমেয়ের উল্লেখ থাকলেও অন্য তিনটি অঙ্গের একমাত্র উপমান ছাড়া আর দুটি অঙ্গই (সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম) লুপ্ত। সুতরাং, এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

৪. উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যের শেষ শব্দ 'হরিণ-চোখ'-এ সাদৃশ্যের সঞ্চার হয়েছে। 'হরিণ-চোখ' আসলে হরিণের চোখ নয়, ওটা কালো মেয়েরই চোখ। সাদৃশ্যের টানেও হরিণ আসেনি, এসেছে হরিণের চোখ-ই। কেননা, কবির দৃষ্টিপাত কালো মেয়ের চোখের প্রতি নিবদ্ধ। অর্থাৎ, এখানে বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয় কালো মেয়ের 'চোখ' যা কবি দেখেছিলেন, আর উপমান হরিণের 'চোখ' যা কবি কল্পনা করেছিলেন। 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ যদি 'হরিণের চোখ' হত, তাহলে ওই 'হরিণ-চোখ'-ই হত উপমান। কিন্তু, প্রয়োগ-কৌশলে 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে 'হরিণের চোখের মত চোখ'। 'হরিণ-চোখ'-এ সমাসবদ্ধ হয়ে তা উপমান 'চোখ' আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মত' দুটিকেই হারিয়েছে, রক্ষা করেছে কেবল কালোমেয়ের 'চোখ', যা হরিণের চোখের মতোই কালো, অতএব উপমেয়। সুতরাং, বাক্যটিতে দুটি বিজাতীয় বস্তু 'কালো মেয়ের চোখ' ও 'হরিণের চোখ'-এর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, তৈরি হয়েছে উপমা অলংকার। আর, উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত রয়েছে বলে এটি নিঃসন্দেহে লুপ্তোপমা।

মন্তব্য : 'মেয়ে' আর 'হরিণ' বিজাতীয়, অতএব তাদের চোখও বিজাতীয়।

৫. উপমান সাধারণ ধর্মও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

নীরবিলা বীণাবাণী —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণটিতে উপমেয় প্রমীলা—'বীণাবাণী'-বিশেষণের রূপে। কিন্তু, উপমান সাধারণ ধর্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দে এখানে লুপ্ত। বীণার বাণীর মতো বাণী যার, সেই প্রমীলা উপমেয় হলেও 'বীণা' তার উপমান নয়, 'বাণী'র সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে তা প্রমীলার বিশেষণ হয়ে আছে। তবে 'বাণী'র ধারক হিসেবে 'বীণা'র সঙ্গে প্রমীলা সাদৃশ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছে। সুতরাং, বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো ফলে এখানে উপমা অলংকার হয়েছে এবং উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গই লুপ্ত থাকার কারণে এটি লুপ্তোপমা।

■ **(গ) মালোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা (মালা + উপমা)।

উদাহরণ :

(i) তোমার সে-চুল

জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন। —বুদ্ধদেব বসু

সংকেত : উপমেয় 'চুল', উপমান 'সূতা' আর 'মেঘ'।

(ii) উড়ে হোক ক্ষয়

ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত

নিষ্ফল সঞ্চয়। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'সঞ্চয়', উপমান 'ধূলি' আর 'তৃণ'।

৪০.৬.২ রূপক

সংজ্ঞা : বিষয়ের অপহ্নব না ঘটিয়ে (উপমেয়কে লুপ্ত না করে) তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। বাক্যে উপমেয় এবং উপমানের উল্লেখ থাকবে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকবে না।

২। উপমেয় এক হয়ে যাবে উপমানের সঙ্গে। এরই নাম অভেদ। সাদৃশ্যের প্রথম স্তর উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো (উপমা), দ্বিতীয় স্তরভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো (ব্যতিরেকে), তৃতীয় স্তর অভেদ (রূপক)।

৩। বাক্যে উপমানই প্রধান, ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বাক্যাংশ উপমানকেই অনুসরণ করবে। উপমেয় লুপ্ত নয়, তবে গৌণ।

৪। জীবন অঙ্গী, শৈশব-যৌবন বার্ধক্য তার অঙ্গ ; আকাশ অঙ্গী, মেঘ-তারা-নীলরং তার অঙ্গ ; নদী অঙ্গী—ধারা-ঢেউ-ফেনা-তীর তার অঙ্গ। অঙ্গী উপমেয়ের অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গী উপমানের অঙ্গের অভেদ হতে পারে।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি—

  (ক) নিরঙ্গরূপক ; (খ) সাঙ্গরূপক ; (গ) পরম্পরিত রূপক।

- নিরঙ্গরূপক দু-রকমের—

  (ক) কেবল নিরঙ্গরূপক ; (খ) মালা নিরঙ্গরূপক।

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■(ক) নিরঙ্গরূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঙ্গরূপক। একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঙ্গরূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঙ্গরূপক (মালারূপক)।

উদাহরণ :

১. কেবল নিরঙ্গরূপক (একটি উপমেয়, একটি উপমান)—

(i) শিশুফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে। —যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : উপমেয় 'শিশু', উপমান 'ফুলগুলি'। ক্রিয়াপদ 'ফুটে' ফুলগুলি'র অনুসারী। 'শিশু'র ওপর কেবল 'ফুলগুলি'র অভেদ আরোপ।

(ii) যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।—মোহিতলাল

সংকেত : উপমেয় 'যৌবন', উপমান কেবল 'মৌবন'। 'মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি'—এই বাক্যাংশ উপমান 'মৌবন'-এর অনুসারী।

মন্তব্য : এখানে 'যৌবনেরি মৌবনে' অংশে 'বনে' ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ (মৌ-'বনে') এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ (যৌ-'বনে'-রি) হচ্ছে বলে নিরর্থক যমক অলংকারও হয়েছে। লক্ষণীয়, 'মৌবনে' শব্দটি 'মৌ' এবং 'বনে'—এ দুটি স্বতন্ত্র শব্দের সমাসে তৈরি বলে 'বনে' শব্দের মর্যাদা পাবে।

২. মালা নিরঙ্গরূপক (মালারূপক একটি উপমেয়, একের বেশি উপমান)—

(i) অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারিদিকে চিরযামিনী। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'তুমি একা', উপমান 'একটি স্বপ্ন', 'একটি পদ্ম', 'একটি চন্দ্র'। একটি উপমেয়ের ওপর তিনটি উপমানের অভেদ আরোপ।

(ii) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা ? —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'আমি', উপমান 'উপদ্রব', 'অভিশাপ', 'দুরদৃষ্ট', 'দুঃস্বপন', 'কাঁটা'। একটি উপমেয়ের ওপর পাঁচটি উপমানের অভেদ আরোপ।

■(খ) সাঙ্গরূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গরূপক।

(অর্থাৎ, উপমেয়-উপমান অঙ্গসমেত এক হয়ে গেলে সাঙ্গরূপক।)

উদাহরণ :

(i) শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?
—যতীন্দ্রমোহন

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে একদিকে উপমেয় 'আকাশ' অঙ্গী, অন্যদিকে উপমান 'গাঙ' অঙ্গী। অঙ্গী 'আকাশ'-এর অঙ্গ 'মেঘ' 'জ্যোৎস্না' 'ধরা'—কেননা, মেঘ-জ্যোৎস্নার আধার আকাশ, আকাশ থেকে যাত্রা শুরু, ধরায় যাত্রাসমাপন। অন্যদিকে অঙ্গী 'গাঙে'র অঙ্গ 'পাল' 'তরী' 'ঘাট'—পালসহ তরী গাঙেই ভাসে, ঘাট গাঙেরই সংলগ্ন হয়ে থাকে। উদ্ধৃত বাক্যে 'পালটি মেলে' বাক্যাংশ উপমান 'গাঙ'র সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ 'আকাশ'-এর ওপর 'গাঙ'-এর অভেদ আরোপে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। সেইসঙ্গে উপমেয় 'আকাশ'-এর অঙ্গ 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না' আর 'ধরা'র ওপর উপমান 'গাঙ'-এর অঙ্গ যথাক্রমে 'পাল', 'তরী' আর 'ঘাট'-এর অভেদ-ও আরোপ করা হয়েছে (অর্থাৎ মেঘ-পাল, জ্যোৎস্না-তরী আর ধরা-ঘাট এক হয়ে গেছে।) অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে বলে।

(ii) সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী
সে বাতাসে, কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ; —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : অঙ্গী উপমেয় 'সৌন্দর্য', তার অঙ্গ 'বেদনা', 'মন', 'হৃদয়'। অঙ্গী উপমান 'পাথার' তার অঙ্গ 'বায়ু', তরী', 'পাল'।

■(খ) পরম্পরিত রূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর ওকটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক।

(একটি নিরঙ্গারূপক থেকে আর একটি নিরঙ্গারূপকের জন্ম—এইভাবে রূপকের পরম্পরা বা ধারা তৈরি হতে থাকে বলে এর নাম পরম্পরিত রূপক।)

উদাহরণ :

(i) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে। —রবীন্দ্রনাথ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'আলো'র ওপর প্রথম উপমান 'কমলকলিকা'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'আধাঁরে'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'পর্ণপুট'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। সেইকারণে এখানে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে।

মন্তব্য : 'আলো-আঁধার' আর 'কমলকলিকা-পর্ণপুট'-এ অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক থাকলেও কার্যকারণ-পরম্পরার ভাব প্রবল হওয়ায় এখানে সাঙ্গারূপক না হয়ে পরম্পরিত রূপকই হয়েছে।

(i) তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা । —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'দীর্ঘশ্বাস'র ওপর প্রথম উপমান 'ধোঁয়ার'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'অনুশোচনা'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'আগুন'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। আবার দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ থেকে তৃতীয় উপমেয় 'উৎসাহ'-এর ওপর তৃতীয় 'কয়লা'র অভেদ-আরোপের জন্ম—এইভাবে রূপকের কার্যকারণ-পরম্পরা তৈরি হচ্ছে বলে এটি পরম্পরিত রূপক।

৪০.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা

সংজ্ঞা : গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার।

(উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়-উপমানের সাধারণ সাদৃশ্য থেকে উপমা, অভেদ থেকে রূপক, আর প্রবল সংশয় থেকে উৎপ্রেক্ষা। গভীর সাদৃশ্য এ সংশয়ের কারণ।

২। সংশয় একদিকে—উপমেয়কে উপমান বলে সংশয়।

৩। এ সংশয় কবিত্বময়, সাধারণ সংশয় থেকে অলংকার হয় না।

৪। কবিত্বের গুণে প্রত্যক্ষ উপমেয়েরে তুলনায় কাল্পনিক উপমানকেই বেশি সত্য বলে মনে হয়।

প্রকারভেদ

● উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের—

(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (বাচ্যা + উৎপ্রেক্ষা)

(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (প্রতীয়মানা + উৎপ্রেক্ষা)

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■ **(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা :**

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন, 'বুঝি', 'জনু', 'মনে হয়', 'মনে গণি' জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/৪র্থ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী' (অশোকবনে সীতার পদতলে বসা সরমা), উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' (প্রদীপ)। সীতার পদতলে বসা যুবতী সরমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুলসীতলায় জ্বলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপটি। দুটি দৃশ্যেই আছে একটি পবিত্র সৌন্দর্য। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী'কে উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। অতএব, এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার। সংশয়বাচক 'যেন' শব্দের সংযোগে, সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(i) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।। —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কলঙ্কিত গোলাকৃতির সাদৃশ্যে উপমেয় 'পূর্ণিমা-চাঁদ'-কে ক্ষুধাতুর মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপমান 'ঝলসানো রুটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অতএব, এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

■ **(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :**

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গা।
তার পাছে ব্যাধ যেন উড়িছে পতঙ্গা।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে প্রথম চরণে উপমেয় 'ভগবতী'তে উপমান 'দীঘল তরঙ্গা' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় জেগেছে। ভগবতীর চলনভঙ্গিতে 'তরঙ্গো'র নাচন কবি লক্ষ করেছেন। এই গভীর সাদৃশ্য থেকেই কবির মনে সংশয়, এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে তা কবিত্বময়। অতএব, অলংকার এখানে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়সূচক শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অর্থ থেকে সংশয়ের ভাব অনুমিত হওয়ায় এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

দ্বিতীয় চরণেও উপমেয় 'ব্যাধ'-কে উপমান 'পতঙ্গা' বলে কবির মনে প্রবল সংশয়। এর মূলেও রয়েছে 'ব্যাধ' আর 'পতঙ্গো'র চলনভঙ্গির সাদৃশ্য। অতএব, এখানেও উৎপ্রেক্ষা, তবে সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(ii) এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল। —যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'ব্রহ্মাণ্ড', উপমান 'মাকাল ফল'। বাইরের রূপে লোভনীয় অথচ ভেতরের সারশূন্য 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং 'মাকাল ফল' দুই-ই। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে 'ব্রহ্মাণ্ড'-কে একটি ঝুলন্ত প্রকাণ্ড 'মাকাল ফল' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশে এখানে অলংকার হয়েছে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়মূলক শব্দের কোনো উল্লেখ নেই বলে উদাহরণটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

৪০.৬.৪ সমাসোক্তি

সংজ্ঞা : বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হলে সমাসোক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না, তবে তার ব্যবহার বা আচরণের উল্লেখ থাকে।

২। উপমেয় একা এবং তার ব্যবহার বা আচরণ পুরোপুরি উপমানের।

৩। উপমেয়ের ওপর আরোপিত ব্যবহার থেকেই উপমানকে চেনা যায়।

৪। ব্যবহার বা আচরণ সাধারণভাবে গুণগত বা ক্রিয়াগত।

৫। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপমেয় অচেতন বস্তু, তার ব্যবহার চেতনের।

উদাহরণ :

(i) শুনিতেছি আজো আইম প্রাতে উঠিয়াই,
'আয়' 'আয়' কাঁদিতেছি তেমনি সানাই। —নজরুল ইসলাম

সংকেত : যে কান্না মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অচেতন 'সানাই-এর ওপর তা আরোপিত। চেতন মানুষই এখানে উপমেয়, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, আছে তার ব্যবহারের (কান্নার) উল্লেখ। এই ব্যবহারের আরোপ হল 'সানাই'-এর ওপর। অতএব, 'সানাই' এখানে অনুক্ত 'মানুষ'-এর উপমান। অলংকার সমাসোক্তি।

(ii) শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছে এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; —রবীন্দ্রনাথ
(সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

ব্যাখ্যা : 'বসুন্ধরা' উদ্ধৃত স্তবকের উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয়, উপমানের উল্লেখ নেই। আমাদের পরিচিত 'বসুন্ধরা' (মাটির পৃথিবী) অচেতন। কিন্তু এখানকার বর্ণিত 'বসুন্ধরা' মেঠোসুরে বাঁশির কান্না শুনে 'উদাসী', 'হিরণ্য-অঞ্চল বক্ষে' টেনে এলোচুলে বসে আছেন। বলা বাহুল্য, এ স্বভাব 'বসুন্ধরা'র নয়, আঁচল বুকে-টানা এলোচুলে বসে-থাকা উদাসিনী নারীর ব্যবহার বা আচরণ কবি আরোপ করেছেন, 'বসুন্ধরা'র ওপর। ওই 'নারী'ই 'বসুন্ধরা'-র উপমান। উপমান 'নারী'কে চেনা যায় উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর আরোপিত আচরণের বর্ণনা থেকেই। অতএব, উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার আরোপের সৌন্দর্যই উদ্ধৃত স্তবকের অলংকার, সে অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

৪০.৬.৫ অতিশয়োক্তি

সংজ্ঞা : বিষয়ীর (উপমানের) সিদ্ধ অধ্যবসায় হলে, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে এবং সেই কারণে উপমেয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তারই নাম সাধারণ অতিশয়োক্তি।

(উপমেয় লুপ্ত এবং উপমান প্রবল হলে অতিশেয়োক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না, অর্থাৎ উপমেয় লুপ্ত।

২। বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে উপমেয়কে চেনা যায়।

৩। উপমান একা, সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৪। উপমেয়-উপমানের সাদৃশ্য এখানে চূড়ান্ত, অভেদ সম্পূর্ণ।

৫। 'উপমা'য় উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো, 'ব্যতিরেকে' ওই ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো, 'রূপকে' অসম্পূর্ণ অভেদ, 'অপহ্নুতি'-তে অভেদ মেনে নিয়ে উপমেয়ের অস্বীকৃতি, 'অতিশয়োক্তি'তে সাদৃশ্যের চূড়ান্ত পরিণাম—অভেদ সম্পূর্ণ।

উদাহরণ :

(i) মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা ! —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/৬ষ্ঠ সর্গ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলের দিকে পা-বাড়ানো মেঘনাদের বিদায়-মুহূর্তের একটি করুণ দৃশ্য উদ্ধৃত উদাহরণটি। বেদনার্ত প্রমীলার ক্রন্দন-দৃশ্য। নয়ন থেকে অশ্রধারাই তো বর্ষিত হল। কিন্তু অশ্রু এখানে অনুক্ত। প্রমীলার নয়ন বা বর্ষণ করল, কবের চোখে তা 'মুকুতা'। তারই উল্লেখ এখানে আছে। অর্থাৎ, প্রকৃত বা উপমেয় 'অশ্রু'-র উল্লেখ নেই, আছে কেবল অপ্রকৃত বা উপমান 'মুকুতা'র (মুক্তা) উল্লেখ। অতএব, অলংকার এখানে অতিশয়োক্তি (বিশেষ নাম 'রূপকাতিশয়োক্তি')।

(ii) হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? ——মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/১ম সর্গ)

ব্যাখ্যা : বিধ্বংসী লঙ্কাযুদ্ধের জন্য রাবণ দায়ী করলেন সূর্পণখাকে। পঞ্চবটীবনে 'কালকূটে ভরা ভুজগ'টিকে দেখারই পরিণাম এ যুদ্ধ। কিন্তু, বিধ্বস্ত রাবণের দৃষ্টিতে যা 'ভুজগ' (সাপ), প্রকৃত অর্থে তিনি এখানে রামচন্দ্র। সূর্পণখা রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দেখেই কামাসক্ত হয়ে রক্তারক্তি-কাণ্ডের সূচনা করেছিল, কোনো সাপ দেখে নয়। অতএব, 'ভুজগ' এখানে উপমান-মাত্র, তার উপমেয় 'রামচন্দ্র'।

বক্তার (রাবণের) মূল্যায়নে এবং কবির প্রকাশভঙ্গিতে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং তাদের অভেদ এখানে পরিপূর্ণ। ফলে, বাক্যে উপমেয় 'রামচন্দ্র' পুরোপুরি লুপ্ত, উপমান 'ভুজগ' সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, উপমান সম্পূর্ণভাবে উপমেয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং, এখানকার অলংকার অতিশয়োক্তি।

৪০.৬.৬ ব্যতিরেক

সংজ্ঞা : উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে যে অর্থ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যতিরেক অলংকার।

(উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে ব্যতিরেক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমান অপেক্ষা উপমেয় উৎকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

২। উপমান অপেক্ষা উপমেয় নিকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

৩। অধিক-চেয়ে-অপেক্ষা, নিন্দি-নিন্দিত-নিন্দু, জিনি-জিতল, গঞ্জি-গঞ্জন, লাজ-লজ্জা, ছার ইত্যাদি তারতম্যবোধক শব্দের প্রয়োগে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়।

৪। সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে থাকে।

৫। কখনো কখনো বর্ণনায় অন্তর্নিহিত থাকে উৎকর্ষ-অপকর্ষ, ভাব বা অর্থ থেকে বুঝে নিতে হয়।

৬। ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো হয়। এটি সাদৃশ্যের দ্বিতীয় স্তর। (প্রথম স্তর উপমায়, যেখানে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়।)

উদাহরণ :

(i) কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি। —রবীন্দ্রনাথ
(কথা / সামান্য ক্ষতি)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি', উপমান 'কলকল্লোল'। এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ নেই, আছে তারতম্য-বোধক 'লাজ দিল' কথাটি—এর সাহায্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝা যাচ্ছে। উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি' লজ্জা দিল উপমান 'কলকল্লোল'কে। লজ্জা যে দেয়, সে তার শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষের কারণেই দেয়। এখানে 'নারীকণ্ঠের কাকলি'রই উৎকর্ষ। কিন্তু, কোন্ গুণে এই উৎকর্ষ, সে কারণটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করা যায়। কলধ্বনি নারীর কণ্ঠেও আছে, কল্লোলের (ঢেউ) মৃদু আঘাতেও আছে। এই ধ্বনির উচ্চতায় 'কলকল্লোল' অপেক্ষা নারীকণ্ঠের কাকলি'রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এ উদাহরণে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে।

(i) কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য /১ম সর্গ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উপমেয় 'রাবণের রাজসভা' (ইহা), উরমান 'ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব-সভা'। দুটি সভাই ঐশ্বর্যময়। তবে, তারতম্য-বোধক 'ছার' শব্দের প্রয়োগে ঐশ্বর্যের পরিমাণের দিক থেকে দুটি রাজ্যসভার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে 'রাবণের রাজসভা'রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এখানকার অলংকার উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

৪০.৭ সারাংশ-২

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

'ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়'—কথাটি বললে ছেলেটার চলন একটা ছবি হয়ে ওঠে আমাদের মনে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার—অর্থালংকার। 'ছেলেটা' আর 'ব্যাং'—এই দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে কল্পনার

জোরে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা হল। সাদৃশ্যই এখানকার অলংকারের লক্ষণ। তাই, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার। প্রধানত তিনটি উপায়ে এ সাদৃশ্য দেখানো হয়—বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়ে ('ননীর মতো শয্যা'), পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে ('কাব্যের জাল'), পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে ('নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে')। সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ—উপমেয় (বর্ণনীয় বিষয়), উপমান (যার সঙ্গে তুলনা), সাধারণ ধর্ম (যা দুটি বস্তুতেই থাকে), ভঙ্গি (তুলনার)। কেবল ভঙ্গির পরিবর্তনে সাদৃশ্যমূলকে নানারকম অলংকার তৈরি হয়ে যায়—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ইত্যাদি।

উপমা : বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেই উপমা। উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম, সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপমার প্রধান বিভাগ তিনটি—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা। উপমার চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকলে পূর্ণোপমা, উপমেয় থাকলেও আর কোনো অঙ্গের লোপ হলে লুপ্তোপমা, একটি উপমেয়ের একের বেশি উপমান থাকলে **মালোপমা।**

রূপক : উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক। রূপক প্রধানত তিন রকমের—নিরঙ্গরূপক, সাঙ্গরূপক, পরম্পরিত রূপক। কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একের বেশি উপমানের অভেদ আরোপ করলে **নিরঙ্গরূপক** (উপমেয়-উপমানের কোনো অঙ্গের অভেদ থাকবে না)। উপমেয়-উপমানের অঙ্গসমেত অভেদ হলে **সাঙ্গরূপক।** একটি উপমেয়-উপমানের অভেদ থেকে আর একটি উপমেয়-উপমানের অভেদ তৈরি হলে **পরম্পরিত রূপক।**

উৎপ্রেক্ষা : উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা। উৎপ্রেক্ষা দু-রকমের—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকলে **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** (পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি), সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ ছাড়াই সংশয় অনুমান করা গেলে **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা** (আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ)।

অতিশয়োক্তি : উপমেয় লুপ্ত আর উপমান প্রবল হলে অতিশয়োক্তি। 'নয়ন বর্ষিল .... মুকুতা'—এখানে উপমেয় 'অশ্রু' লুপ্ত, উপমান 'মুকুতা' প্রবল।

সমাসোক্তি : উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হল সমাসোক্তি। 'বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে'—উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর উপমান 'নারী'-র ব্যবহার।

ব্যতিরেক : উপমেয়-উপমানের মধ্যে সাধারণ ধর্মের কমবেশি দেখানো হলে ব্যতিরেক। 'কলকল্লোর লাজ দিল আজ / নারীকণ্ঠের কাকলি'—সাধারণ ধর্ম 'কলধ্বনি' উপমান 'কল্লোল'-এর চেয়ে উপমেয় 'নারীকণ্ঠে-ই বেশি।

৪০.৮ অনুশীলনী-২

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ২৮৭-এর উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার কীভাবে গড়ে ওঠে, লিখুন।

২. কী কী উপায়ে কবিরা দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে থাকেন, উদাহরণসহ লিখুন।

৩. সাদৃশ্যমূলক অলংকারের কী কী অঙ্গ, একটি উদাহরণে সেসব দেখিয়ে দিন। কোন অঙ্গ বদলালে অলংকার বদলে যায়, লিখুন।

৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন :

পূর্ণোপমা, সাঙ্গ রূপক, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক।

৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।

(খ) নয়ন বর্ষিল উজ্জ্বলতর মুকুতা।

(গ) তটিনী চলেছে অভিসারে।

(ঘ) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গা।

(ঙ) অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।

(চ) কচি কলাপাত সন্ধ্যা।

৪০.৯ মূলপাঠ -৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি

পাঁচটি লক্ষণ থেকে যে অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ হয়েছে, এ কথা মূলপাঠ-১ থেকে আপনারা জেনেছেন। প্রথম লক্ষণ সাদৃশ্য, তা থেকে তৈরি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের পরিচয় পেলেন মূলপাঠ-২-এ। এবার জেনে নিন অর্থালংকারের বাকি চারটি লক্ষণ থেকে তৈরি আরও চারটি শ্রেণির কথা—বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক আর গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকারের কথা।

৪০.৯.১ বিরোধমূলক অর্থালংকার

কোনো কবির লেখায় যদি দেখি, কার্য-কারণ-ঘটনাক্রম তার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অন্যপথ বা উল্টোপথে চলছে, তখনই বুঝব সেখানে 'বিরোধ' আছে। যেহেতু তা কবির লেখা, সেই কারণে ধরে নিতে হবে—সেখানে যা-কিছু বিরোধ সবই বাইরে থেকে বিরোধ বলে মনে হয়, একটু তলিয়ে ভাবলেই তার মীমাংসা খুঁজে পাব, বিরোধ মিলিয়ে যাবে। কাব্য-কবিতার বিরোধের ব্যাপারটি কয়েকটি উদাহরণ থেকে বুঝে নেওয়া যাক :

১. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।

২. মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল।

৩. আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।

৪. তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

৫. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

৬. এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে বাঁধিতে গলায় ?

প্রথম উদাহরণে আছে একটি শিশু আর শিশুর পিতা। শিশুটি তার পিতার কোলে ঘুমিয়ে আছে, এই তথ্য অভিজ্ঞ মানুষের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু, শিশুর পিতাটি ঘুমিয়ে আছে শিশুর মধ্যে—এ ধরনের কথায় মনে খটকা লাগে, অভিজ্ঞতা ধাক্কা খায় একটা বিপরীত ছবির কল্পনায়। পাঠককে ভাবায়, পাঠক কিছু সময়ের জন্য গভীর জলে পড়ে যায়, এর অর্থ খুঁজে বের করে অবশেষে কিনারা পায়। এটাই বিরোধ, এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার।

দ্বিতীয় উদাহরণে মেঘশূন্য নীল আকাশ থেকে অঝোরে বর্ষণ, তৃতীয় উদাহরণে চোখ থেকেও দৃষ্টি না-থাকা-কারণ-কার্যের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করছে বলে বিরোধ। চতুর্থ উদাহরণে শ্রাবণের ধারা ঝরল একটি বনে, কদম ফুটল অন্য একটি বনে। এমন ঘটনা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আইন অমান্য করছে। অতএব, খবর হিসেবে এটি মিথ্যা, অন্ততপক্ষে অবিশ্বাস্য। বনে বনে সন্ধান করেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ওই বিরোধের খোলসটা ছাড়িয়ে পাঠকের মনে যে কদম ফুটে উঠল ক্রমশ, তার সৌন্দর্য পাঠকই উপভোগ করবেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী তার আস্বাদ পাবেন না। পঞ্চম উদাহরণে সুখের আশায় বাঁধা ঘর আগুনে পুড়ে দুঃখ এনে দিল, বস্তুজীবনেও এমনটি ঘটে। এই স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেও তো বিরোধ আছেই। এই বিরোধটাই কবি কাজে লাগাচ্ছেন তাঁর কবিতায়, যেখানে সত্যি সত্যি ঘর-বাঁধা বা ঘর-পোড়ার ঘটনা ঘটছে না, ঘটছে কারো মনে সুখের বদলে দুঃখের আনাগোনা। শেষ উদাহরণের দৃশ্যটা অদ্ভুত এবং কিঞ্চিৎ ভয়ংকর। এমন সাপের কথা কবি বলছেন, যাকে দেখলে ভয়ে শিউরে ওঠার বদলে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে। খবর হিসেবে এটাও অবিশ্বাস্য। এখানেই এর বিরোধ। কেন সাপটাকে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে বুঝতে পারলেই চমক, চমৎকারিত্ব। গলায় বাঁধা ওই সাপটা তখন সত্যি সত্যি হয়ে উঠবে অলংকার—গলারও, মনেরও।

বিরোধাভাস (বিরোধ)

সংজ্ঞা : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হয়, কিন্তু অর্থবোধে সে বিরোধির অবসান ঘটে, তাহলে সে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার।

(দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখানো হলে বিরোধাভাস।)

উদাহরণ :

(i) বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। —রবীন্দ্রনাথ
(কথা/পরিশোধ)

ব্যাখ্যা : 'মুক্তি'র বিপরীত 'বন্ধন'। 'শৃঙ্খলমুক্ত করা' আর 'শৃঙ্খলে বাঁধা' বিরুদ্ধ দুটি কাজ। অতএব, শ্যামা বজ্রসেনকে শৃঙ্খলমুক্ত করে শৃঙ্খলেই বেঁধেছে—এ কথা শুনে মনে হয়, শ্যামার এ দুটি কাজের মধ্যে বিরোধ

আছে। কিন্তু এ শৃঙ্খলমুক্তি 'ক্ষণিকে'র আর এ শৃঙ্খলে বাঁধা 'অনন্তে'র। এর অর্থ, কারাগারের লোহার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি (যা মুহূর্তেই ঘটে গেছে) আর প্রেমের শৃঙ্খলে বন্ধন (যা চিরকালের)। এই অর্থবোধ থেকে শ্যামার দুটি কাজের আপাত বিরোধের অবসান ঘটল। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার হয়েছে।

(ii) অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। —রবীন্দ্রনাথ
(নৈবেদ্য)

ব্যাখ্যা : 'বন্ধন' আর 'মুক্তি' বিপরীত দুটি শব্দ। অতএব, 'বন্ধনমাঝে' 'মুক্তির স্বাদ' পাবার কল্পনায় বিরোধ আছে। কিন্তু 'বন্ধন' যদি হয় 'অসংখ্য' আর 'মুক্তির স্বাদ' যদি হয় 'মহানন্দময়', তাহলে সে 'বন্ধন' আর 'মুক্তি'র অন্য অর্থ অবশ্যই আছে। আমাদের চারপাশের সীমানার যে বন্ধন, তা বাইরের। সেই বাইরের বন্ধনে বাঁধা থেকেই কবি চেয়েছেন মনের মুক্তি। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার অনুভবে যে আনন্দের সন্ধান কবি পেতে চান, কবির পক্ষে সেইটেই হবে সীমার বাহ্য বন্ধনের মধ্যে থেকেও অসীম আনন্দলোকে সত্যকার মুক্তি। এই অর্থবোধ থেকেই 'বন্ধন'-'মুক্তি'র আপাত বিরোধের অবসান ঘটে বলে এখানে বিরোধাভাস অলংকার আছে।

(iii) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। —রবীন্দ্রনাথ
(দেশবন্ধুর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য)

ব্যাখ্যা : 'মৃত্যুহীন' যে প্রাণ, 'মরণে' তাকেই দান করা হল। 'মৃত্যুহীন প্রাণ'-এর সঙ্গে 'মরণ'-এর সংযোগ—এতে বিরোধ আছে। এ বিরোধ শব্দের সঙ্গে শব্দের, অতএব ভাষাগত বাহ্য বিরোধ। কিন্তু, কথাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো মহান পুরুষ সম্পর্কে উচ্চারিত। এখানে 'প্রাণ'-এর অর্থ আত্মার বাণী, তার মৃত্যু বা বিনাশ নেই বলে সে-'প্রাণ' 'মৃত্যুহীন'। আর, 'মরণ' কেবল শরীরের, 'প্রাণে'র নয়। দেশবন্ধু তাঁর শরীরী মৃত্যুতে আত্মার অমর বাণী দেশবাসীর জন্য রেখে গেলেন—এই অর্থবোধ থেকে উদ্ধৃত স্তবকটির ভাষাগত আপাত বিরোধের অবসান ঘটে। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার আছে।

৪০.৯.২ শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার

শৃঙ্খলা মনকে প্রসন্ন করে, বিশৃঙ্খলা মনকে বিরক্ত করে—এটাই সুস্থ মানুষের মনস্তত্ত্ব। সৈন্যদলের কুচকাওয়াজকে মনে হয় সুন্দর, কাউন্টারের পাশে এমনকী সুশৃঙ্খল ক্রেতার পঙক্তিও সুন্দর, কিন্তু ভিড়-ঠাসা বাস বা ট্রেনের দরজায় ওঠা-নামার হুড়োহুড়ি বিরক্তিকর, অসুন্দর। আলমারির তাকগুলিতে থাকে থাকে সাজানো বই দেখতে সুন্দর, পড়া হোক বা না হোক। কারণ শৃঙ্খলা। টেবিলের এলোমেলো ছড়ানো বই গভীর পাঠের সহায়ক হলেও অসুন্দর। কারণ শৃঙ্খলার অভাব। কবিতায় বাক্য বা বাক্যাংশের বিন্যাসের শৃঙ্খলার এই সৌন্দর্য থাকলে সেটাই হবে শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। এ শৃঙ্খলা আসতে পারে কারকের বিন্যাস থেকে, পদের বিন্যাস থেকে, কারণ-কার্যের বিন্যাস থেকে, অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রমশ নির্দিষ্ট হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকে।

দুটো-একটা উদাহরণ দিই :

'ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।'

দুটি বাক্য বা বাক্যাংশেই 'ছাড়ে' ক্রিয়াটি আছে। ক্রিয়ার সঙ্গে প্রথমে যুক্ত নারদ-বীণা, পরে যুক্ত বীণা-গীত। প্রথমে 'নারদ কর্তা, 'বীণা' কর্ম, পরে 'বীণাই কর্তা হয়ে ওঠে 'গীত'কে কর্ম বানিয়ে। এই শৃঙ্খলা থেকেই অলংকারের জন্ম।

'ফুল চাই সখা, সাদা ফুল, মধুগন্ধিত সাদা ফুল।'

তিনটি বাক্যাংশ বাক্যটিতে। প্রথম অংশের সঙ্গে যে কোনো 'ফুল' থেকে দ্বিতীয় বাক্যাংশে বেছে নেওয়া হল 'সাদা ফুল', সেই 'সাদা ফুল' থেকেও তৃতীয় বাক্যাংশের বাছাই হল একমাত্র সেই ফুল যেখানে মধুর গন্ধ আছে। এটাই শৃঙ্খলা, এখানেই অলংকার।

'পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন,
আর চুম্বনে মরণ।'

বাক্যাংশ এখানেও তিনটি। প্রথম অংশে 'পরশ' বা স্পর্শ থেকে 'চাহনি' বা দৃষ্টি, দ্বিতীয় অংশে 'দৃষ্টি' থেকে'চুম্বন', তৃতীয় বাক্যে 'চুম্বন' থেকে 'মরণ'—স্পর্শ থেকে যার শুরু, দৃষ্টি আর চুম্বন পেরিয়ে মরণে তার চূড়ান্ত পরিণাম। বিন্যাসের একটা শৃঙ্খলা বাক্যটিতেও আছে। এই শৃঙ্খলার সৌন্দর্যই এখানকার অলংকার।

একাবলি

সংজ্ঞা : পূর্ব-পূর্ব বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষণ বা বিশেষ্যপদ উত্তরোত্তর বাক্য বা বাক্যাংশের যথাক্রমে বিশেষ্য বা বিশেষণপদরূপে ব্যবহৃত হতে থাকলে যে শৃঙ্খলাজনিত অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম একাবলি।

(পূর্ব-পূর্ব বিশেষণ বা বিশেষ্যের উত্তরোত্তর বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়ে যাওয়ার নাম একাবলি।)

উদাহরণ :

(i) তাঁহার কাব্য বর্ণনাবহুল, ...বর্ণনা চিত্রবহুল.... চিত্র বর্ণবহুল।

—বুদ্ধদেব বসু

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যের প্রথম বাক্যাংশের বিশেষণ 'বর্ণনাবহুল' দ্বিতীয় বাক্যাংশে বিশেষ্য 'বর্ণনা'য় পরিণত, দ্বিতীয় বাক্যাংশের বিশেষণ 'চিত্রবহুল' তৃতীয় বাক্যাংশ বিশেষ্য 'চিত্র'তে পরিণত। এইভাবে পূর্ব-পূর্ব বাক্যাংশের বিষেণপদ উত্তরোত্তর বাক্যাংশে বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত হতে হতে একটা শৃঙ্খলাজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

অতএব, এখানে 'একাবলি' অলংকার হয়েছে।

(ii) বাপী নিরমল, বাপীতে কমল ফুটে।
কমলে ভৃঙ্গা, ভৃঙ্গে গীতিকা উঠে।।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকের দুটি বাক্যে চারটি বাক্যাংশ। প্রথম বাক্যাংশের বিশেষ্য 'বাপী' (দিঘি) দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'কমল'-এর বিশেষণ পদে ('বাপীতে') পরিণত। দ্বিতীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য 'কমল' তৃতীয় বাক্যাংশে 'ভৃঙ্গা'-এর বিশেষণপদে ('কমলে') পরিণত। তৃতীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য 'ভৃঙ্গা' (ভ্রমর) চতুর্থ বাক্যাংশে

'গীতিকা'র (সংগীত) বিশেষণপদে ('ভৃঙ্গো') পরিণত। 'বাপীতে', 'কমলে', 'ভৃঙ্গো' পদগুলি বিশেষণ—কারণ, এদের সংযোগে 'কমল', 'ভৃঙ্গ' আর 'গীতিকা' বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ব-পূর্ব বাক্যাংশে বিশেষ্য উত্তরোত্তর বাক্যাংশে বিশেষণপদরূপে ব্যবহৃত হল বলে একটা শৃঙ্খলাজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, এখানকার অলংকার 'একাবলি'।

৪০.৯.৩ ন্যায়মূলক অর্থালংকার

'ন্যায়'-এর অর্থ যুক্তি তর্কবিচার। 'ন্যায়দর্শন' দর্শনই, কবিতা নয়। 'ন্যায়' বা যুক্তি-তর্ক-বিচার দর্শনের বিশ্লেষণের বিষয়, আলোচনার বিষয়, কিন্তু কবিতার বিষয় নয়। ওটা হতে পারে কবিতার একটা পদ্ধতি। এইরকম একটা পদ্ধতি হচ্ছে 'সমর্থন-এর প্রয়োগ। একটি কথা বলতে গিয়ে বা সেই কথার সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর একটি কথার সমর্থন আসতেই পারে। এলে সেইটিই হবে যুক্তি বা 'ন্যায়'। সেই কথাটি 'ন্যায়'-এর সহযোগে কবিতা হয়ে উঠলে অর্থাৎ সেই কথাটির সৌন্দর্য উপভোগ্য হলে তা হবে ন্যায়মূলক অর্থালংকার।

'ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান।'

'ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম'—এই কথাটি যে সত্য, তা প্রমাণ করার জন্য সমর্থনে এগিয়ে এল পরের কথাটি—বড় দুটি গাছেরই মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থাকে, 'সমর্থন'ই এখানে যুক্তি বা ন্যায়। অলংকারও তাই ন্যায়মূলক।

'যত বড় হোক, ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা।
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা।'

ইন্দ্রধনু বা রামধনু আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে বর্ণের সমারোহ নিয়ে ছড়ানো থাকে। দেখতেও ভালোই লাগে। কিন্তু তাতে লাভ কী ? সে তো থাকে বহুদূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাছে থাকলে তবেই তো ভালোবেসে তৃপ্তি। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটাই সমর্থিত হচ্ছে দূরের ইন্দ্রধনুকে সরিয়ে রেখে কাছের প্রজাপতি-পাখাকেই ভালোবাসার অভ্যাসে। কবিরা এই পথেই কবিতায় 'সমর্থন' তৈরি করেন, এইভাবেই তৈরি হয় ন্যায়মূলক অলংকার।

অর্থান্তরন্যাস

সংজ্ঞা : সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

বৈশিষ্ট্য :

১। এ অলংকারের বিশেষ লক্ষণ সমর্থন।

২। সাধারণত দুটি বাক্য থাকে, দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যকে সমর্থন করে।

৩। একটি বাক্যে সামান্য (বা সাধারণ বিবৃতি) থাকলে অন্য বাক্যে বিশেষ, একটি বাক্যে কারণ থাকলে অন্য বাক্যে কার্য।

৪। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের বিশেষের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের বিশেষ দ্বারা প্রথম বাক্যের সামান্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কারণের দ্বারা প্রথম বাক্যের কার্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কার্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের কারণের সমর্থন—সমর্থন এই চার রকমে হতে পারে।

উদাহরণ :

১। সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন—

হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্ম্মতি। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/ষষ্ঠ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে দুটি বাক্য। প্রথম বাক্যে আছে একটি বিশেষ বিবৃতি—মেঘনাদের কাকা ('পিতৃব্য') বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে ('হেন সহবাসে') বর্বরতা শিখেছে। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যে ব্যক্তি নিম্নরুচির মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে ('গতি যার নীচ সহ') তার নিজের রুচিও নীচেই নেমে যায় ('নীচ সে দুর্ম্মতি')। দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত মানব-স্বভাবের এই সামান্য বা সাধারণ নিয়মটি সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত বিভীষণের বর্বর হয়ে যাওয়ার পরিণামকে। সমর্থনসূচক বাক্যাংশ 'বর্বরতা কেন না শিখিবে ?' সমর্থনকে আরও জোরদার করে তুলছে। অতএব, সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন থাকায় স্তবকটিতে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

২. বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন—

এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। —রবীন্দ্রনাথ
(কাহিনী/দুই বিঘা জমি)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যদুটির প্রথম বাক্যে আছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যার বেশি বেশি আছে, সে আরও বেশি চায়। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি বিশেষ উদাহরণ—বাবুর মতো রাজারাই উপেনের মতো গরিবের ধন চুরি করে নেয়। স্পষ্টত, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ সত্যটি প্রথম বাক্যের অন্তর্গত সাধারণ সত্যকেই সমর্থন করছে। বিশেষের দ্বারা সামান্যের এই সমর্থন উদ্ধৃত স্তবকে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

৩. কারণ দ্বারা কার্যের সমর্থন—

হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ? —মধুসূদন
(মেঘনাদবধ কাব্য/ষষ্ঠ সর্গ)

ব্যাখ্যা : শত্রুপক্ষের লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলায় এনে নিজের বংশকে বিনাশ করে দেবার যে আয়োজন বিভীষণ ('তাত') করল, সে কাজের অনৌচিত্য-ঘোষণা (উচিত কি তব একাজ') উদ্ধৃত স্তবকের প্রথম অংশে রয়েছে। স্তবকের পরবর্তী অংশে আছে বিভীষণের বংশকৌলিন্যের ব্যাখ্যা। এই বংশকৌলিন্যই পূর্ববর্তী অনৌচিত্যের কারণ। স্তবকের পরবর্তী অংশের অন্তর্গত এই কারণটি সমর্থন করছে পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্গত কার্যকে (অনৌচিত্যকে)। এই সমর্থন থেকেই স্তবকটিতে একটি অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

মন্তব্য : লক্ষ করার বিষয়, প্রথম বাক্যের অন্তর্গত 'এ কাজ' অর্থাৎ বিভীষণের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তার বংশগৌরবের অনুরূপ কার্য নয়, অভিজাত বংশের সন্তান বিভীষণের পক্ষে 'এ কাজ'-টি করার মধ্যে যে 'অনৌচিত্য' রয়েছে, সেইটিই এখানকার কার্য। এই কার্য সমর্থিত হচ্ছে বংশগৌরবের বর্ণনা দ্বারা।

৪. কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন—

দীন্ দুনিয়ার মালিক যেজন তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার।
মম্‌তাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার !

—মোহিতলাল

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকের প্রথম বাক্যের 'তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার !' বাক্যাংশে সংশয়াত্মক 'নাকি' শব্দ 'ন্যায়বিচার' কথাটির অর্থ উল্টে দিয়েছে। তার ফলে প্রথম বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় : দীন্ দুনিয়ার মালিকের ন্যায়বিচারের অভাব। এই অভাবের কারণেই দ্বিতীয় বাক্যের দুটি বাক্যাংশের অন্তর্গত কার্যে বৈষম্য—মৃত্যুর পর মম্‌তাজেরই প্রতি সম্মান ('তাজের শিরোপা') আর নূরজাহানের প্রতি অবজ্ঞা ('কাফন সার') বরাদ্দ করে মালিক এই বৈষম্যই তাঁর বিচারে দেখালেন। অতএব, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত কার্য (মম্‌তাজ-নূরজাহানে বিষম বিচার) সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত 'ন্যায়বিচার'-এর প্রতি সংশয়কে অর্থাৎ ন্যায়বিচারের অভাবরূপ কারণকে। কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে উদ্ধৃত উদাহরণে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে।

৪০.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রীতিমূলক অর্থালংকার

গূঢ় অর্থ (গূঢ়ার্থ) হচ্ছে কবিতার বা স্তবকের এমন অর্থ, যা লুকিয়ে থাকে শব্দ-বাক্যের আড়ালে। শব্দ-বাক্যের এক-একটা অর্থ থাকে, যা বোঝা যায় শব্দগুলি চেনা শব্দ হলেই। এই অর্থটা কথার বাইরের অর্থ। কিন্তু এই বাইরের অর্থে অনেক সময়ই কবির বক্তব্য ধরা পড়ে না, তখন কথাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ :

'কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'

এই বাক্যের প্রতিটি শব্দ চেনা শব্দ, বাক্যের অর্থও অতি সহজ। কিন্তু সমস্যাটা তখনই তৈরি হয়, যখন লক্ষ করি, 'কেরোসিন-শিখা' আর 'মাটির প্রদীপ'—বিদ্যুৎহীন গ্রাম-বাংলার এতদিনের অতি প্রয়োজনীয় এই দুটি

বস্তুর গলা টিপে ধরলে তাদের মৃত্যু ঘটবে, তারা নিবেই যাবে, কিন্তু একটি কথাও বলবে না। জাদুর কৌশলে পাথরের গণেশ দুধ খায়, প্লাস্টিকের পুতুল কথা বলে, কিন্তু মাটির প্রদীপ ভাই ভলে ডাকে অথবা কেরোসিন-শিখা গলা টেপার হুমকি দেয়, এমন দুঃসংবাদ কখনো শোনা যায়নি। কবির কথাটাই তখন প্রলাপের মতো শোনায়। অতএব বাইরের অর্থ এখানে মূল্যহীন। এখানেই জরুরি হয়ে ওঠে চেনা শব্দ-বাক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আর একটি অর্থ খুঁজে বার করা, যা কবির আসল বক্তব্য। ওই ভেতরের অর্থটিই গূঢ়ার্থ। সেই গূঢ়ার্থ যখন পাঠকেরক বোধে অনুভবে ধরা দেয়, তখন তার নাম গূঢ়ার্থপ্রতীতি। 'গূঢ়ার্থে'র এই 'প্রতীতি' যখন সৌন্দর্যের অনুভব হয়ে ওঠে অর্থের গুণে, তখনই তা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। কূঢ় অর্থের উজ্জ্বল আলোতে এসে 'কেরোসিন-শিখা' আর 'মাটির প্রদীপ' তখন গৃহকোণটিকে আলোকিত করার তুচ্ছ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, এসে দাঁড়ায় সমাজের বৃহত্তর অঙ্গানে, নির্দেশ করে সমাজের দুটি স্তরকে। তখন তারা শুধু কথাই বলে না, কঠিন সত্যের উচ্চারক হয়ে ওঠে।

ব্যাজস্তুতি

সংজ্ঞা : ভাষায় বা বাইরের অর্থে (বাচ্যার্থে) যাকে নিন্দা বা স্তুতি বলে মনে হয়, গভীর অর্থে (গূঢ়ার্থে) যদি তা যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা বলে বোঝা যায়, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যাজস্তুতি অলংকার।

(নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি।)

উদাহরণ :

১. নিন্দার ছলে স্তুতি—

(i) ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

ব্যাখ্যা : শিবকে নেশাখোর (ভাঙ্ খান) মাতাল (মত্ত) বলা হল। দুটি বিশেষণই নিন্দাসূচক। এ কথাও বলা হল, প্রতিটি বিষয়েই তাঁর অসন্তোষ, অতৃপ্তি। কেবলমাত্র বেলপাতা (বিল্বদল) পেলেই তিনি খুশি। সুতরাং, সব মিলিয়ে যে চরিত্রটি প্রকাশ পেল, তা সাধারণভাবে অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু 'কেবল তুষ্ট বিল্বদলে' কথাটির গভীরতর তাৎপর্য এই, অন্তরের ভক্তিটুকু মিশিয়ে তাঁকে একটুখানি স্মরণ করলেই তিনি তুষ্ট। এ কারণে শিবের আর একটি নাম আশুতোষ। তুষ্ট হলে যেকোনো কাম্যবস্তু অতি সহজেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। এইখানেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পরিচয়। বাক্যের নিন্দাসূচক ইঙ্গিত বাইরে থেকে পাওয়া গেলেও শিব প্রশংসিতই হলেন। নিন্দার ছলে স্তুতি প্রকাশ পেল বলে এখানকার অলংকার ব্যাজস্তুতি।

(ii) ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।।

সংকেত : আমার স্বামী ভূত নাচিয়ে বেড়ান, এমন বিয়ে যিনি দিলেন, সেই নিষ্ঠুর বাপের মৃত্যু হলেই ভালো। এ অর্থ নিন্দাসূচক। কিন্তু, আমার স্বামী ভূতনাথ—দেবাদিদেব মহাদেব, এমন স্বামীর সঙ্গো যিনি আমাকে ধন্য করেছেন, তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি হিমালয় পর্বত। এ অর্থ স্তুতিবাচক। নিন্দার ছলে স্তুতি।

২. স্তুতির ছলে নিন্দা—

(i) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/প্রথম সর্গ)

ব্যাখ্যা : 'সুন্দর মালা' যার গলায়, তিনিও সুন্দর, শ্রদ্ধেয়। অতএ, উদ্ধৃত বাক্যের অন্তর্গত সম্বোধনে সমুদ্রের (প্রচেতঃ) প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করা হল, বাহ্যত তা স্তুতি বা প্রশংসার ভাষা। কিন্তু, বাইরের অর্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে (গূঢ়ার্থ) পৌঁছলেই বোঝায় যায়, এ 'মালা' আসলে বানরসৈন্যের তৈরি সেতু, যার বন্ধনে বাঁধা পড়ে অলঙ্ঘ্য অজেয় সমুদ্র আজ রামচন্দ্রের কাছে বন্দি। এ 'সুন্দর মালা'র গূঢ়ার্থ পরাক্রান্ত সমুদ্রের পায়ে বাঁধা শিকল'। সমুদ্রের পক্ষে এ লজ্জার, নিন্দার বিষয়। ভাষায় যাকে স্তুতি বলে মনে হয়, অর্থে তা নিন্দা বলে বোঝা গেল। সুতরাং উদ্ধৃত বাক্যে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়েছে।

(ii) বন্ধু ! তোমার দিলে নাক দান
রাজ সরকার রেখেছেন মান !
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন। —নজরুল ইসলাম
(সর্বহারা/আমার কৈফিয়ৎ)

ব্যাখ্যা : 'রাজ সরকার' (ইংরেজ সরকার) সত্যি যদি কবির লেখাকে অমূল্য সম্পদ (যার অসীম মূল্য) গণ্য করে থাকেন, তবে কবির পক্ষে অবশ্যই তা সম্মানের, শ্লাঘার বিষয় এবং এ আচরণ ইংরেজ সরকারের পক্ষে প্রশংসার বিষয়। তবে, এই অর্থটি উদ্ধৃত স্তবকের বাইরের অর্থ (বাচ্যার্থ)। এই বাইরের অর্থে অবশ্যই রয়েছে ইংরেজ সরকারের প্রতি কবির স্তুতি। কিন্তু এই বাচ্যার্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে পৌঁছলেই বোঝা যাবে কবি প্রতি ইংরেজ সরকারের প্রকৃত আচরণটি। 'অ-মূল্য' শব্দটি প্রয়োগ করে (মূল্যহীন অর্থে) কবি ইঙ্গিত করলেন একটি তথ্যের দিকে—সরকার বিনামূল্যেই কবির লেখা সংগ্রহ করে নিয়েছিল ওগুলি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারের এই আচরণটি অবশ্যই নিন্দনীয়। গূঢ়ার্থে সেই নিন্দাই উচ্চারিত। অতএব, স্তবকটিতে রয়েছে ব্যাজস্তুতি।

স্বভাবোক্তি

সংজ্ঞা : বস্তুর আচরণ এবং স্বভাবের সূক্ষ্ম সুন্দর যথাযথ বর্ণনা যখন ওই বস্তুটিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, তখন সেই বর্ণনা থেকে সে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম স্বভাবোক্তি অলংকার।

(বস্তুর স্বভাবের সূক্ষ্ম সুন্দর যথাযথ বর্ণনাই স্বভাবোক্তি।)

উদাহরণ :

(i) কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে ?
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান ;

ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল ;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল ;
আমসত্ত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ—
এই-সব শিশিকৌটা ওষুধবিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে। —রবীন্দ্রনাথ
(সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

(ii) মাল চেনাচেনি দল জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে যত টানাটানি ; —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ব্যাখ্যা : তিনটি বাক্যাংশে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত বাক্যটিতে তিনটি ক্রিয়ার উল্লেখ আছে—'মাল চেনাচেনি', 'দর জানাজানি' আর 'কানাকড়ি নিয়ে .....টানাটানি'। তিনটি ক্রিয়ায় ব্যক্ত হয়েছে কোনো বস্তুর স্বভাবের তিনটি বিশেষ লক্ষ্মণ। বস্তুস্বভাবের বর্ণনাটি ওই তিনটি লক্ষণের দ্বারা এতই সূক্ষ্ম সুন্দর এবং যথাযথ হয়ে উঠছে যে, বস্তুটি যে হাট, এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। বর্ণনার মধ্য দিয়ে হাট-ই বিশেষভাবে চিহ্নিত হচ্ছে। অতএব, এখানকার অলংকার স্বভাবোক্তি।

৪০.১০ সারাংশ-৩

বিরোধমূলক :

কার্য-কারণ সম্পর্ক ঠিক রেখে কোনো ঘটনা যেমন ঘটবার কথা, তার উল্টোটা কোনো কবিতায় ঘটলেই বুঝব সেখানে 'বিরোধ' আছে। কিন্তু, এ বিরোধ বাইরের, ভেতরের অর্থে বিরোধ নেই। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'—'শিশুর পিতা'-র ঘুমিয়ে থাকার উল্টো ছবিতে 'বিরোধ'। এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার—বিরোধমূলক অর্থালংকার।

বিরোধাভাস : দুটি বস্তুর মধ্যে বাইরে থেকে বিরোধ দেখানো হলে বিরোধাভাস। 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়'—গ্রহীতা গ্রহণ করছে, দাতার ঋণ বাড়ছে, বাইরে থেকে এ কথায় রয়েছে বিরোধ। গ্রহীতা প্রেম যত গ্রহণ করছে, দাতা তত ধন্য হচ্ছে, ভেতরের এ অর্থ বুঝলেই বিরোধ মিলিয়ে যায়।

শৃঙ্খলামূলক :

সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ, কাউন্টারের পাশে সারিবদ্ধ ক্রেতা, আলমারির তাকে সাজানো বই দেখতে সুন্দর। কারণ শৃঙ্খলা। কবিতায় বাক্য বা বাক্যাংশের বিন্যাসে শৃঙ্খলার এই সৌন্দর্যই শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। 'পরশে

চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন, আর চুম্বনে মরণ' 'পরশ' থেকে 'চাহনি'-'চুম্বন' হয়ে 'মরণ'-এ উত্তরণ—তিনটি বাক্যাংশের এই বিন্যাসে রয়েছে শৃঙ্খলা।

একাবলি : আগের বাক্য-বাক্যাংশের থাকা বিশেষ্য-বিশেষণের পরের বাক্য-বাক্যাংশে বিশেষণ-বিশেষ্য হয়ে যাওয়ার নাম একাবলি। '.....কাব্য বর্ণনাবহুল, ...বর্ণনা চিত্রবহুল, ...চিত্র বর্ণবহুল'—বিশেষণ 'বর্ণনাবহুল' থেকে বিশেষ্য 'বর্ণনা', বিশেষণ 'চিত্রবহুল' থেকে বিশেষ্য 'চিত্র'।

ন্যায়মূলক :

'ন্যায়'-এর একটি অর্থ যুক্তি। এই 'ন্যায়' বা যুক্তির সহযোগে কোনো কথা কবিতা হয়ে উঠলে সেই কথার সৌন্দর্য হবে শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। 'ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি / মধ্যে রাখে ব্যবধান'—ঈর্ষা যে বড়োর ধর্ম, এটা বোঝাতে দুটি বড়ো গাছের মাঝখানে-থাকা ফাঁকা জায়গার যুক্তি বা 'ন্যায়ে'র সাহায্য নেওয়া হল।

অর্থান্তরন্যাস : একটি বাক্যের কথা (সামান্য বিশেষ কারণ বা কার্য) আর-একটি বাক্যের কথাকে (বিশেষ সামান্য কার্য বা কারণ) সমর্থন করলে অর্থান্তরন্যাস।

'হেন সহবাসে .... বর্বরতা কেন না শিখিবে ? / গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্ম্মতি'—দ্বিতীয় বাক্যের কথা (নীচের সঙ্গে মিশলে নীচ হতেই হয়) সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের কথাকে (রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে বিভীষণ তো বর্বরতা শিখবেই)।

গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক :

শব্দ-বাক্যের বাইরের তুচ্ছ অর্থ পেরিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল অর্থ (গূঢ়ার্থ) যখন পাঠকের বোধে অনুভবে ধরা দেয়, তখন তা গূঢ়ার্থপ্রতীতি। গূঢ়ার্থের এই প্রতীতি অর্থের গুণে যখন সৌন্দর্যের অনুভব হয়ে ওঠে, তখনই তা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। 'মাটির প্রদীপে'র পক্ষে 'ভাই' বলে ডাকা আর 'কেরোসিন শিখা'র পক্ষে গলা টিপে দেওয়া—এই বাইরের অর্থটা তুচ্ছ, অর্থহীন। কিন্তু ভেতরের অর্থে সমাজের দুটি স্তরের প্রতীক হিসেবে এদের সম্পর্কটা বাস্তব, অর্থপূর্ণ। গূঢ়ার্থের এই প্রতীতিতেই রয়েছে কথার সৌন্দর্য, অলংকার।

ব্যাজস্তুতি : বাইরের অর্থে নিন্দা বা স্তুতি থেকে ভেতরের অর্থে স্তুতি বা নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি। 'ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে'—নেশাখোর মাতাল অসন্তুষ্ট শিবের প্রতি নিন্দা বাইরের অর্থে, ভক্তজনের কাছে আশুতোষ শিবের প্রতি স্তুতি ভেতরের অর্থে—গূঢ়ার্থে। 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ'—সুন্দর মালা-পরা সমুদ্রের প্রতি স্তুতি বাইরের অর্থে, সেতুর বন্ধনে বন্দি সমুদ্রের প্রতি নিন্দা ভেতরের অর্থে—গূঢ়ার্থে।

স্বভাবোক্তি: বস্তুর স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা থেকে বস্তুটি বোঝা গেলেই স্বভাবোক্তি। 'মাল চেনাচেনি', 'দর জানাজানি', 'কানাকড়ি নিয়ে ..... টানাটানি'—এ সব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বস্তুটি হাট। বাইরের বর্ণনা থেকে ভেতরের বস্তুটির বোধ জেগে-ওঠা, এটা গূঢ়ার্থপ্রতীতি। এখানেই অলংকার।

৪০.১১ অনুশীলনী-৩

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ২৮৮-এর উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. বিরোধ শৃঙ্খলা ন্যায় আর গূঢ়ার্থপ্রতীতি—অর্থালংকারের এই চারটি লক্ষণ থেকে কীভাবে চারটি শ্রেণির অলংকার গড়ে ওঠে, একটি করে উদাহরণের সাহায্য নিয়ে সংক্ষেপে দেখিয়ে দিন।

২. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—বিরোধাভাস, একাবলি, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি।

৩. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।

(খ) পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি।
আস্তে একটু চলনা ঠাকুর-ঝি।

** ** ** **

জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরি ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?

(গ) গাছে গাছে ফল, ফুলে ফুলে অলি....

(ঘ) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।

একক ৪১ ❐ অলংকার-নির্ণয়

গঠন

৪১.১ উদ্দেশ্য
৪১.২ প্রস্তাবনা
৪১.৩ মূলপাঠ-১ ঃ অলংকার-নির্ণয়ের পদ্ধতি
৪১.৪ মূলপাঠ-২ ঃ অলংকার-নির্ণয়ের সমস্যা
৪১.৪.১ স্তবকে-স্তবকের অংশে পৃথক অলংকার
৪১.৪.২ একটি উদাহরণে একের বেশি অলংকার
৪১.৪.৩ অলংকার নিয়ে বিতর্ক
৪১.৫ অনুশীলনী
৪১.৫.১ অনুশীলনী-১
৪১.৫.২ অনুশীলনী-২
৪১.৬ গ্রন্থপঞ্জি
৪১.৭ উত্তরমালা

৪১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যে-পথ দেখানো হচ্ছে, তা অনুসরণ করে বাংলা অলংকারের চর্চা করলে—

- বাংলা কবিতা পড়তে পড়তে অলংকৃত স্তবকের অন্তর্গত অলংকারের সন্ধান সহজ অভ্যাসে পরিণত হবে।
- অলংকার নানারকম হলেও তাদের অন্তর্গত সূক্ষ্ম পার্থক্য বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা তৈরি হয়ে যাবে।
- বাংলা কবিতার অলংকার-চর্চায় ক্রমশ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।

৪১.২ প্রস্তাবনা

প্রথম তিনটি একক থেকে বাংলা কবিতার অন্তর্গত পনেরোটি অলংকারের পরিচয় পেলেন। অলংকার বিষয়ে অর্জন-করা এই তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োগ করার পালা একক ৮-এ। বাংলা কবিতার ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ-করা স্তবক বা চরণে কী ধরনের অলংকার রয়েছে, তা সন্ধান করার কৌশল এবং সেই সন্ধানের পথে সম্ভাব্য কিছু কিছু সমস্যার সমাধান-সূত্র এই এককে তুলে ধরা হল মূলপাঠকে দুটি অংশে ভাগ করে।

৪১.৩ মূলপাঠ-১ ঃ অলংকার নির্ণয়ের পদ্ধতি

পরপর তিনটি এককের মধ্য দিয়ে আপনি বাংলা কবিতার পনেরোটি অলংকারের কথা জানলেন। এই জানাটা দুভাবে হয়েছে—প্রথমে মূলপাঠে এক-একটি অলংকারের সংজ্ঞা (কাকে বলে) বৈশিষ্ট্য উদাহরণ আর

ব্যাখ্যা পড়ে পড়ে, তারপর অনুশীলনীতে নানারকম প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে। মূলপাঠ আপনার সামনে পনেরোটি অলংকারের পনেরোটি পৃথক পৃথক চেহারা তুলে ধরল, আপনি অলংকারগুলিকে চিনে রাখলেন। কতটা চিনলেন, তা নিজেই খানিকটা পরখ করে নিলেন অনুশীলনীতে। এখনকার এককে আপনার কাজ হবে কবিতার এক-একটা স্তবক বা চরণের উদাহরণ থেকে আপনার চেনা অলংকারটিকে সনাক্ত করা। অর্থাৎ মূলপাঠ থেকে অলংকারগুলির সঙ্গে আপনার যে পরিচয় তৈরি হল, সেই তত্ত্বজ্ঞান এবারে প্রয়োগ করবেন নানারকম উদাহরণের ওপর, বের করে আনবেন সঠিক অলংকারটির নাম আর তার গোত্র-পরিচয়। এরই নাম অলংকার নির্ণয়।

কীভাবে সম্ভব এই অলংকার-নির্ণয় বা অলংকার সনাক্ত করার কাজ ? সহজেই তা সম্ভব, যদি উদাহরণটি পড়তে পড়তে সেই লক্ষণটি আপনার কাছে ধরা পড়ে যায়, যা কেবল একটি বিশেষ অলংকারেরই বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণই একটি অলংকার থেকে আর-একটি অলংকারকে পৃথক করে চিনিয়ে দেয়। গোড়াতেই জেনেছেন, ধ্বনির ঝংকার থেকে চেনা যায় শব্দালংকার, অর্থের কৌশল থেকে ধরা পড়ে অর্থালংকার। জেনেছেন পাঁচটি লক্ষণের কথা (সাদৃশ্য-বিরোধ-শৃঙ্খলা-ন্যায়-গূঢ়ার্থপ্রতীতি), যারা অর্থালংকারকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে। প্রতিটি লক্ষণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে আরও কিছু বিশেষ লক্ষণ, যার ওপর ভর করে গড়ে ওঠে নানারকম অলংকার—একই শ্রেণির মধ্যে থেকেও পৃথক পৃথক অলংকার। এর ফলে, একই ধ্বনিঝংকারের লক্ষণ থেকে তৈরি হয় অনুপ্রাস-যমক-শ্লেষ-বক্রোক্তি, একই সাদৃশ্যের লক্ষণ থেকে স্বতন্ত্র অলংকার হয়ে ওঠে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি-অতিশয়োক্তি-ব্যতিরেক। অতএব, প্রতিটি অলংকারেরই আছে বিশেষ একটি লক্ষণ, আপনার পরিচিত পনেরোটি অলংকারের রয়েছে পনেরোটি বিশেষ লক্ষণ। লক্ষণগুলি এইরকম ঃ

অলংকার	বিশেষ লক্ষণ	অলংকার	বিশেষ লক্ষণ
১. অনুপ্রাস	একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি	৮. সমাসোক্তি	অন্য বস্তুর আচরণ।
২. যমক	একই ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্তি।	৯. অতিশয়োক্তি	উপমেয়ের উল্লেখ নেই, উপমানই প্রত্যক্ষ।
৩. শ্লেষ	একটি শব্দের একের বেশি অর্থ।	১০. ব্যতিরেক	সাধারণ ধর্মের কম-বেশি।
৪. বক্রোক্তি ঃ		১১. বিরোধাভাস	বিরোধের ভাব।
কাকু-বক্রোক্তি	প্রশ্ন		
শ্লেষ-বক্রোক্তি	বক্তা-শ্রোতার কাছে একই কথার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ।	১২. একাবলি	শৃঙ্খলা
		১৩. অর্থান্তরন্যাস	সমর্থন
৫. উপমা	সাধারণ তুলনা		
৬. রূপক	অভেদ	১৪. ব্যাজস্তুতি	নিন্দা প্রশংসা
৭. উৎপ্রেক্ষা ঃ		১৫. স্বভাবোক্তি	স্বভাব-বর্ণনার মাধ্যমে বস্তুর আভাস।
বাচ্যোৎপ্রেক্ষা	'যেন' শব্দে সংশয়ের ভাব		
প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা	সংশয়ের ভাব		

এই পনেরোটি অলংকারের পনেরো রকমের বিশেষ লক্ষণ আরও সূক্ষ্ম হয়ে আরও ডালপালা ছড়িয়ে

দেয় কোনো কোনো অলংকারের ক্ষেত্রে—এ কথাটাও আপনার জানা। যেমন, ধ্বনির পুনরাবৃত্তি থেকে তৈরি অনুপ্রাস ভাগ হতে পারে বৃত্ত্যনুপ্রাস-ছেকানুপ্রাস-শ্রুত্যনুপ্রাসে, সাধারণ লক্ষণ 'সাদৃশ্য' থেকে বেরিয়ে-আসা বিশেষ লক্ষণ 'অভেদে' তৈরি রূপকও হতে পারে নিরঙ্গ-সাঙ্গ-পরিস্পরিত। প্রথমে সাধারণ লক্ষণ, তা থেকে বিশেষ লক্ষণ, প্রয়োজন হলে তা থেকে আরও সূক্ষ্ম লক্ষণ। এই লক্ষণটি ধরা পড়লেই অলংকার বেরিয়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে।

ধরা যাক, 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়'—উদাহরণটি থেকে অলংকার খুঁজে বের করার দায়িত্ব আপনার। বার কয়েক উচ্চারণ করুন। আপনার সতর্ক কানে দেখি-আঁখি-পাখি ধ্বনিগুচ্ছ থেকে 'খ' ধ্বনির তিনবার উচ্চারণ ধ্বনির ঝংকার তুলবেই। সঙ্গে সঙ্গে আপনার অনুপ্রাস-জানা তত্ত্ববোধ বলে উঠবে—একই ব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে তৈরি বৃত্ত্যনুপ্রাস এখানে আছে। এখানেই শেষ নয়। ধ্বনির ঝংকার ছড়িয়ে অর্থের কৌশলও উঁকি মারছে। দূরের কিছু দেখার জন্য আকুল হয়ে ছুটছে 'আঁখি', 'পাখি' হয়ে—এইরকম একটা অর্থ কথাটির মধ্যে আছে। 'আঁখি' ছুটতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই তাকে 'পাখি' হয়ে যেতে হয়। 'পাখি'র সঙ্গে 'আঁখি'-র এই এক হয়ে যাওয়া—এরই নাম 'অভেদ'। 'অভেদ'-লক্ষণটি যে-মুহূর্তে ধরা পড়ল, সেই মুহূর্তেই চেনা গেল রূপক অলংকারটিকেও। আঁখি-পাখি'র কোনো অঙ্গের উল্লেখ নেই। অতএব, সূক্ষ্মতর লক্ষণটিও ধরা পড়ে গেল, শনাক্ত করা গেল নিরঙ্গরূপক অলংকারটিকে।

লক্ষণ থেকে অলংকার খুঁজে বের করা অলংকার-নির্ণয়-পর্বের প্রথম ধাপ। এখানে আপনার কাজ কেবল খুঁজে পাওয়া নির্দিষ্ট অলংকারটির নাম উল্লেখ করা। পরের ধাপে আপনার কাজ—কীভাবে অলংকারটি ওই উদাহরণে তৈরি হল, অলংকারের সংজ্ঞা ভেঙে ভেঙে তা ব্যাখ্যা করে দেওয়া। আসলে, একটি অলংকার তৈরি হবার জন্য যে যে শর্ত-পূরণ আবশ্যক, সংজ্ঞায় সেসবের উল্লেখ থাকে। কীভাবে শর্ত পূরণ হল, উদাহরণ থেকে তা দেখিয়ে দিলেই আপনার কাজ সম্পূর্ণ হবে। ওপরের 'আঁখি-পাখি'র উদাহরণটিই ধরুন। প্রথম দফায় কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট—'উদাহরণটিতে নিরঙ্গরূপক অলংকার রয়েছে।' এরপর স্মরণ করুন নিরঙ্গরূপক অলংকারের সংজ্ঞা, লক্ষ করুন এই অলংকারটি হবার জন্য সংজ্ঞায় কী কী শর্তের উল্লেখ আছে। দেখবেন, নিরঙ্গরূপক অলংকারের তিনটি শর্ত—উপমেয় একটিমাত্র হবে, তার ওপর উপমানের অভেদ আরোপ হবে (অর্থাৎ, ওই উপমেয়টি উপমানের সঙ্গে এক হয়ে যাবে), উপমেয়-উপমানের কোনো অঙ্গের অভেদ থাকবে না। এবারে লক্ষ করুন, 'আঁখি-পাখি'র উদাহরণটিতেও উপমেয় একটিমাত্র—'আঁখি'। তার ওপর উপমান 'পাখি'র অভেদ আরোপ হয়েছে—'আঁখি' 'পাখির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। 'আঁখি-পাখি'র কোনো অঙ্গের উল্লেখই নেই, অভেদ তো দূরের কথা। অতএব, দ্বিতীয় দফায় বলুন—'উদ্ধৃত উদাহরণটিতে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে একটিমাত্র উপমেয় 'আঁখি'র ওপর উপমান 'পাখি'র অভেদ আরোপ হয়েছে বলে অলংকারটি নিরঙ্গরূপক'। অবশ্য একই পদ্ধতিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকারটির কথাও জানাতে হবে, এবং তা শব্দালংকার বলে অর্থালংকারের আগেই জানানো সংগত।

এমনি করে, কবিতার স্তবকে চরণে, বাক্যে বা শব্দে নিহিত লক্ষণটি বুঝে নিয়ে অলংকারটি চিনে নিন। প্রথমে সাধারণ লক্ষণ, তারপর বিশেষ লক্ষণ, এবং আবশ্যক হলে সবশেষে সূক্ষ্মতম লক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। এরপর ওই অলংকারের সংজ্ঞা থেকে বুঝে নিন, কীভাবে নির্দিষ্ট শর্তগুলি পূরণ করে অলংকারটি উদ্ধৃত উদাহরণে তৈরি হল। বলতে বা লিখতে গিয়ে প্রথমে অলংকারটির নাম, তারপর শর্ত-পূরণের ব্যাখ্যা—এই দুটি কাজ করলেই অলংকার-নির্ণয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হবে।

৪১.৪ মূলপাঠ-২ ঃ অলংকার-নির্ণয়ের সমস্যা

অলংকার নির্ণয়ের পদ্ধতি জানার পরেও কিছু কিছু সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। প্রধানত তিন রকমের সমস্যা অলংকার-নির্ণয়ের কাজটিকে মাঝে মাঝে খানিকটা ধোঁয়াটে করে দেয়। অতএব এ-বিষয়ে গোড়া থেকেই সতর্ক থাকা ভালো। সমস্যা তিনটি এইরকম—এক, একটি গোটা স্তবকে একরকমের অলংকার, অথচ স্তবকটির অংশবিশেষ পৃথক হয়ে গেলে তৈরি হতে পারে আর এক রকমের অলংকার। দুই, একই উদাহরণে একটি অলংকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে আর একটি অলংকার। তিন, একই উদাহরণে দু-তিন রকমের লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যদিও তার মধ্যে একটি লক্ষণই সঠিক এবং তা থেকে বেরিয়ে-আসা অলংকারটিই হবে সঠিক অলংকার। কয়েকটি উদাহরণের ব্যাখ্যা থেকে এই সমস্যা-তিনটি বুঝে নেবার চেষ্টা করুন।

৪১.৪.১ স্তবকে-স্তবকের অংশে পৃথক অলংকার

অলংকার একটি কবিতা বা স্তবকের সমগ্র শরীরে ছড়ানো থাকতে পারে, স্তবকের একটি অংশে—বাক্যে বা চরণে আবদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু একটি সমগ্র স্তবকের অলংকার আর তার একটি অংশের অলংকার এক হতে পারে, ভিন্নও হতে পারে। তার ফলে, কোনো স্তবকের অলংকার সম্পর্কে তৈরি ধারণা বা জ্ঞান ওই স্তবকের কোনো অংশের অলংকার নির্দেশ করতে সাহায্য না-ও করতে পারে। ওই অংশের অলংকার বিবেচনা হবে একেবারেই স্বতন্ত্র। সমগ্র স্তবকে একটি অলংকার, অংশবিশেষ অন্য একটি অলংকার—এইরকম কয়েকটি উদাহরণ থেকে অলংকার নির্ণয় করে দেখানো হচ্ছে।

উদা. ১.

নিদ্রাবিহীন শশী।
আকাশ-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।

অলংকার ঃ সমগ্র স্তবকে সমাসোক্তি, দ্বিতীয় চরণটিতে কেবল নিরঙ্গরূপক।

ব্যাখ্যা ঃ উদ্ধৃত উদাহরণে বর্ণনীয় বিষয় বা উপমেয় 'শশী'। উপমানের উল্লেখ নেই। 'নিদ্রাবিহীন' বিশেষণটি 'শশী'র ওপর মানুষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছে। 'খেয়া একলা চালায় বসি'—এ ব্যবহার মাঝির, আরোপ করা হয়েছে ওই উপমেয় 'শশী'র ওপর। 'নিদ্রাবিহীন' বিশেষণটিও মাঝিরই প্রাপ্য। অতএব, 'মাঝি'ই এখানে উপমান। উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হয়েছে বলে উদাহরণটির অলংকার সমাসোক্তি।

উদাহরণটির দ্বিতীয় চরণে উপমেয় 'আকাশ' 'পারাবার' (সমুদ্র)। 'খেয়া একলা চালায় বসি'—এই বাক্যাংশে উপমানের অনুগামী। অতএব, উপমেয় 'আকাশ'-এর ওপর উপমান 'পারাবার'-এর অভেদ আরোপ করা হয়েছে। একটি উপমেয়ের ওপর একটি, উপমানের অভেদ আরোপে এখানকার অলংকার কেবল নিরঙ্গরূপক।

উদা. ২.

শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্রমেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?

অলংকার ঃ সমগ্র স্তবকে সাঙ্গরূপক, দ্বিতীয় অংশে পরম্পরিত রূপক।

ব্যাখ্যা ঃ উদ্ধৃত স্তবকে অঙ্গী উপমেয় 'আকাশ', উপমেয়ের অঙ্গ 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না', 'ধরা' ; অঙ্গী উপমান 'গাঙ', উপমানের অঙ্গ 'পাল', 'তরী', 'ঘাট'। উদাহরণটিতে 'পালটি মেলে', 'তরী বেয়ে' ইত্যাদি বাক্যাংশে উপমানের অনুগামী। অতএব, অঙ্গী উপমেয় 'আকাশ'-এর ওপর অঙ্গী উপমান 'গাঙ'-এর অভেদ আরোপ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে উপমেয়ের অঙ্গ 'মেঘ,' জ্যোৎস্না', 'ধরা'র ওপর উপমানের অঙ্গ যথাক্রমে 'পাল', 'তরী', 'ঘাট'-এর অভেদ আরোপিত হয়েছে। সুতরাং, সমগ্র উদাহরণে আছে সাঙ্গরূপক অলংকার। (বিস্তৃত ব্যাখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠায়)।

উদাহরণটির তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রদুটিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে রয়েছে দুটি করে উপমেয়-উপমান। প্রথম উপমেয় 'জ্যোৎস্না', উপমান 'তরী'। 'বেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়াটি উপমান 'তরী'র অনুগামী, উপমেয় 'জ্যোৎস্না' উপমান 'তরী'র সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। 'জ্যোৎস্না'র ওপর 'তরী'র এই অভেদ-আরোপে একটি নিরঙ্গ রূপক হল। যে যাত্রী জ্যোৎস্নার পথে চলতে চলতে 'ধরা'য় (পৃথিবীতে) নেমে আসে, তার আশ্রয় 'জ্যোৎস্না' ইতোমধ্যেই 'তরী'র সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় কবিকে লক্ষ্যবিন্দু 'ঘাটে'র সন্ধান করতেই হল। অতএব, যাত্রীর গন্তব্যস্থল উপমেয় 'ধরা' উপমান 'ঘাটে'র সঙ্গে এক হয়ে গেল। 'ধরা'র ওপর 'ঘাটে'র এই অভেদ-আরোপে আর একটি নিরঙ্গ রূপক তৈরি হল। প্রথম অভেদ-আরোপের কারণেই দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ অনিবার্য হয়ে উঠল বলে অলংকারটি এখানে পরম্পরিত রূপক।

৪১.৪.২ একটি উদাহরণে একের বেশি অলংকার

সমগ্র স্তবক জুড়ে একটি অলংকার, স্তবকের অংশবিশেষে অন্য একটি অলংকার আমরা দেখলাম। অংশটি স্তবক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে, পৃথক অলংকার দেখাতে পারে। এবারে সমগ্র স্তবকে অথবা স্তবকের অংশবিশেষে একাধিক অলংকারের সহাবস্থান দেখতে পাব।

মৌলোভী যত মৌলবী আর মোল্লারা কন হাত নেড়ে।

অলংকার ঃ শ্রুত্যনুপ্রাস, সার্থক যমক।

ব্যাখ্যা ঃ উদ্ধৃত চরণটিতে 'মৌলোভী' আর 'মৌলবী' শব্দদুটির অন্তর্গত 'ব-ভ-ম' ব্যঞ্জন-তিনটি ভিন্ন হলেও বাগযন্ত্রের একই স্থান ওষ্ঠ-অধরের সংযোগে উচ্চারিত। ফলে, ওই তিনটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনায়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে। কেননা, কানে তারা একই ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তির মতোই শোনায়। অতএব, এটি শ্রুত্যনুপ্রাস।

'ভ'-'ব' ব্যঞ্জনটি শ্রুতিতে একই ধ্বনি হিসেবে গণ্য। অতএব, 'মৌলোভী' আর 'মৌলবী'ও শ্রুতিতে একই ধ্বনিগুচ্ছ, অর্থবহ বলে একই শব্দ হিসেবে গণ্য হতে পারে। শব্দটি দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থে—প্রথমে উচ্চারিত 'মৌলোভী' অর্থ 'মধুর প্রতি লোভ যার', দ্বিতীয়বার উচ্চারিত 'মৌলবী' অর্থ 'মুসলমান বিদ্বান ব্যক্তি'। অতএব, এখানে রয়েছে সার্থক যমক অলংকার।

৪১.৪.৩ অলংকার নিয়ে বিতর্ক

একই স্তবকে বাক্যে বা চরণে পৃথক বা একাধিক অলংকার কবির সচেতন সৃষ্টি হতে পারে। লক্ষণ বিচার করে সেসব অলংকার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য কাজ নয়। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন অলংকার-নির্ণয়ে বিভ্রান্তি আসে, নানারকমের লক্ষণ একই উদাহরণে জট পাকায়। পণ্ডিতে পণ্ডিতে তখন তর্ক বাঁধে। তর্ক এড়িয়ে

আমরা এরকম কয়েকটি বিতর্কিত উদাহরণ থেকে সঠিক অলংকার-নির্ণয়ের চেষ্টা করব, ব্যাখ্যা করে নয়—আলোচনা করে।

উদা. ১.

সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী। —কৃত্তিবাস ওঝা

অলংকার ঃ উপমা (উৎপ্রেক্ষা নয়)।

আলোচনা ঃ উদ্ধৃত পংক্তিতে উপমেয় 'সীতা-আমি (রাম)', উপমান 'মণি-ফণী'। সাধারণ ধর্ম 'প্রিয়বস্তুর হারিয়ে যাওয়া', সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যেন'। 'কাব্যশ্রী' (সুধীরকুমার দাশগুপ্ত) এবং 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা' (শ্যামাপদ চক্রবর্তী) গ্রন্থে অলংকারটিকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলা হয়েছে, কিন্তু 'বাংলাকাব্যের রূপ ও রীতি' গ্রন্থে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এখানে উপমা অলংকারের সন্ধানই পেয়েছেন, তার বেশি নয়। উপমার শর্ত—একই বাক্যে দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে শর্ত পূরণ হয়েছে এইভাবে ঃ বাক্য একটিই, 'সীতা' আর 'সাপের মাথার মণি' অথবা 'রাম' আর 'ফণী' (সাপ) দুটি করে বিজাতীয় বস্তু, এদের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। (রাম হারিয়েছেন সীতাকে, ফণী হারিয়েছে মণি), বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ নেই। এ পর্যন্ত উপমারই লক্ষণ। উৎপ্রেক্ষার জন্য আবশ্যক আরও একটি শর্ত পূরণ—গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট (প্রবল) সংশয়। 'যেন' অবশ্যই সংশয়বাচক হতে পারে। উৎপ্রেক্ষার জন্য একমাত্র আবশ্যক লক্ষণ 'উৎকট সংশয়' এবং তার কবিত্বময় প্রকাশ। এক্ষেত্রে আবশ্যক ছিল আরও একটি বাক্য বা শব্দগুচ্ছ, যা ওই সংশয়ের ছবিটা তুলে ধরতে পারত। উদ্ধৃত পঙক্তিতে তা নেই, এমনকী সাধারণ ধর্মও ক্রিয়াপদের আশ্রয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। প্রবল সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশের অভাবেই এটি উৎপ্রেক্ষা হতে পারছে না। অথচ, এই রামচন্দ্রই কৃত্তিবাসী রামায়ণের একই প্রসঙ্গে একটু পরে 'ধনুকে দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে' (কৃত্তিবাসী রামায়ণ/শ্রীরামের বিলাপ ও সীতা-অন্বেষণ)। এই পঙ্‌ক্তিটিতে 'ধনুর্গুণ' 'সর্পের গর্জন' হয়ে উঠেছে কবির কাছে, পাঠকের কাছে গর্জনশীল সর্পের ছবিটা 'যেন' শব্দের সহযোগে এখানে প্রত্যক্ষ। 'ধনুর্গুণ'-এ সর্প গর্জনের সংশয়টাও প্রবল এবং 'গর্জ্জে' ক্রিয়ার আনুকূল্যে কবিত্বময়। এখানে অবশ্যই উৎপ্রেক্ষা।

উদা. ২.

আমাদের জীবনের নদী মৃত্যুর সমুদ্রে মিশিয়াছে। —বুদ্ধদেব বসু

অলংকার ঃ পরম্পরিত রূপক (সাঙ্গরূপক নয়)।

আলোচনা ঃ উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে দু-জোড়া উপমেয়-উপমান। প্রথম উপমেয় 'জীবন', উপমান 'নদী' ; দ্বিতীয় উপমেয় 'মৃত্যু', উপমান 'সমুদ্র'। জীবন নদীর রূপ ধরে সমুদ্রে মিশছে, অথবা মৃত্যু সমুদ্রের রূপ ধরে নদীকে আকর্ষণ করছে, এইরকম অভেদ-কল্পনা থাকার ফলে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। এ নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু বিতর্ক তৈরি হয় অলংকারটিকে রূপকের কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করব, তাই নিয়ে। 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'-য় শ্যামাপদ চক্রবর্তী একে সাঙ্গরূপক বলেছেন। সাঙ্গরূপকের শর্ত 'অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়-উপমানের অভেদ'। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে দুটি উপমেয়—জীবন, মৃত্যু ; দুটি উপমান—নদী, সমুদ্র। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে এবং নদী-সমুদ্রের মধ্যে অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক থাকলে অবশ্যই রূপকটি 'সাঙ্গ' হবে। আর, পরম্পরিত রূপকের শর্ত, 'একটি অভেদের কারণে আর একটি অভেদের জন্ম'। জীবন-নদীর অভেদের কারণে মৃত্যু-সমুদ্রের অভেদ হয়ে থাকলে রূপকটি 'পরম্পরিত' হবে। প্রথমত, 'মৃত্যু' জীবনের অঙ্গ নয়, পরিণাম ; সমুদ্র-ও নদীর অঙ্গ নয়, অন্যতম আশ্রয়। অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক এদের মধ্যে না-ভাবাই সংগত। দ্বিতীয়ত, জীবনকে নদীর সঙ্গে অভিন্ন

করে দেওয়ার কারণেই মৃত্যু-সমুদ্রের অভেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কারণ-কার্যের ধারা বা পরম্পরা প্রবল বলে একে পরম্পরিত রূপকই বলব।

উদা. ৩.

শ্যামশুকপাখী সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরিল নয়নফাঁদে।
হৃদয়পিঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকলে বেঁধে॥

—চণ্ডীদাস

অলংকার ঃ সাঙ্গারূপক (পরম্পরিত রূপক নয়)।

আলোচনা ঃ উদ্ধৃত স্তবকে সরাসরি চারজোড়া উপমেয়-উপমান—শ্যাম-শুকপাখী, নয়ন-ফাঁদ, হৃদয়-পিঞ্জর আর মন-শিকল। উপমেয় শ্যাম, নয়ন, হৃদয়, মন ; উপমান শুকপাখী, ফাঁদ, পিঞ্জর, শিকল। অভেদ প্রতিটি ক্ষেত্রে, অতএব রূপক অলংকার। উপমেয়-পক্ষে অঙ্ক নয়ন, হৃদয়, মন। তবে, নয়ন-হৃদয়-মন শ্যামের অঙ্গ নয়, রাধার (রাই) অঙ্গ। অতএব, 'শ্যাম' অঙ্গী হতে পারে না। অঙ্গী হতে হয় রাধাকেই। উপমান-পক্ষে অঙ্গ ফাঁদ, পিঞ্জর, শিকল। 'পাখী' এদের অঙ্গী নয়, অঙ্গী হতে পারত 'ব্যাধ', যা এখানে লুপ্ত। তবে উপমেয় অঙ্গগুলির অঙ্গী হিসেবে 'রাধা' (রাই) উপস্থিত থাকায় অঙ্গী উপমান হিসেবে 'ব্যাধ'-কে কল্পনা করাই যায়, ফাঁদ-পিঞ্জর-শিকল অঙ্গগুলি যখন চোখের সামনেই রয়েছে। এইটুকু মেনে নিতে পারলে এখানে সাঙ্গারূপকের সন্ধান পেতে কোনো সমস্যা নেই। 'বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি'তে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস তাই করেছেন। সেক্ষেত্রে 'শ্যাম'কেও রাধার অঙ্গ, আর 'শুকপাখী'কে ব্যাধের অঙ্গ করে নিতে হয়, একজন প্রেমের শিকার আর একজন পেশার শিকার হিসেবে।

কিন্তু 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'য় অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা অন্যরকম। তাঁর ব্যাখ্যামতে 'শ্যাম-শুকপাখীর রূপক হওয়ার কারণেই নয়ন-ফাঁদ, হৃদয়-পিঞ্জর, মন-শিকল রূপকের জন্ম—অতএব পরম্পরিত রূপক।

একমাত্র শ্যামের সঙ্গে রাধার বা 'শুকপাখী'র সঙ্গে ব্যাধের অঙ্গ-অঙ্গী সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, থাকলে 'শ্যাম-শুকপাখী' রূপকটিকে বাদ দেওয়া সম্ভব। যদি রাধা আর ব্যাধকে উপমেয়-উপমান বলে মেনে নিই, তবে রাধার সঙ্গে বাকি উপমেয়ের এবং ব্যাধের সঙ্গে বাকি উপমানের অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট, অর্থাৎ 'রাধা-ব্যাধে'র রূপক গ্রাহ্য বলে এখানে অলঙ্কার হবে সাঙ্গারূপক। আমাদের সমর্থন অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের পক্ষে। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর পরম্পরিত রূপক মানব না, যেহেতু কার্য-কারণ সম্পর্কটি এখানে অস্পষ্ট। এরকম কার্যকারণ-সম্পর্ক প্রতিটি সাঙ্গারূপকের উদাহরণেই আবিষ্কার করা সম্ভব, তেমনটি হলে 'সাঙ্গারূপক' প্রকরণ হিসেবেই অবান্তর হয়ে পড়ে।

৪১.৫ অনুশীলনী

৪.৩-এর মূলপাঠ থেকে অলংকার-নির্ণয়ের পদ্ধতি শিখলেন, দুটি দফায় কী করে কাজটি করতে হয় তা জানলেন। ৪.৪-এর মূলপাঠ থেকে অলংকার-নির্ণয়ের পথে সম্ভাব্য সমস্যার কথাও মাথায় রইল। এবারের কাজ,অলংকার-নির্ণয়ের মূল কাজটিতে মাথা দেওয়া। এ কাজের অনুশীলন দুটি ভাগে ভাগ করে দেখুন। প্রথম ভাগে যেসব উদাহরণ থেকে অলংকার-নির্ণয় করতে বলা হবে, তার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হবে সাধারণ

লক্ষণটি (ধ্বনি-ঝংকার, সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা), কেনো ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণটি (সমর্থন, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি)। সাধারণ লক্ষণ থেকে বিশেষ লক্ষণ, প্রয়োজনে বিশেষ লক্ষণ থেকে সূক্ষ্মতম লক্ষণ বুঝে নিয়ে নির্দিষ্ট অলংকারটির নাম লিখুন। সেই সঙ্গে সংক্ষেপে কেবল কী কী শর্ত পূরণ হল তার উল্লেখটুকু করুন। দ্বিতীয় ভাগে করুন অলংকার-নির্ণয়ের পুরো কাজটি—লক্ষণ বুঝে নিয়ে অলংকারের নাম লেখা, তারপর অলংকারটির সংজ্ঞা থেকে শর্ত খুঁজে নিয়ে উদাহরণটিতে সেসব শর্ত পূরণ কীভাবে হল, তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া।

৪১.৫.১ অনুশীলনী-১

(নীচের উদাহরণগুলির সঙ্গে সাধারণ বা বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ জুড়ে দেওয়া হল। অলংকারের নাম আর সংক্ষেপে শর্ত-পূরণের সংকেতটুকু লিখুন। সব উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ২৮৯-এর উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. সাধারণ লক্ষণ 'ধ্বনির ঝংকার' ঃ

(ক) কে বলে রে ভোল নাই ?

(খ) উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে।

(গ) আছে কি কি বীজ কবিত্ব-কলায়।

(ঘ) লীলাপদ্ম হাতে, কুরুবক মাথে।

(ঙ) রক্তমাখা, অস্ত্রহাতে যতো রক্ত আঁখি।

(চ) কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি।

২. সাধারণ লক্ষণ 'সাদৃশ্য' ঃ

(ক) অকলঙ্ক মুখ তব কলঙ্কী চন্দ্রের মতো নহে।

(খ) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল-খসা।

(গ) নারীর অধরে হায় পান করে কালকূট মানে না বারণ।

(ঘ) আমি জানি, কিছুই থাকে না,
পলকে শুকায়ে যায়—সবই যেন সাবানের ফেনা।

(ঙ) মরণের শীত নিবারণ করে
বরফের কাঁথা ঢাকি !

(চ) রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে।

৩. সাধারণ বা বিশেষ লক্ষণ কোনোটিতে 'বিরোধ', কোনোটিতে 'শৃঙ্খলা', কোনোটিতে 'সমর্থন', কোনোটিতে 'নিন্দা-প্রশংসা' ঃ

(ক) কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ ?

(খ) বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।

(গ) শমনদমন রাবণরাজা রাবণ-দমন রাম।

(ঘ) কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন

(ঙ) আকাশ যেথায়ে সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত

(চ) বাঁচিতাম সে মুহূর্তে মরিতাম যদি—

(ছ) দুঃখের মজা ক্রন্দনে, ক্রন্দনের মজা কীর্তনে।

(জ) কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।

৪১.৫.২ অনুশীলনী-২

(নীচের উদাহরণগুলির অলংকার নির্ণয় করুন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অলংকারের নাম লিখন, কীভাবে অলংকারটি তৈরি হল তা ব্যাখ্যা করুন। সব উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ২৯০-এর উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।

২. জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে.....

৩. এ পুরীর পথ-মাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি তার।

৪. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

৫. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ?

৬. হলুদ পাতার মত, আলোয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ছেঁড়া-মেঘ আকাশের ধারে।

৭. যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে তব কিছু নাই।

৮. পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।

৯. কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

১০. ওগো আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ—
তাইতো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানি,
কখনো জাফরানি।

১১. কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি।

১২. কপোতদম্পতী
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

১৩. অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

১৪. জলে সে নহে পদ্ম নাহি যাহে,
পদ্ম নহে নাহি যেথায় অলি,
অলি সে নয় গান যে নাহি গাহে,
গান সে নহে হৃদয়মন না যায় যাহে গলি।

১৫. যাইতে মানস-সরে
কার না মানস সরে ?

১৬. দূরে বালুচরে রোদ কাঁপে থর' থর'
ঝিঁঝির পাখার চেয়ে সে তীব্রতর।

১৭. সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

১৮. কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ?

১৯. কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে,
গগনের নীলগাঙে,
হাবুডুবু খায় তারাবুদ্‌বুদ্‌
জোছনা সোনায় রাঙে !

২০. বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী' পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা।

২১. ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষমানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।

২২. ষোলটি বছরে জমানো অশ্রু
জমাট পাথরে হতেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছাতে
মাটিতে বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা !

২৩. উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন্ড্রণগুচ্ছ।

২৪. নানা বেশভূষা হীরা রূপাসোনা
এনেছি পাড়ার কবি উপাসনা।

২৫. পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক্‌ ঝঙ্কার।

৪১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্যামাপদ চক্রবর্তী ঃ অলঙ্কার চন্দ্রিকা
২. জীবেন্দ্র সিংহ রায় ঃ বাঙলা অলঙ্কার
৩. সুধীন্দ্র দেবনাথ ঃ বাংলা কবিতার অলংকার

৪১.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী ৩৮.৫

১. যে রচনা সুন্দর হলে কবিতা হয়ে ওঠে, তাকে সুন্দর করার আয়োজনই কবিতার অলংকার।

২. (ক)

	আলংকারিক	গ্রন্থ	কাল
১.	ভরতমুনি	নাট্যশাস্ত্র	খ্রিস্টপূর্ব এক-শতক
২.	আচার্য দণ্ডী	কাব্যদর্শ	খ্রিস্টোত্তর ছ-শতক
৩.	আচার্য ভামহ	কাব্যলঙ্কার	খ্রিস্টোত্তর সাত-শতক
৪.	বামনাচার্য	কাব্যলঙ্কারসূত্রবৃত্তি	খ্রিস্টোত্তর আট-শতক
৫.	বিশ্বনাথ কবিরাজ	সাহিত্যদর্পণ	খ্রিস্টোত্তর চোদ্দ-শতক

(খ) বামনাচার্যের 'কাব্যং গ্রাহ্যং হ্যলঙ্করাৎ। সৌন্দর্যলঙ্কারঃ' সূত্রের দ্বিতীয় অর্থ—অলংকার কাব্যের বিশেষ (অঙ্গাভূত) সৌন্দর্য।

৩. (ক) একটিমাত্র শব্দ, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য, একটি স্তবক বা ছোটোমাপের একটি কবিতার আয়তন জুড়ে।

(খ) ধ্বনিরূপ, অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ কানে, অর্থরূপ মনে-মস্তিষ্কে।

৪. শব্দালংকার, অর্থালংকার। ধ্বনির মাধুর্য শ্রোতার কানকে তৃপ্ত করলে, অর্থের সৌন্দর্য শ্রোতর বোধকে উদ্দীপিত করলে।

অনুশীলনী ৩৯.৫

১. 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থ—ধ্বনি, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি (উচ্চারণে)। শব্দালংকারের 'শব্দ' মূলত ধ্বনিই—বর্ণধ্বনি, শব্দধ্বনি (অর্থাৎ, অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টি থেকে অর্থ বাদ দিয়ে কেবল ধ্বনিটুকু), বা বাক্যধ্বনি। শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার।

২. ২.৩ মূলপাঠে দেওয়া দ্বিতীয় উদাহরণের 'চিনি' অথবা তৃতীয় উদাহরণের 'বর' শব্দটির প্রয়োগ থেকে বুঝিয়ে দিন, 'চিনি' বা 'বর'-এর অলংকার-নির্মাণে আছে ধ্বনির মাধুর্য আর অর্থের চমক। কিন্তু, ধ্বনির মাধুর্যই শব্দালংকার, অর্থের চমক অলংকার নয়। অতএব, শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার, অর্থের অলংকার নয়।

৩. অনুপ্রাস— বৈচিত্র্যের দিক থেকে বৃত্ত্যনুপ্রাস ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ; প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস।

যমক— বৈচিত্র্যের দিক থেকে সার্থক, নিরর্থক যমক ; প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে আদ্য-মধ্য-অন্ত্য সর্বযমক।

শ্লেষ— অভঙ্গা ; সভঙ্গা শ্লেষ।

বক্রোক্তি— কাকু, শ্লেষ-বক্রোক্তি।

৪. ২.৩ মূলপাঠ-এর পৃঃ ১৮-১৯ দেখুন।

৫. (ক) সভঙ্গা শ্লেষ (পৃথিবী টাকার বশ, পৃথিবীটা কার বশ)।

(খ) আদ্য যমক, সার্থক যমন (ভারত = ভারতচন্দ্র রায়, ভারতবর্ষ)।

(গ) শ্রুত্যনুপ্রাস (দুটি-উঠি, ট-ঠ, কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত)।

(ঘ) ছেকানুপ্রাস (লঙ্কার-পঙ্কজ 'ঙ্ক' দুবার উচ্চারিত)।

(ঙ) বৃত্ত্যনুপ্রাস ('ক' চারবার, শ-স চারবার উচ্চারিত)।

৬. (ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস ; (খ) যমক ; (গ) ছেকানুপ্রাস।

অনুশীলনী-১ ৪০.৫

১. কবিতার স্তবক চরণ বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, অর্থ বাঁচিয়ে শব্দ বদল করে দিলেও যদি সে অলংকার টিকে যায়, তবে তা হবে অর্থালংকার।

২. ৩.৩ মূলপাঠ-১ এর উদাহরণ থেকে 'মউজ' আর 'গগন' শব্দদুটির বদলে 'ঢেউ' আর 'আকাশ' প্রয়োগ করে বুঝিয়ে দিল, অলংকারটি অর্থকে আশ্রয় করেই বাঁচে। আর, অর্থের সৌন্দর্যই অর্থালংকার।

৩. এক, শব্দালংকার ধ্বনির মাধুর্য, অর্থালংকার অর্থের সৌন্দর্য ; দুই, শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে, অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।

তিন, শব্দালংকারের অপমৃত্যু শব্দবদলে, অর্থালংকারের অপমৃত্যু শব্দবদলে নয়—শব্দ আর অর্থের বদলে।

৪. সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক।

অনুশীলনী-২ ৪০.৮

১. ৩.৬ মূলপাঠ-২-এর 'ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়'-এর মতো এমন একটি উদাহরণ তৈরি করুন, যেখানে দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হবে। নিতান্ত বিসদৃশ দুটি বস্তুর মধ্য থেকে সাদৃশ্য বের করে এনে তা দিয়ে কবিরা যখন কথার ছবি নির্মাণ করেন, তখনই গড়ে ওঠে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার।

২. এক, বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়েও তাদের সমান মূল্য দিয়ে।

দুই, বস্তু দুটির পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করে।
তিন, বস্তুদুটির পার্থক্য বা ভেদকে প্রাধান্য দিয়ে।

(৩.৬ মূলপাঠ-২-এ দেওয়া উদাহরণ তিনটির মতো অন্য তিনটি উদাহরণ তৈরি করে পরপর লিখুন।)

৩. এমন একটি উদাহরণ তৈরি করুন, যেখানে নীচের চারটি অঙ্গাই থাকবে—

এক, যা তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু—উপমেয়।

দুই, যার সঙ্গে তুলনা—উপমান।

তিন, যে ধর্ম দুটি বস্তুতেই থাকে—সাধারণ ধর্ম।

চার, যে ভঙ্গিতে তুলনা করা হয়—ভঙ্গি। 'ভাঙ্গা' বদলালে অলংকার বদলে যায়।

৪. ৩.৬ মূলপাঠের পৃঃ ২৬-৩৪ দেখুন।

৫. (ক) ব্যতিরেক (উপমান 'বজ্রে'র চেয়ে উপমেয় 'কণ্ঠস্বর'-এর উৎকর্ষ)।

(খ) অতিশয়োক্তি (উপমেয় 'অশ্রু' লুপ্ত, উপমান 'মুকুতা' প্রবল)।

(গ) সমাসোক্তি (উপমেয় 'তটিনী'র ওপর উপমান 'নায়িকা'র ব্যবহার আরোপ)।

(ঘ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় 'ভগবতী'কে উপমান 'তরঙ্গ' বলে সংশয়)।

(ঙ) পরম্পরিত রূপক ('অনুশোচনার আগুন' নিরঙ্গারূপক, তা থেকে 'উৎসাহের কয়লা'—এই নিরঙ্গারূপকের জন্ম।)

(চ) লুপ্তোপমা (উপমের 'সন্ধ্যা', উপমান 'কলাপাতা', সাধারণ ধর্ম—সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত ; সন্ধ্যা-কলাপাতা বিজাতীয় বস্তু)।

অনুশীলনী-৩ ৪০.১১

১. 'বিরোধাভাস' অলংকারের একটি উদাহরণে দেখিয়ে দিন, এর লক্ষণ 'বিরোধ'—অতএব, অলংকারটি বিরোধমূলক অর্থালংকারের শ্রেণির। একইভাবে দেখান, 'একাবলি' অলংকারের উদাহরণের 'শৃঙ্খলা', 'অর্থান্তরন্যাস' অলংকারের উদাহরণে 'সমর্থন'-এর যুক্তি বা 'ন্যায়' আর 'ব্যাজস্তুতি' অলংকারের উদাহরণে বাইরের অর্থে নিন্দার আড়ালে ভেতরের অর্থে বা 'গূঢ়াথে' স্তুতি বা 'গূঢ়ার্থপ্রতীতে'—এই লক্ষণগুলি থেকে গড়ে উঠছে যথাক্রমে শৃঙ্খলামূলক ন্যায়মূলক গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার।

২. ৩৯.৯ মূলপাঠ-৩-এর পৃঃ ৩৯-৪৬ দেখুন।

৩. (ক) ব্যাজস্তুতি বাইরে নিন্দা নিষ্ঠুর বাপ, অকর্মণ্য বর, ভেতরে স্তুতি বা প্রশংসা পাষাণ বাপ = হিমালয়, হেন বর = মহাদেব)।

(খ) স্বভাবোক্তি (অন্ধ একটি বধূর স্বভাব-বর্ণনা)।

(গ) একাবলি (আগের বিশেষ্য 'ফুল' পরে 'অলি'র বিশেষণ হয়েছে)।

(ঘ) বিরোধাভাস ('ফাঁসির মঞ্চে' মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গাওয়া—বাইরে বিরোধ)।

অনুশীলনী -১ ৪১.৫.১

১. (ক) কাকু-বক্রোক্তি (না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ ঃ অবশ্য ভুলেছ)।

(খ) ছেকানুপ্রাস (কলম্ব-অম্বর ঃ 'ম্ব'-এর দুবার উচ্চারণ)।

(গ) অভঙ্গ শ্লেষ (বীজ = মূলসূত্র, বীচি ; কলা = শিল্প, কদলী)।

(ঘ) শ্রুত্যনুপ্রাস (হাতে-মাথে ঃ দন্তমূল থেকে উচ্চারিত ত-থ এর উচ্চারণ)।

(ঙ) সার্থক যমক (রক্তমালা-রক্তআঁখি ঃ রক্ত = শরীরের তরল বস্তু, লাল)।

(চ) বৃত্ত্যনুপ্রাস (ক-ধ্বনি চারবার, শ-শ-ধ্বনি চারবার)।

২. (ক) ব্যতিরেক (উপমান 'চন্দ্রে'র চেয়ে উপমেয় 'মুখে'র উৎকর্ষ)।

(খ) সমাসোক্তি (উপমেয় 'সন্ধ্যা'র ওপর উপমেয় 'মুখে'র উৎকর্ষ)।

(গ) অতিশয়োক্তি (উপমেয় 'সর্বনাশা চুম্বন' লুপ্ত, উপমান 'কালকূট' বিষ প্রবল)।

(ঘ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় 'ক্ষণস্থায়ী সবকিছুতে' উপমান 'সাবানের ফেনা'র সংশয়, 'যেন'র উল্লেখ)।

(ঙ) পরম্পরিত রূপক (নিরঙ্গরূপক 'মরণের শীত' থেকে আর একটি নিরঙ্গরূপক 'বরফের কাঁথা'র জন্ম)।

(চ) পূর্ণোপমা (বিজাতীয় বস্তু 'রাজ্য-স্বপ্ন', উপমেয় 'রাজ্য' উপমান 'স্বপ্ন' সাধারণ ধর্ম 'ছুটে যাওয়া', সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম')।

৩. (ক) অর্থান্তরন্যাস (বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন)।

(খ) বিরোধাভাস ('বড়' হওয়ার সঙ্গে 'ছোট' হওয়ার বিরোধ, 'বিনয়' থেকে 'মহত্ত্ব'—বিরোধের অবসান)।

(গ) একাবলি (আগের বিশেষ্য 'রাবণ' পরে বিশেষণ হল)।

(ঘ) ব্যাজস্তুতি (বাইরে নিন্দা ঃ গুণহীন, কপাল-পোড়া ; ভেতরে প্রশংসা ; ত্রিগুণাতীত পুরুষ, যার কপালের আগুনে মদনদেব ছাই হলেন, সেই মহাদেব)।

(ঙ) একাবলি (আগের কর্ম 'সিন্ধু' পরের অংশে কর্তা হল)।

(চ) বিরোধাভাস (মরলে বেঁচে যাওয়া—এতে বিরোধ, বেঁচে-থাকার দুঃখ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত—এই অর্থে বিরোধের অবসান)।

(ছ) একাবলি (আগে বাক্যাংশে শেষে, পরে বাক্যাংশের শুরুতে)।

(জ) ব্যাজস্তুতি (বাইরে নিন্দা, ভেতরের অর্থে প্রশংসা : কুকথা = বেদবাক্য, পঞ্চমুখ = পঞ্চানন শিব, কণ্ঠভরা বিষ = নীলকণ্ঠ শিব)।

অনুশীলনী - ২ ৪১.৫.২

১. পরম্পরিত রূপক (একটি নিরঙ্গা রূপক 'রূপের পদ্ম' থেকে আর একটি নিরঙ্গা রূপক 'অরূপ-মধু'র জন্ম) ; বিরোধাভাস (রূপ-অরূপ, দুঃখ-আনন্দ)।

২. সমাসোক্তি (উপমেয় লঙ্কার ওপর উপমান মানুষের ব্যবহার আরোপ)।

৩. ব্যতিরেক (উপমান 'শ্যামা'র চেয়ে উপমেয় 'শিলা'র অপকর্ষ)।

৪. প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় 'ছল'-এ উপমান 'নিশা'র সংশয়, উপমেয় 'মুখ'-এ উপমান 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য'-এর সংশয়) ;

বৃত্ত্যনুপ্রাস ('তার-কবেকার-অন্ধকার-বিদিশার'-এ 'আর' চারবার উচ্চারণ, 'বিদিশার নিশা'য় 'শ'-এর দুবার উচ্চারণ) ;

৫. অর্থান্তরন্যাস (বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন) ;

কাকু-বক্রোক্তি (হাঁ-প্রশ্ন থেকে না : হয় কি = হয় না)।

৬. মালোপমা (একটি উপমেয় 'ছেঁড়া-মেঘ', তিনটি উপমান 'পাতা', 'বাষ্প', 'বিদ্যুৎ')।

৭. বিরোধাভাস ('পূর্ণ'- 'কিছু তব নাই'-এ বাহ্যত বিরোধ)।

৮. বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় 'অশ্রু'-তে উপমান 'বাল্মীকির শ্লোক'-এর সংশয়, সংশয়বাচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখ)।

৯. সমাসোক্তি (উপমেয় 'বৈশাখ'-এর ওপর উপমান মানুষের আচরণের আরোপ)।

১০. বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় 'হৃদয়'-এ উপমান 'সন্ধ্যার আকাশ'-এর সংশয়, সংশয়বাচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখ)।

১১. লুপ্তোপমা (উপমেয় 'পদতল', উপমান 'কমল', সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম', সাধারণ ধর্ম লুপ্ত)।

১২. স্বভাবোক্তি (প্রেম-স্বভাবের বর্ণনা)।

১৩. ব্যাজস্তুতি (বাইরের নিন্দা ঃ বৃদ্ধ স্বামী, নেশাগ্রস্ত ঃ ভেতরের অর্থে প্রশংসা ঃ দেবাদিদেব সিদ্ধিদাতা মহাদেব)।

১৪. একাবলি (প্রথম বাক্যে 'পদ্ম' বিশেষণ-খণ্ডবাক্যে ; দ্বিতীয় বাক্যে 'পদ্ম' প্রধান খণ্ডবাক্যে বিশেষ্য, 'অলি' বিশেষণ খণ্ডবাক্যে ; তৃতীয় বাক্যে 'অলি' প্রধান খণ্ডবাক্যে বিশেষ্য, 'গান' বিশেষণ-খণ্ডবাক্যে ; চতুর্থ বাক্যে 'গান' প্রধান খণ্ডবাক্যে বিশেষ্য)।

১৫. সার্থক যমক (মানস-সরে = মাস সরোবরে, মানস সরে = মন চলে) ;

অন্ত্যানুপ্রাস (পরপর দুটি পর্বের শেষে 'সরে'র পুনরাবৃত্তি)।

১৬. ব্যতিরেক (উপমান 'ঝিঁঝির পাখা'র চেয়ে উপমেয় 'রোদ'-এর উৎকর্ষ)।

১৭. অতিশয়োক্তি (উপমেয় 'বিদ্যাসাগর', 'তেজ লুপ্ত, উপমান 'সাগর', 'অগ্নি' প্রবল)।

১৮. অভঙ্গা শ্লেষ (ঈশ্বর গুপ্ত কবি, ঈশ্বর গুপ্ত ভগবান লুকিয়ে ;

প্রভাকর = সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকা, সূর্য)।

১৯. সাঙ্গা রূপক (অঙ্গী উপমেয় 'গগন', তার অঙ্গ 'মেঘ' 'তারা' ; অঙ্গী উপমান 'নীলগাঙ', তার অঙ্গ 'মউজ' 'বুদ্‌বুদ্' ; সব উপমেয়ের সঙ্গো সব উপমানের অভেদ)।

২০. স্বভাবোক্তি (দুপুরের সূক্ষ্ম সুন্দর বর্ণনা)।

২১. ব্যাজস্তুতি (বাইরে প্রশংসা, ভেতরের অর্থে নিন্দা)।

২২. অতিশয়োক্তি (উপমেয় 'তাজমহল' লুপ্ত, উপমান 'বেহেশ্‌ত' (=সর্গ) প্রবল)।

২৩. ছেকানুপ্রাস ('শখর' ধ্বনিগুচ্ছের দুবার উচ্চারণ ঃ 'শাখার-শিখরে')।

২৪. নিরর্থক যমক (রূপাসোনা = র + উপাসনা, উপাসনা = প্রার্থনা)।

২৫. বিরোধাভাস ('ভীষণে-মধুরে'-তে বাহ্যত বিরোধ)।

NOTES